ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ শামছুল আলম

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

গবেষক

রাফিয়া সুলতানা

পিএইচ. ডি. গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিঃ নং- ৩৯/২০১০-২০১১

রেজিঃ নং- ১১২/২০১৪-২০১৫ (পুনঃ)

পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ- ২০১৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. মোঃ শামছুল আলম, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করিনি।

রাফিয়া সুলতানা
পিএইচ. ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রাফিয়া সুলতানা, পিএইচ. ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমি এর পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং গবেষককে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের কাছে প্রেরণের জন্য জমা নেওয়ার সুপারিশ করছি।

ড. মোঃ শামছুল আলম
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে **"ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব"** শীর্ষক পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। যথাসময়ে বিধি মুতাবিক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শানে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং মানবতার মহান শিক্ষক নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে দরূদ ও সালাম পেশ করছি। যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মোঃ শামছুল আলম, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- এর প্রতি। নানামূখী ব্যস্ততা ও একাডেমিক সংশ্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য শ্রমদান ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে বলে আশা রাখি। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। সেই সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। এছাড়া বিভাগের সম্মানীয় শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমার গবেষণাকর্মে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন ও উদ্বুদ্ধ করেছেন।

গভীর শ্রদ্ধাভরে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ রফিকুল ইসলাম ও মাতা সাজেদা খাতুনকে, যাদের সার্বিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণামূলক প্রণোদনা আমাকে শুধুমাত্র এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনই নয় বরং জীবন গঠনের উপর্যুপরি সব রসদই তারা জুগিয়েছেন। তাদের সন্তান হিসেবে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে তাদের অফুরন্ত ত্যাগ আমাকে জীবন চলার পথে আজকের অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে।

আমি শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রফেসর ড. আ.ন.ম. রফিকুর রহমান আল মাদানী, চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা -এর প্রতি। যাঁরা আমাকে পিতৃসূলভ নির্দেশনা ও গবেষণার সার্বিক ক্ষেত্র বিনির্মাণকল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের নানারূপ ব্যস্ততার মাঝেও প্রয়োজনমাফিক

যে নির্দেশনা তাঁরা আমাকে প্রদান করেছেন, সে জন্যে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাপাশে তাঁদেরকে আবদ্ধ করাই বরং শ্রেয়।

আমি কৃতজ্ঞ থাকতে চাই আমার জীবনসঙ্গী মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রতি। যিনি বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে যা কিছু দরকার সবকিছুতে ছিল তাঁর আগ্রহ উদ্দীপক ও সদা-সহযোগিতার মনোভাব; যা আমার গবেষণাকর্মটিকে এত সহজে সম্পন্ন করতে সম্ভব করেছে। তাঁর অক্লান্ত মননশীলতার ফলই যেন আমার এই অভিসন্দর্ভটি।

আমার ছোট্ট সোনা-মনিদ্বয় নাদরাহ ও রাইদ'র প্রতিও আমার হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম আদর ও ভালবাসা প্রদান করছি। তাদের অবুঝ হৃদয়ের আকুল চাওয়া আমার কর্তব্য-কর্মে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি; বরং স্রষ্টার অপার মহিমায় তা সহযোগিতাসূলভ হয়ে আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্নকরণে দারুণ ভূমিকা পালন করেছে।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখিত দেশী-বিদেশী লেখকের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকের নাম ও তাদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবু এখানে আরও একবার তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

স্বল্প পরিসর হওয়ায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলেও আমার হৃদয়োচিত কৃতজ্ঞতা রইল সেই সকল কল্যাণকামীদের প্রতি যাদের নাম এখানে উল্লেখ নেই। এছাড়া কম্পিউটার কম্পোজে যারা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সংকেত নির্দেশ	**৯**
প্রতিবর্ণায়ন	**১০**
ভূমিকা	**১১-১৫**
প্রথম অধ্যায় ঃ ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারণা	**১৬-৪৮**
১.১ 'ইসলাম' এর পরিচয়	
১.২ ইসলামের নামকরণ	
১.৩ ইসলামের উৎস	
১.৩.১ পবিত্র কুর'আন	
১.৩.২ সুন্নাতুর রাসূল	
১.৪ ইসলামের ভিত্তি	
১.৪.১ কালেমা	
১.৪.২ সালাত	
১.৪.৩ যাকাত	
১.৪.৪ সাওম	
১.৪.৫ হজ্ব	
১.৫ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস	
১.৫.১ আল্লাহর প্রতি ঈমান	
১.৫.২ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান	
১.৫.৩ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান	
১.৫.৪ রাসূলগণের প্রতি ঈমান	
১.৫.৫ আখিরাতের প্রতি ঈমান	
১.৫.৬ তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান	
১.৬ ইহসান	
১.৭ মুসলিমের পরিচয়	
১.৮ সম্প্রদায়	
১.৯ সাম্প্রদায়িকতা	
১.১০ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি	
১.১১ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম সম্প্রদায়সমূহ	

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় পবিত্র কুর'আনের নির্দেশনা **৪৯-৭৪**
২.১ সমস্ত মানুষ এক পরিবারভুক্ত বা জাতিভূক্ত
২.২ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব
২.৩ ভারসাম্য রক্ষার জন্য শ্রেণীবৈষম্য
২.৪ স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার
২.৫ সকল ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ
২.৬ সদাচরণ ও ন্যায় বিচার পাবার অধিকার
২.৭ ইসলাম গ্রহণে জোর জবরদস্তি নিষেধ
২.৮ ধর্মীয় ব্যাপারে সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের তাগিদ
২.৯ অমুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি রক্ষার নির্দেশ
২.১০ মুসলমান শুধু সতর্ককারী
২.১১ চুক্তিবদ্ধ ভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে স্বজাতিকে সাহায্যের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা
২.১২ অমুসলিমকে আশ্রয় প্রদানের নির্দেশ
২.১৩ বিতর্ক উত্তম পন্থায়
২.১৪ ক্ষমার নীতি অবলম্বন
২.১৫ মুসলমানদের উদারতার চেতনা
২.১৬ ধৈর্য ধারণের নির্দেশনা
২.১৭ আল কুর'আন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী
২.১৮ মাপ ও ওযনে ইনসাফ করা
২.১৯ অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ
২.২০ মানুষের সাথে শত্রুতা চিরন্তন নয়
২.২১ সংঘাত তৈরীতে উসকানীমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভূমিকা **৭৫-১৪১**
৩.১.১ প্রাক নবুয়তী জীবন
৩.১.২ মাক্কী জীবন
৩.১.৩ মাদানী জীবন

চতুর্থ অধ্যায় ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় খুলাফায়ে রাশেদীনের অবদান **১৪২-১৯৩**
৪.১ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আবু বকর (রা.) এর ভূমিকা
৪.১.১ বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সহমর্মিতা
৪.১.২ খেলাফত প্রশ্নে সম্ভাব্য সংঘাত থেকে উত্তরণ
৪.১.৩ সহিষ্ণুতা
৪.১.৪ ধর্মত্যাগীদের প্রতি অনুকম্পা
৪.১.৫ উদার সামরিক নীতি
৪.১.৬ ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির প্রয়াস
৪.১.৭ সদাচরণ

৪.১.৮ যিম্মী প্রজাদের অধিকার সংরক্ষণ
৪.১.৯ যিম্মীদের নেতৃত্ব বহাল
৪.২ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় উমর (রা.) এর পদক্ষেপ সমূহ
৪.২.১ 'খারাজ' এর প্রবর্তন
৪.২.২ যিম্মীদের পরামর্শ গ্রহণ
৪.২.৩ সেনাবাহিনীতে বহু জাতির সন্নিবেশ
৪.২.৪ গুপ্তচর হিসেবে যিম্মীদের স্বতস্ফুর্ত সহযোগিতা
৪.২.৫ অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান
৪.২.৬ অমুসলিমের অধিকার সংরক্ষণ
৪.২.৭ যিম্মী হত্যার বিচার
৪.২.৮ যিম্মীদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আইন প্রনয়ণ
৪.২.৯ যিম্মীদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন
৪.২.১০ জিযিয়া গ্রহণের উদারনীতি
৪.২.১১ বিধর্মীদের প্রতি জুলুম নির্যাতনের পথ রূদ্ধকরণ
৪.২.১২ সাম্য প্রতিষ্ঠা
৪.২.১৩ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সদ্ব্যবহার
৪.২.১৪ সমস্যা সমাধান সমতা
৪.২.১৫ বিজিত জাতির প্রতি নীতি
৪.২.১৬ অন্তিম মুহূর্তে যিম্মীদের নিরাপত্তার জন্য ওসীয়ত

৪.৩ উসমান (রা.) এর শাসনামলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
৪.৩.১ যিম্মী হত্যার বিচার
৪.৩.২ শাসনকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের প্রতি উসমান (রা.) এর প্রথম পত্র
৪.৩.৩ উদারতা
৪.৩.৪ সুশৃংখল সমর ব্যবস্থাপনা
৪.৩.৫ রক্তপাতহীন বিজয়
৪.৩.৬ গণীমতের সম্পদ অমুসলিমদের ফেরত দান
৪.৩.৭ জিযিয়া ব্যতীত সন্ধিচুক্তি
৪.৩.৮ সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে যিম্মীদের অংশগ্রহণ
৪.৩.৯ মুরতাদদের তওবার সুযোগ প্রদান
৪.৩.১০ অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন

৪.৪ আলী (রা.) এর শাসনকালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
৪.৪.১ ন্যায়পরায়ণতা
৪.৪.২ যিম্মীদের অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা
৪.৪.৩ জিযিয়া ও খারাজ আদায়ের ক্ষেত্রে উদারতা
৪.৪.৪ জনৈক পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ
৪.৪.৫ সংযমী চরিত্র
৪.৪.৬ নাজরানবাসীর প্রতি আলী (রা.)

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ **১৯৪-২৬১**
৫.১ প্রাচীন বাংলায় ধর্মসমূহের প্রসার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
৫.২ মুসলিম শাসনাধীনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ
৫.২.১ মুসলিম শাসনের সূচনা
৫.২.২ মুসলিম শাসনামলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আচরণ
৫.২.৩ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ
৫.২.৪ সুফি মতবাদ ও বৈষ্ণব ধর্মের মেল বন্ধন
৫.২.৫ নওমুসলিমদের মধ্যে পূর্ববর্তী ধর্মীয় রীতিনীতির অক্ষুণ্নতা
৫.২.৬ মুসলিম অভিজাত শ্রেণির মধ্যে হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ
৫.২.৬ রাষ্ট্রীয় কাজে হিন্দুদের ব্যাপক অংশগ্রহণ
৫.২.৭ সম্প্রীতির বন্ধনে হিন্দু মুসলমান
৫.৩ ব্রিটিশ শাসনামলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
৫.৩.১ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দূরত্ব সৃষ্টি
৫.৩.২ হিন্দু সমাজের জাগরণ: সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তর
৫.৩.৩ উনিশ শতকে মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলন
৫.৩.৪ মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র চেতনার উন্মেষ
৫.৩.৫ উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি
৫.৩.৬ সাম্প্রদায়িক সংকট সৃষ্টির কারণ
৫.৩.৭ বঙ্গভঙ্গ: সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ
৫.৩.৮ সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা
৫.৩.৯ রাজনৈতিকভাবে সাম্প্রদায়িক সমঝোতার প্রচেষ্টা
৫.৩.১০ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের চরম রূপ
৫.৩.১১ রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজন
৫.৩.১২ দ্বি তত্ত্ব
৫.৩.১৩ হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত আন্দোলন ও দেশ বিভাগ
৫.৪ পাকিস্তানী শাসনামলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
৫.৫ স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
৫.৫.১ স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
৫.৫.২ ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা
৫.৫.৩ সাম্প্রদায়িকতার প্রচারণা
৫.৫.৪ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও সম্প্রীতি

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সমকালীন বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি **২৬২-২৮৫**

উপসংহার **২৮৬-২৮৯**

গ্রন্থপঞ্জি ২৯০-৩০০

শব্দ সংকেত

স.	=	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
‘আ	=	‘আলাহিস সালাম
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
র/রহ.	=	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
ইং	=	ইংরেজি
বা/বাং	=	বাংলা
হি.	=	হিজরী
খ্রী.	=	খ্রীষ্টাব্দ
বি. দ্র.	=	বিশেষ দ্রষ্টব্য
ড.	=	ডক্টর
তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
খ.	=	খণ্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনূদিত
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
জ.	=	জন্ম
মৃ.	=	মৃত্যু
P.	=	Page
Op. cit	=	Operac-citrae
Ed	=	Edition/Editor/Edited
JASB	=	Journal of Asiatic Society of Bangladesh
Ibid	=	(Ibidem) in the same place; from the same source

আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

আরবী	=	বাংলা
ا	=	অ/আ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	ছ
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ/য
ط	=	ত
ك	=	ক
ظ	=	য
ع	=	‘
غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক্ব/ক
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ও/ব
ه	=	হ
ء	=	’
ي	=	য়

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে সহিংসতা, অরাজকতা, যুদ্ধ, দাঙ্গা, নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি সংগঠিত হচ্ছে মূলতঃ বিভিন্ন প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে এবং এক্ষেত্রে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামকে দোষারোপ করে একে একটি সাম্প্রদায়িক, বর্বর এবং উগ্র ধর্মমত হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চলছে। অথচ ইসলাম শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থই হচ্ছে শান্তি এবং এটি মানব জাতির জন্য শাশ্বত শান্তি, প্রশান্তি ও নিরাপত্তার উৎস। সমাজে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, নৈরাজ্য, হানাহানি সৃষ্টির মতো ঘৃণ্য কাজকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। চরমপন্থা, বাড়াবাড়ি, জোর-জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষ সমান। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[১]

ইসলাম একটি কল্যাণধর্মী, মানবতা ও সহনশীলতার ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও অরাজকতাসহ সকল অভিযানই পরিচালিত হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ব্রিটেন প্রবাসী ভারতীয় লেখক রবীন্দর কৌর বলেন, "বিভিন্ন রকম সংঘাতকে মোটাদাগে ইসলামী সন্ত্রাস বলাও অতি সরলীকরণ। .... এর শুরু ১৯৪৭ এর দেশভাগের মধ্য দিয়ে পরের ছয় দশক জুড়ে কিছুদিন পরপরই মুসলিম বিরোধী সহিংসতা ঘটেছে, যার নাম দেয়া হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বিশেষ করে ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালে গুজরাটে মুসলিম হত্যা উল্লেখযোগ্য। .... দুটি চরমপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ অনুসারে মুসলমানগণ স্বভাবে সহিংস এবং তাদের রাষ্ট্রীয় আনুগত্য দূর্বল। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মুসলিমদের নিশানা করে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা আসছে।"[২] এছাড়া ৯/১১ এর পর বিশ্বে বিশেষ করে পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রতি মানুষের মনে জন্ম নিয়েছে অবিশ্বাস। তারা মনে করছে মুসলমানরা বর্বর জাতি, তারা অন্য ধর্মের মানুষের জন্য, গোটা পৃথিবীর মানুষের শান্তির জন্য, কল্যাণের জন্য হুমকি স্বরূপ। অথচ ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সার্বজনীন কল্যাণের দিক নির্দেশনা দেয়। পবিত্র কুর'আনে অধিকাংশ স্থানে আল্লাহ তা'আলা 'হে মুসলমাগণ', 'হে মুমিনগণ' এর স্থলে 'হে মানবজাতি' বলে সম্বোধন করে বিধান দিয়েছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। তারা সবাই এক আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে সবার অধিকার সমান। এখানে কোন বাড়াবাড়ি, হানাহানি, কলহ, বিবাদের স্থান নেই। পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করে, 'দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন বাড়াবাড়ি নেই।'[৩]

---

[১] আল কুর'আন, সূরা নিসা : ০১

[২] দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ নভেম্বর ২০০৮ খ্রী.

[৩] আল কুর'আন, সূরা বাকারা : ২৫৬

'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।'[৪] ইসলাম অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কেও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। পবিত্র কুর'আন খ্রীষ্টান এবং ইহুদী সম্প্রদায়কে 'আহলে কিতাব' বলে আখ্যায়িত করেছে। যার অর্থ কিতাবধারী জনগোষ্ঠী। এখানে 'কিতাব' বলতে ঐশী গ্রন্থ তাওরাত, যাবুর ও ইনজীলকে বুঝায়। এ কিতাবের ভিত্তিতে তাদের সাথে মুসলামানদের একটি বিশ্বাসগত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। মুসলমানগণ আবার পূর্বে আগমনকারী সকল নবী রাসূলগণকে বিশ্বাস করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন, 'তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরদের প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করিনা।'[৫] আল্লাহ পাক আরো বলেন, 'বলুন আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই।'[৬] ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের মানবিক অধিকার ও সুবিচার সম্পর্কে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেছে, ' আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না এ কাজ থেকে যে, দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে যেসব লোক তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেনি- তাদের সাথে তোমরা কল্যাণময় সুবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করবে। কেননা, সুবিচারকারীদের তো আল্লাহ পছন্দ করেন।'[৭]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র। মদীনা সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এ রাষ্ট্রটি ছিল একটি সহনশীল রাষ্ট্র। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে সকল ধর্মাবলম্বী, সকল সম্প্রদায় ও গোত্রের নাগরিকগণকে সমঅধিকার প্রদান করেন। তিনি অমুসলমানদের যিম্মীর মর্যাদা দান করেন এবং তাদের জীবন, সম্পদ ও ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর অর্পণ করেন। তাদের স্ব-স্ব ধর্ম পালনে স্বাধীনতা প্রদান করেন এবং স্ব-স্ব সংস্কৃতি লালনের অবাধ অধিকার প্রদান করেন। তিনি সামান্য জিজিয়ার বিনিময়ে ইহুদী এবং নাজরানের খ্রীষ্টানদের যিম্মা গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামকে কারো উপর চাপিয়ে দেননি বা কারো সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি দ্বারা গ্রাস করার নীতি অবলম্বন করেননি। বরং তিনি বলেন, 'মনে রেখো, যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোন কিছু জোরপূর্বক

---

[৪] আল কুর'আন, সূরা কাফিরুন : ০৬
[৫] আল কুর'আন, সূরা বাকারা : ১৩৬
[৬] আল কুর'আন, সূরা শূরা : ১৫
[৭] আল কুর'আন, সূরা মুমতাহিনা : ০৮

ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব'।[৮] এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সময়ে ইসলামী আদর্শের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম রাজত্বে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ভারত উপমহাদেশের মুসলিম শাসনামল এর বড় প্রমাণ। এ সময় অনেক অমুসলিম রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলিম প্রধান বাংলাদেশেও অতীত এবং বর্তমানেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিরাজমান।

ইসলামের সুমহান আদর্শকে ধারণ ও এর বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীতে বর্তমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহাবস্থান সৃষ্টি সম্ভব। তাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাম্প্রদায়িকতার দৃশ্যবিবরণী বিশেষ করে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধানে ইসলামের সুষ্ঠু, সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা তুলে ধরা। এছাড়া প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- ইসলাম সকল মানুষের কল্যাণের জন্য এ বিষয়টি নির্ণয় করা।
- ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের যেসব মর্যাদা ও অধিকার দেয় তা সনাক্তকরণ।
- যে ভ্রান্ত ধারণা থেকে ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করার অভিপ্রায় চলছে তা নিরসনের প্রচেষ্টা।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মনীতি সম্পর্কে জানা।
- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সহিংসতা সৃষ্টির সাধারণ কারণসমূহ নির্ণয়করণ।
- বর্তমানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের কর্তব্য নির্ণয়ের প্রয়াস।
- সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরা।

সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ নিরাপদ জীবন মানুষের স্বভাবজাত কামনা। অথচ বর্তমান বিশ্বে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল ও গোত্রভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বেড়েই চলছে। এক জাতি অন্য জাতিকে শত্রু জ্ঞান করছে। একে অন্যের বিনাশ করে উল্লাস করছে। বিভিন্ন স্থানে বেজে উঠছে যুদ্ধের দামামা। মানুষ হারাচ্ছে তাদের মৌলিক অধিকার। মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। এর ভয়াবহ ছোবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না নিষ্পাপ শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণ। মানুষকে ইসলাম বিদ্বেষী করে চারিদিকে চলছে মুসলিম নিধনের নিরব

[৮] ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আমর আল আযদী, *সুনান*, (বৈরুত : আল মাকতাবাতু আসরিয়্যাহ,তা.বি.), কিতাবুল জিহাদ, খ. ৩য়, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতা। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্বে শান্তি, সম্প্রীতি আনয়নের জন্য বিশ্বের কর্তা ব্যক্তিরা বিভিন্ন চুক্তি, পরিকল্পনা, রোডম্যাপ করে সফলতা পাচ্ছেন না। তাই আজ বিশ্বজুড়ে ইসলামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কর্মনীতি ও ভূমিকা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মানুষে মানুষে সহাবস্থান, সম্প্রীতি নিশ্চিত করার জন্য এ ধরনের গবেষণা এখন সময়ের দাবি। তারই নিরীখে এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা বিচার করে আমি " **ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব (Islam and Communal Amity : Perspective Bangladesh & the Outer World)**" শিরোনামে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে নিম্নোক্ত ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারণা'। এ অধ্যায়ে ইসলামের সংজ্ঞার্থ ও এর মূল ভিত্তি ও মৌলিক বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তারপর সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং মুসলমানদের চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী অমুসলিম সম্প্রদায়সমূহের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় পবিত্র কুর'আনের নির্দেশনা'। এখানে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতে পবিত্র কুর'আনে মুসলমানগণকে যে আদেশ ও নিষেধ করেছেন তার উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভূমিকা' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনকে প্রাক নবুয়্যাতি, মাক্কী এবং মাদানী এই তিন ভাগে বিভাজিত করে তাঁর জীবনাচরণে কীভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিফলিত হয়েছে, সে-বিষয়ে অনুসন্ধানী আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় খুলাফায়ে রাশেদীনের অবদান'। এ অধ্যায়ে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) এর খেলাফত কালকে পৃথক ভাবে আলোচনা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তাদের কর্ম প্রচেষ্টা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'। এ অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলায় ধর্মসমূহের প্রসার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর মুসলিম, ব্রিটিশ, পাকিস্তান শাসনাধীনে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিশ্লেষিত বিষয় 'সমকালীন বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'। এখানে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের কয়েকটি আলোচিত দেশের তথ্যপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণ এবং সম্প্রীতির জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মুলতঃ ইসলাম মানবতার ধর্ম। এটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও বংশীয় কৌলীন্যের উর্ধ্বে উঠে মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে। ইসলামের বিধি বিধানসমূহতে সম্প্রদায়সমূহের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বর্ণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব ব্যাপী যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বিদ্যমান তা নিরসনে ইসলামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নীতিমালা কিভাবে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে তা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস চালানো হবে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারণা

১.১ ‘ইসলাম’ এর পরিচয়

ইসলাম মহান আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী ধর্মসমূহের অন্যতম। পবিত্র কুর’আনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ "ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন।"[৯]

ইসলাম (الاسلام) একটি ‘আরবী শব্দ, যার অর্থ الخضوع والانقياد [১০] অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা। কুর’আনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ "বলুন! আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে, তাঁর কোন শরীক নেই, আর আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলমান।"[১১]

معجم لغة الفقهاء তে এর অর্থ করা হয়েছে الطاعة والانقياد والتسليم [১২] অর্থাৎ মেনে চলা, আনুগত্য করা এবং শান্তি পাওয়া। এর আরো একটি অর্থ হল السَّلَامَةُ। নিরাপত্তা লাভ করা। মু‘অজামু মাক্বাইলিল লুগাত নামক অভিধানের গ্রন্থকার বলেন,

أَنْ يَسْلَمَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْعَاهَةِ وَالْأَذَى [১৩]

অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট থেকে কোন ব্যক্তির নিরাপদ থাকা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَام "এবং আল্লাহ নিরাপদ আবাসের দিকে ডাকবেন।"[১৪]

প্রখ্যাত অভিধানবেত্তা আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমদ ইসলাম শব্দের অর্থ করেছেন, الصُّلْح। অর্থাৎ সন্ধি। যাবতীয় খারাপ কথা থেকে নিরাপদ থাকা। নরম ভাষায় কথা বলা এবং অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকা।[১৫] ইরশাদ হয়েছে, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا অর্থাৎ যখন মূর্খ ব্যক্তিরা তাদের সাথে তর্ক করে তখন তারা বলে সালাম।[১৬]

ইসলামের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً

---

৯ আল কুর’আন, সূরা আলে ইমরান : ১৯

১০ রুহুল বা‘আলবাক্কী এবং মুনীর বা‘আলবাক্কী, *আল মাওরিদ*, (বৈরুত : দারুল ‘ইলমী লিল মুল্লাইয়িন, ২০০৭ খ্রী.),পৃ. ১০৭

১১ আল কুর’আন, সূরা আল আন‘আম : ১৬২-১৬৩

১২ মুহাম্মদ রাওয়াছু কাল‘আযী এবং হামিদ সাদিক কানীবী, *মু‘অজামু লুগাতিল ফুকাহা*, (দারুন নাফাইছ লিত তাবা‘আতি ওয়ান নাশরী ওয়াততাওযী, ১৯৮৮ খ্রী.),পৃ. ৬৮

১৩ আবুল হাসান আহমদ ইব্‌ন ফারিস আররাযী, *মু‘অজামু মাক্বাইলিল লুগাত*,(দামেশক: দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রী.), খ. ৩, পৃ. ৯০

১৪ আল কুর’আন, সূরা ইউনুছ : ২৫

১৫ আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমদ, *তাহযিবুল লুগাহ*, (বৈরুত: দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০১খ্রী.), খ. ১২, পৃ. ৩১৩

إسلام :والسلْم والسلْمُ: الصُّلْح. السَّلَام والتحية مَعْنَاهُمَا وَاحِد، ومعناهما السلاَمة من جَمِيع الْآفَات وقولُه جلَّ وعزَّ: {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً} (الْفرْقَان: 63) ، أَي: سداداً من القَوْل وقصداً لَا لَغوَ فِيهِ.

১৬ আল কুর’আন, সূরা ফুরকান : ৬৩

"ইসলাম হল, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা পালন করা এবং যাতায়াতের সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ আদায় করা।" [১৭]

অন্য একটি হাদীসে ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُسْلِمُ قَلْبُكَ لِلَّهِ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ، وَيَدِكَ

অর্থাৎ ইসলাম হল তোমার হৃদয় আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হবে এবং মুসলমানগণ তোমার জিহ্বা ও হাত হতে নিরাপদ থাকবে।"[১৮] এছাড়া এ হাদীসে তিনি ঈমানকে উত্তম ইসলাম হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং ঈমানের মূলভিত্তিসমূহ বর্ণনা করেছেন।

শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগত হওয়া, তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা; বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা ইসলাম।[১৯] নিম্নে ইসলামের কিছু প্রামাণ্য সংজ্ঞা দেয়া হলঃ

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মতে,

والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى

অর্থাৎ ইসলাম হল আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহের প্রতি আত্মসমর্পণ করা ও আনুগত্য পোষণ করা।[২০]

আল্লামা জুরজানী বলেছেন,

الإسلام: الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم.

"ইসলাম হল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য করা এবং বশ্যতা স্বীকার করা।"[২১]

মু'অজামু লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল মা'আছিরাহ নামক গ্রন্থে এসেছে,

الدِّين السَّماويّ الذي بعث اللهُ به محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم "الإسلام باللِّسان والإيمان بالقلب

---

[১৭] ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী আন নিশাপুরী, *সহীহ*,(বৈরুত: দারু ইহয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪২২ হি.),বাব মা'অরিফাতুল ঈমান ওয়াল ইসলাম ওয়াল কদর, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৬

[১৮] আবু নায়ীম আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, *মা' অরিফাতুস সাহাবাহ*, (রিয়াদঃ দারুল ওয়াতানি লিন নাশর, সৌদী আরব,১৯৯৮ খ্রী.) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০৭৪

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ» قَالَ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «يُسْلِمُ قَلْبُكَ لِلَّهِ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ، وَيَدِكَ» قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ» قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ , وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ»

[১৯] সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, লেখকমণ্ডলী,(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০০ খ্রী.), পৃ. ৩৩

[২০] মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আল খামীস, *উসূলুদ দীন 'ঈনদা আবু হানীফা*, (সৌদী আরব: দারুস সামা'ঈ,তা.বি.), পৃ. ৪৩৫

[২১] আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল জুরজানী, *কিতাবুত তা'রিফাত*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, লেবানন, ১৯৮৩ খ্রী), পৃ. ২৩

"ইসলাম হচ্ছে ঐশী ধর্ম যা আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন, তা মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস করা।"[২২]

'তাহযিবুল লুগাহ' গ্রন্থকার বলেছেন,

فالإسلامُ: إظهارُ الخُضوع والقَبول لِما أَتَى بِهِ الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَام، وَبِه يُحْقَنُ الدّم، فإن كَانَ مَعَ ذَلِك الإظهارِ اعتقادٌ وتَصديقٌ بِالْقَلْبِ فَذَاك الْإِيمَان الّذي هَذِه صِفَتُه

"রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তা গ্রহণ করা।"[২৩]

'আল ইসলামু উসূলুহু ওয়া মাবাদিউহু' নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার বলেন,[২৪]

أن معنى كلمة الإسلام هو " الانقياد والخضوع والإذعان والاستسلام والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض "

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশসমূহ বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়া ,সামগ্রিক জীবনে সেগুলোর অনুসরণ করা, তাঁর নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাই ইসলাম।

১.২ ইসলামের নামকরণ

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন স্বয়ং এই সত্য দীনের নামকরণ করেছেন ইসলাম। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা হয়, বিনা প্রশ্নে তাঁর আদেশসমূহ মান্য করা হয়। একনিষ্ঠতার সাথে তাঁর জন্য ইবাদাত সম্পাদন করা হয় এবং তাঁর সমস্ত খবরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। মূলত, ইসলাম বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ ধর্মকেই বোঝানো হয়। এ ধর্মের নামকরণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিশেষায়িত। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের নাম কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা কোন নির্দিষ্ট জাতির নামে পরিচিত হয়েছে। যেমন, ইয়াহুদার নামে ইয়াহুদী ধর্ম, গৌতম বুদ্ধের নামে বুদ্ধ ধর্ম, যীশু খ্রীষ্টের নামে খ্রীষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল ইসলাম। যা আল্লাহ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট করেননি। বরং এর নামকরণ করেছেন তাঁর প্রদত্ত আদর্শের নামে। যে ব্যক্তি এই আদর্শের প্রতি আনুগত্য পোষণ করবে, সেই এর অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৫]

---

[২২] ড. আহমদ মুখতার, *মু'অজামু লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল মা'আছিরাহ*,(বৈরুত : 'আলিমুল কুতুব, ২০০৮ খ্রী.) খ. ২, পৃ. ১১০০

[২৩] আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইবন আহমদ, *তাহযিবুল লুগাহ*, (বৈরুত: দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০১ খ্রী.) খ. ১২, পৃ. ৩১৩

[২৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ, *আল ইসলামু উসূলুহু ওয়া মাবাদিউহু* ,(সৌদী 'আরব : ওযারাতিশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাতি ওয়াল আওক্বাফি ওয়াদ দা'ওয়াতি ওয়াল ইরশাদ, ১৪২১ হি.) খ. ২, পৃ. ১০৫

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

১.৩ ইসলামের উৎস

ইসলামের মৌলিক উৎস হচ্ছে ; এক, পবিত্র কুর’আন যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করেছেন এবং দুই, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতসমূহ। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي،

“আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন এ দুটিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। এগুলো হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাত।”[২৬] সে সময়ই আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ইসলামের পরিপূর্ণতা ঘোষণা দিয়ে অহী নাযিল করেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদেরকে আমার নেয়ামত দান করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।”[২৭]

১.৩.১ এক, পবিত্র কুর’আন

ইসলাম আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত ধর্ম। একে পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যেই তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর পবিত্র কুর’আন অবতীর্ণ করেছেন। যাতে রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত, মুসলমানদের জন্য বিধি বিধান এবং যেসব অন্তর আরোগ্য কামনা করে তাদের জন্য আরোগ্য। আল্লাহ তা‘আলা তারঁ রাসূলগণের নিকট যে বিধানসমূহ প্রেরণ করেছেন পবিত্র কুর’আনে তার মূলনীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। কেননা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন রাসূলগণের মধ্যে কোন নতুন ব্যক্তি নন তদ্রূপ পবিত্র কুর’আনও কোন নতুন বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ইব্রাহীম ‘আলাইহিস সালাম এর প্রতি যে সহীফাসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, মুসা ‘আলাইহিস সালামকে যে তাওরাত দিয়ে সম্মানিত করেছেন, দাউদ (আ.) এবং ঈসা (আ.) কে যথাক্রমে যে যাবুর ও ইনজিল প্রেরণ করেছেন তা সবই তাঁর ওহী বা ঐশী বাণী। কিন্তু এগুলোতে অনেক রদবদল ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অনেক ভ্রান্তি এবং মিথ্যা কথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুর’আনকে এগুলো থেকে হিফাজত করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং স্থগিতকারী রূপে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

[২৬] আবু ‘আব্দুল্লাহ আল হাকিম আন নিশাপুরী, *আল মুসতাদরাক আস সাহীহাইন*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.), বাব ফা আম্মা হাদিছু আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমাইর, খ. ১ম, পৃ. ১৭৬

[২৭] আল কুর’আন, সূরা মায়েদা : ০৩

Dhaka University Institutional Repository

"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব নাযিল করেছি, কিতাবের যা কিছু তার সামনে মজুদ রয়েছে, এ কিতাব তার সত্যতা স্বীকার করে, এ কিতাব তার হেফাযতকারীও বটে।"[২৮]

এছাড়াও পবিত্র কুর'আনের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এটি এমন গ্রন্থ যেখানে আল্লাহ তা'আলা মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। যেন মানুষ তার জীবন চলার পথে সঠিক দিক নির্দেশনা পায়। সমস্ত গোমরাহী ও ভুল পথ থেকে সত্য ও ন্যায়ের পথকে বেছে নিয়ে কল্যাণ লাভ করতে পারে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

"আমি তোমার ওপর এই কিতাব নাযিল করেছি, সব বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য। এটি হল হিদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ। "[২৯]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন,

"তোমাদের কাছে তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত এসেছে।"[৩০]

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

"অবশ্যই এ কুর'আন এমন এক পথের দিকে নির্দেশনা দেয় যা অতি মযবুত এবং যেসব ঈমানদার মানুষ নেক আমল করে, এ কিতাব তাদের সুসংবাদ দেয়, তাদের জন্যে এক মহাপুরস্কার রয়েছে।"[৩১]

পবিত্র কুর'আনে মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এতে আকীদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম, মু'আমালাত-আদব সমস্ত বিষয়ের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। আরো রয়েছে মানুষকে তাওহীদের দিকে আহবান; আল্লাহ তা'আলার নাম, সিফাত ও কর্মসমূহের সাথে পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে অতীত জাতিসমূহের ঘটনা ও তাদের পরিণতির বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষের পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষকে আখেরাতের আযাব সম্পর্কে সাবধান করেছেন। আরো উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন বিষয়ের অনেক দলীল, প্রমাণ, উদাহরণ এবং বৈজ্ঞানিক সূত্র যা মানুষের গবেষণার পথকে করে সুবিস্তৃত।

---

[২৮] আল কুর'আন, সূরা মায়েদা : ৪৮

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

[২৯] আল কুর'আন, সূরা নাহল : ৮৯

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

[৩০] আল কুর'আন, সূরা আন'আম : ১৫৭

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

[৩১] আল কুর'আন, সূরা বনী ইসরাঈল : ০৯

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِين يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

১.৩.২ সুন্নাতূর রাসূল

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুর'আনের সদৃশ আরেকটি বিষয় তাঁকে প্রদান করেছেন। আর তা হল সুন্নাতুর রাসূল। রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমাকে পবিত্র কুর'আন ও তার সাথে তার অনুরূপ একটি বিষয় দেয়া হয়েছে।"[৩২] এটি পবিত্র কুর'আনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণরূপে অভিহিত হয়েছে। সুন্নাতে নববী ইসলামের দ্বিতীয় উৎস।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত সকল বর্ণনা এর অন্তর্ভুক্ত। চাই তা তাঁর কথা হোক অথবা কাজ বা অনুমোদন বা গুণ হোক।

সুন্নাতও আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহী। কেননা তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে শরীয়াত সম্পর্কিত কোন কথা বলতেন না।[৩৩] তিনি সে বিষয়ই মানুষের কাছে প্রচার করেছেন যা সম্পর্কে তিনি নির্দেশিত হয়েছেন। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "আমি শুধু সেটুকুরই অনুসরণ করি যেটুকু আমার কাছে ওহী করে পাঠানো হয়। আর আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছুই নই।"[৩৪]

রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণিত হাদীসসমূহে ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম, আকাইদ-বিশ্বাস, নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানব জাতির জন্য আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

"রাসূলুল্লাহ এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ এবং পরকালের আশা করে, আর বেশী পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে।"[৩৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় মুসলমানগণ ইসলামের হুকুম আহকাম এবং পবিত্র কুর'আনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সরাসরি তাঁর নিকট হতে অবহিত হতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নাতসমূহ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাদের পরে তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সনদের ধারাবাহিকতা যাচাই বাছাই করে এবং বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর কথা, কাজ, অনুমোদন ও গুণাবলীসমূহ মানুষের হিদায়াতের জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[৩২] ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইব্ন আমর আল আযদী, *সুনান* ,(বৈরুত: আল মাকতাবাতু আসরিয়্যাহ,তা.বি.), বাব লুযুমুস সুন্নাত, খ. ৪র্থ, পৃ. ২০০

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ

[৩৩] আল কুর'আন, সূরা নাজম : ৩-৪

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

[৩৪] আল কুর'আন, সূরা আহকাফ : ০৯

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

[৩৫] আল কুর'আন, সূরা আহযাব : ২১

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতসমূহ ইসলামের উৎস হিসেবে উম্মতের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

অতএব কুর'আন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত যে, এ দুটি হল ইসলামের মৌলিক উৎস। যা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন। কুর'আন এবং সুন্নাত এর অনুসরণ করা মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এ দু'টির আদেশ মান্য করা, নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং এগুলোর বর্ণিত খবরসমূহ সত্য বলে বিশ্বাস করা ফরজ। আর এটিই হল ইসলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "রাসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি তোমাদের যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।"[৩৬]

তিনি আরো বলেন,

"না, তোমার মালিকের শপথ এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে (শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নেবে, অতপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না, বরং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।"[৩৭]

১.৪ ইসলামের ভিত্তি

ইসলাম পাঁচটি বুনিয়াদের উপর স্থাপিত। সেগুলো হলঃ কালিমা, সালাত, যাকাত, সাওম এবং হজ্ব।

১.৪.১ কালিমাঃ ইসলামের প্রথম ভিত্তি হল আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল একথার ওপর সাক্ষ্য প্রদান করা। এই কালিমাতে দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত; এক, لا إله إلا الله এ কথার উপর সাক্ষ্য প্রদান করা। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই। তিনিই একমাত্র সত্য ইলাহ। একমাত্র তাঁরই জন্য সমস্ত ইবাদাত সম্পাদিত হবে– জেনে, বুঝে, দৃঢ় বিশ্বাস ও ভালবাসার সাথে একথার উপর সাক্ষ্য প্রদান করা। আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কিছুর ইবাদতকে অস্বীকার করা। দুই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করা। তিনি যা বলেন তা সত্য হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করা। তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বেঁচে থাকা। এ কথার ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করা যে তিনি সমস্ত মানুষের কাছে আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি

---

[৩৬] আল কুর'আন, সূরা হাশর : ০৭

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

[৩৭] আল কুর'আন, সূরা নিসা : ৬৫

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

আল্লাহর বান্দা এবং সত্য রাসূল। তাঁর ইবাদত করা হয় না। বরং তাঁর আনুগত্য করা হয় এবং তাঁকে অনুসরণ করা হয়। যে ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্য হবে সে জাহান্নামী হবে।[৩৮]

১.৪.২ সালাত: ইসলামের দ্বিতীয় রুকন হল সালাত। এটি আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যম। সমস্ত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে মুসলিম ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার ফরজ সালাত আদায় করে। এ সালাত তাঁর জন্য সমস্ত অশ্লীলতা, খারাপ কাজ, অপকর্ম, ও গুনাহ থেকে রক্ষাকারী দেয়াল হিসেবে কাজ করে। মুসলিম ব্যক্তি ভোরে ঘুম থেকে উঠেই নামাজের মাধ্যমে তাঁর রবের সান্নিধ্যে আসে পার্থিব যাবতীয় কাজে ব্যস্ত হবার পূর্বেই। তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার করে। এভাবে দিনে পাঁচবার সে আল্লাহর দরবারে ধরণা দেয়। পাক পবিত্র দেহ, মন, স্থান-বস্ত্র ইত্যাদির সাথে সালাত আদায় করে। তাঁর অন্তরকে পৃথিবীর সকল বিষয় থেকে ফিরিয়ে একমাত্র তাঁর প্রভুর দিকে নিয়ে আসে। তার মুখকে আল্লাহর ঘর কাবার দিকে ফিরিয়ে জিহ্বা, হাত, পা, মাথা, তথা সমস্ত শরীরের সাহায্যে সালাত আদায় করে। সালাতের প্রতিটি স্তরে সে আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা করে এবং তাঁর ইবাদত করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়।

১.৪.৩ যাকাত: যাকাত হল ইসলামের তৃতীয় রুকন। এটি মুসলিম ধনী ব্যক্তির ওপর ফরজ। যে মুসলিম ব্যক্তির তাঁর ও তাঁর পরিবারের যাবতীয় ব্যয় বহন করার পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য এক বছর পর্যন্ত মালিকানায় থাকে সে ব্যক্তির হাশেমী বংশ ব্যতীত কুর'আনে বর্ণিত আটটি খাতে শতকরা ২.৫% ভাগ সম্পদ প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়। যাকাতের সম্পদ প্রদান করা হলে ব্যক্তির মন ও সম্পদ উভয়ই পবিত্র হয়। তাঁর সম্পদে আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হয় এবং তার অন্তর কৃপণতা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি থেকে পবিত্রতা লাভ করে। তার মনে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহনশীলতা সৃষ্টি হয়।

১.৪.৪ সাওম: সাওম ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। রমজান মাসে ফজর থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পযন্ত রোযা রাখা। এ সময় বান্দা পানাহার ও জৈবিক চাহিদা মেটানো থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহর ইবাদাতে রত থাকবে। সমস্ত অশ্লীলতা, ঝগড়া-ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকবে।

এটি এমন একটি ইবাদাত যা আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে সর্ম্পক বৃদ্ধি করে। এটিই একমাত্র ইবাদত যার মাধ্যমে বান্দার ইবাদাতের একনিষ্ঠতা প্রকাশিত হয়। এজন্যেই রোজাদার ব্যক্তি অন্ধকারে অথবা লুকিয়ে পানাহার থেকে বিরত থাকে। রমজানের রোযা মুসলমান ব্যক্তিকে মাসব্যাপী তাকওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়।

---

[৩৮] মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

১.৪.৫ হজ্জঃ মক্কা মুকাররামায় আল্লাহর ঘরের দিকে হজ্জ করা। এটি প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান, সক্ষম মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরজ। যার পবিত্র কাবা গৃহে যাওয়া ও আসার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা আছে। প্রতি বছর হজ্ব সমাবেশে অনেক মুসলমান শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। এক পোষাকে, এক স্থানে, এক তালবিয়া পাঠ করতে করতে সব মুসলমান এক হয়ে যায়। তখন সেখানে দুনিয়ার সমস্ত ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়। শাসক ও শাসিত, ধনী-গরীব, সাদা-কালো, আরবী-আজমী সকল পার্থক্য বিলীন হয়ে সাম্য ও মৈত্রী সৃষ্টি হয়। তৈরী হয় এক সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

এই পাঁচটি হল ইসলামের মৌলিক ইবাদত। কিন্তু শুধু এগুলোই ইসলামের ইবাদত নয়। বরং ইসলামে ইবাদতের বিষয়টি আরো ব্যাপক। এটি মানুষের সব কথা ও কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়। মানুষের প্রত্যেক কাজ যা সে আল্লাহর নৈকট্যের আশায় সম্পাদন করে তাই ইবাদত। যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তার পিতা-মাতা পরিবার, পরিজন, সন্তান-সন্তুতি, প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করে তবে তা তার ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হবে। মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত সীমানার মধ্যে ঘরে, বাজারে, প্রতিষ্ঠানে যে লেনদেন করে তাও ইবাদত। এছাড়া আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, ন্যায় বিচার করা, কষ্ট দূর করা, দুর্বলকে সাহায্য করা, হালাল উপার্জন করা। পরিবার, পরিজনের জন্য ব্যয় করা, মিসকিনকে সাহায্য করা, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেয়া, নির্যাতিত ব্যক্তিকে সহযোগিতা করা, ইত্যাদি কাজ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় তবে সবই ইবাদত বলে গণ্য হবে। এভাবে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা নিজের জন্য করে তা ইবাদত, যা সে পরিবার অথবা সমাজ অথবা দেশের জন্য করে তাও ইবাদত বলে গণ্য হবে।[৩৯]

আর এ সব কিছুই হবে ইসলামের অন্তর্গত অর্থাৎ ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মের নাম নয়, বরং ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা মানবজাতিকে অবহিত করেছেন। পবিত্র কুর’আন ও সুন্নাহর মাধ্যমে। আর এটিই আল্লাহর মনোনীত ও নিদের্শিত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা’আলা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর ইসলামই একমাত্র ধর্ম।[৪০] ইসলাম ছাড়া আর কোন দীন বা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন নীতিমালা যে অনুসরণ করে সে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। পরকালে তাঁর জন্য থাকবে জাহান্নাম। পবিত্র কুর’আনে ইরশাদ হয়েছে, “যে ব্যক্তি ইসলাম

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

[৪০] আল কুর’আন, সূরা আলে ইমরান : ০৯

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

ব্যতিত অন্য কিছুকে দীন হিসেবে গ্রহণ করবে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪১]

আরো ইরশাদ হয়েছে, "এটিই আমার সীরাতে মুস্তাকিম বা সরল সঠিক পথ। অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অবলম্বন করো না। কেননা তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[৪২]

হাদীসেও বার বার ইসলাম অনুসরণের বাধ্যবাধকতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের মধ্যে নতুন কিছু করে তা গ্রহণযোগ্য নয় তা বাতিল।"[৪৩] এছাড়া আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সবাই জান্নাতে যাবে সে ব্যক্তি ব্যতীত যে অস্বীকার করবে। প্রশ্ন করা হয়! কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যে আমাকে অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে সে অস্বীকার করবে।" [৪৪]

মোটকথা পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহতে যে আদেশ ও নিষেধসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবেসে তা মেনে চলার নামই হল ইসলাম।

১.৫ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস

ইসলামের প্রথম শর্ত হল ঈমান আনয়ন। যেমন: এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"নেক কাজ মানে এটা নয় যে, তোমরা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ করে নিলে; বরং আসল নেক কাজ হলো এই যে, মানুষ আল্লাহ, আখিরাত, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীগণের ওপর ঈমান আনে।"[৪৫]

"আমি প্রতিটি জিনিসকেই সুনির্দিষ্ট তাকদীরসহ সৃষ্টি করেছি।"[৪৬]

---

[৪১] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান : ৮৫

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

[৪২] আল কুর'আন, সূরা আন'আম : ১৫৩

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

[৪৩] ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাব নাকদুল আহকামিল বাতিলহ ওয়া রাদ্দু মুহাদ্দিসাত, খ. ৩য়, পৃ. ১৩৪৩

[৪৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহ*, (বৈরুত : দারু তুওকীন নাজাত, ১৪২২হি.), বাব আল ইকতিদায়ি বিসুন্নাতির রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খ. ৯ম, পৃ. ৯২

[৪৫] আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা : ১৭৭

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

[৪৬] আল কুর'আন, সূরা কামার : ৪৯

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

এছাড়া হাদীসে জিবরাঈলে এসেছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হল আমাকে ঈমানের খবর দিন। তখন তিনি বললেন, “তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের প্রতি, শেষ বিচারের দিনের প্রতি এবং তাকদীরের ভালো মন্দের প্রতি।”[৪৭] অর্থাৎ ঈমানের ভিত্তি বা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হল ছয়টি। যথা,

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান,
২। তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান,
৩। তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান,
৪। তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান,
৫। আখিরাতের প্রতি ঈমান,
৬। তাকদীরের প্রতি ঈমান

১.৫.১ আল্লাহর প্রতি ঈমান: অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলার রবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত এবং তাঁর নাম ও সিফাতসমূহের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ আসমান ও জমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছু তথা বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা এ কথা মেনে নেয়া। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্যই সমস্ত ইবাদত সম্পাদন করা। একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা। তিনি ব্যতীত সকল মনগড়া বাতিল মা‘বুদকে পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র তাকেই সত্য ইলাহ বলে বিশ্বাস করা। কুর’আন ও হাদীসে বর্ণিত তাঁর যাবতীয় সুন্দর নামসমূহ এবং তাঁর গুণাবলীকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, “তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনের প্রতিপালক এবং এদের উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, অতএব তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতের ওপরই কায়েম থাকো, তুমি তাঁর সম কোন নাম কি জান।”[৪৮] তিনি আরো বলেন, “গায়েবের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সেই খবর তো তিনি ছাড়া আর কারোই জানা নেই; জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন; একটি পাতাও ঝরে না, যা তিনি জানেন না। মাটির অন্ধকারে একটি শস্যকণাও নেই, নেই কোনো তাজা সবুজ এবং শুকনো কিছু যার বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই।”[৪৯]

[৪৭] ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, খ. ১ম, পৃ. ৩৬
أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

[৪৮] আল কুর’আন, সূরা মারইয়াম : ৬৫
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

[৪৯] আল কুর’আন, সূরা আন‘আম : ৫৯
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

১.৫.২ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান: ফেরেশতাগণ আল্লাহর সন্তান নন। বরং তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তিনি নুর দ্বারা তাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদেরকে তাঁর অবাধ্য না হওয়ার গুণে গুণান্বিত করেছেন। তারা কখনো অহংকার করে না। ফেরেশতাগণের এ সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

"লোকেরা বলে, রহমান তাদেরকে নিজের সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন; তিনি অনেক পবিত্র বরং তারা হচ্ছেন সম্মানিত বান্দাহ। তারা তাঁর সামনে আগে বেড়ে কথা বলেন না, তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করেন। তাদের সামনে পেছনে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন, তারা তাঁর কাছে সে সব লোক ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুপারিশ করেন না যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট রয়েছেন। তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।"[৫০]

আল্লাহ আরো বলেন,

"তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছেন তারা কখনো তাঁর ইবাদাত করতে অহংকার করেন না, তারা কখনো ক্লান্তিও বোধ করেন না, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেন, তারা কখনো কোন অলসতা করেন না।"[৫১]

১.৫.৩ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান: আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী রাসূলগণের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। সত্য ও হকের বর্ণনা দিতে এবং এর প্রতি দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে। এ সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যে সেগুলো আল্লাহর কিতাব। যেমন: ইব্রাহীম (আ.) এর ওপর অবতীর্ণ সহীফাসমূহ, তাওরাত যা মূসা (আ.)কে দেয়া হয়েছে, যাবুর যা দাউদ (আ.) এর কাছে প্রেরিত হয়েছে এবং ঈসা (আ.) এর ওপর নাযিলকৃত ইনজিল। ইরশাদ হয়েছে, "আমি অবশ্যই আমার রাসূলদের কতিপয় সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং আমি তাদের সাথে কিতাব পাঠিয়েছি। আরো পাঠিয়েছি ন্যায়দণ্ড, যাতে করে মানুষ ইনসাফের ওপর কায়েম থাকতে পারে।"[৫২]

এ গ্রন্থসমূহের সর্বশেষ গ্রন্থ হল পবিত্র কুর'আন যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন। এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রদান করে। এবং এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী কিতাবের বিধানসমূহ রহিত হয়ে গিয়েছে। এখন

---

[৫০] আল কুর'আন, সূরা আম্বিয়া : ২৬-২৮

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

[৫১] আল কুর'আন, সূরা আম্বিয়া : ১৯-২০

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

[৫২] আল কুর'আন, সূরা হাদীদ : ২৫

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহর বিধান মানার জন্য শুধু পবিত্র কুর'আনকেই অনুসরণ করতে হবে। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"এ কল্যাণময় কিতাব আমিই নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।"[৫৩]

১.৫.৪ রাসূলগণের প্রতি ঈমানঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতির কাছেই তাঁর নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাদের কাজ ছিল সংশ্লিষ্ট জাতিকে ঈমান আনার জন্য সুসংবাদ পেশ করা এবং আল্লাহর অবাধ্য হলে তাদেরকে সংশোধনের জন্য শাস্তির ভয় দেখানো। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সকল নবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের মৌলিক ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে আল্লাহর সত্য নবী ও রাসূল বলে স্বীকার করা। পবিত্র কুর'আনে ইরাশাদ করা হয়েছে,

"রাসূল সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তাঁর ওপর তাঁর মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও ঈমান এনেছে। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসূলগণের ওপর। আমরা তাঁর নবী রাসূলগণের কারো মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি না।"[৫৪]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করতে চায় তারা বলে, আমরা কয়েকজনকে স্বীকার করি আবার কয়েকজনকে অস্বীকার করি। এর দ্বারা এরা একটা মাঝামাঝি রাস্তা বের করে নিতে চায়। এরাই হচ্ছে সত্যিকারের কাফের, আর আমি এ কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছি এক চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[৫৫] এক্ষেত্রে সকল নবী রাসূলের রিসালাত বা নবুওয়াত প্রকৃতই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এ কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের সমস্ত খবর বিশুদ্ধ একথার ওপর বিশ্বাস করা যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন, "আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি, যেন তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাক।"[৫৬] তিনি আরো বলেন,

---

[৫৩] আল কুর'আন, সূরা আন'আম : ১৫৫

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

[৫৪] আল কুর'আন, সূরা বাকারা : ২৮৫

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

[৫৫] আল কুর'আন, সূরা নিসা : ১৫০-১৫১

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

[৫৬] আল কুর'আন, সূরা নাহল : ৩৬

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Dhaka University Institutional Repository

"রাসূলগণ সুসংবাদবাহী ও ভয় প্রদর্শনকারী, যেন রাসূলগণ আগমণের পর আল্লাহ তা'আলার ওপর মানবজাতির কোন অজুহাত খাড়া করার সুযোগ না থাকে।"[৫৭] আরো বিশ্বাস করা যে, রাসূলগণ সবাই আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সম্মানিত বান্দা। তারা সবাই আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ। তারা কেউ রব, সৃষ্টিকর্তা নন এবং মালিক নন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে মোহাম্মদ বলুন! আমি তো তোমাদের বলি না আমার কাছ আল্লাহ তা'আলার বিপুল ঋণ ভাণ্ডার রয়েছে, না আমি গায়েবের খবর রাখি, আর একথাও বলি না, আমি একজন ফেরেশতা।"[৫৮] আরো বিশ্বাস করা যে নবী রাসূলগণের প্রচারিত ধর্ম ছিল ইসলাম। সবাই মানুষকে এর দিকেই আহবান করেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির হিদায়তের জন্য প্রেরণ করেছেন। তাঁর আগমণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণকে অনুসরণ করার নিদের্শ রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব কিতাব দান করেছিলেন মানুষ তাতে অনেক পরিবর্তন সাধন করেছে। তাদের মনগড়া কথা সংযোগ করেছে। ফলে সে সব কিতাব আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ হিসেবে মানুষের মাঝে হিদায়তের আলো ছড়াবার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর উপর আমল করা স্থগিত ঘোষণা করে পবিত্র কুর'আন দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাতিমুন নাবিয়্যিন অর্থাৎ শেষ নবী ঘোষণা করে পাঠিয়েছেন এবং একমাত্র তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

১.৫.৫ আখিরাতের প্রতি ঈমান: এটি যে বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে তা হল, কেয়ামতের পর সকল মানুষ আবার জীবিত হবে। তারপর তাদের দুনিয়ার সকল কাজের হিসাব নিকাশ হবে এবং তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে– এগুলো বিশ্বাস করা। এছাড়া পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সকল কিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। যেমন: কবরের সাওয়াল-জাওয়াব, আযাব, নিয়ামত, হাশর, পুলসিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ইত্যাদি। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

"এ লোকগুলো কি এটা বুঝতে পারেনা যে, মহান আল্লাহ তা'আলা অসমানসমূহ ও যমীন বানিয়েছেন এবং এ সবকিছু সৃষ্টি যাকে সামান্যতম ক্লান্তও করতে পারেনি, তিনি কি একবার মরে গেলে মানুষকে পুনরায়, জীবন দান করতে সক্ষম? অবশ্যই তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[৫৯]

---

[৫৭] আল কুর'আন, সূরা নিসা : ১৬৫

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

[৫৮] আল কুর'আন, সূরা আন'আম : ৫০

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

[৫৯] আল কুর'আন, সূরা আহকাফ : ৩৩

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে, আমি তোমাদের এমনিই অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমার কাছে একত্রিত করা হবে না?"[৬০]
"নিশ্চয়ই কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহর কাছে রয়েছে।"[৬১]
"অতএব যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে।"[৬২]
"নিশ্চয়ই তিনি যখন কোনো কাজের ইচ্ছে করেন তিনি বলেন হও আর তা হয়ে যায়।"[৬৩]

১.৫.৬ তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান: মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাকদীরের ভালো-মন্দ সকল বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে অবহিত এ কথা বিশ্বাস করা। এছাড়া আরো বিশ্বাস করা যে, তিনি তাকদীরের সকল বিষয়ই লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন, সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই তাঁর ইচ্ছা ছাড়া সংগঠিত হয় না। যা কিছু আছে, যা কিছু ঘটে, তার সবই সকল বৈশিষ্ট্য স্বভাব ও তৎপরতাসহ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেছেন " নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সব কিছু সম্পর্কে অবগত।"[৬৪] তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, "গায়েবের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সেই খবর তো তিনি ছাড়া আর কারোই জানা নেই; জলে-স্থলে যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন প্রকটি পাতা ঝড়ে না, যার খবর তিনি জানেন না। মাটির অন্ধকারে একটি শস্য কণাও নেই, নেই কোনো তাজা সবুজ, শুকনো, যার বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই।"[৬৫]

১.৬ ইহসান

দীন ইসলামের তৃতীয় স্তর হল ইহসান। শাব্দিক অর্থে কারো অনিষ্ট করা বা কোনরূপ খারাপ ও মন্দ আচরণের বিপরীতকে বোঝায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন, যারা তাকওয়ার জীবন যাপন করে এবং যারা ইহসানের সাথে আমল করে।"[৬৬]

---

৬০ আল কুর'আন, সূরা মুমিনুন : ১১৫

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

৬১ আল কুর'আন, সূরা লুকমান : ৩৪ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

৬২ আল কুর'আন, যিলযাল : ৭-৮ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

৬৩ আল কুর'আন, ইয়াসিন : ৮২ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون

৬৪ আল কুর'আন, আনকাবুত : ৬২ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

৬৫ আল কুর'আন, সূরা আন'আম : ৫৯

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

৬৬ আল কুর'আন, সূরা নাহল : ১১৮

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

পরিভাষায় প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে সব বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণকারী ও সম্যক জ্ঞাত হিসেবে জানা ও মানাকে ইহসান বলা হয়। জিবরাঈল (আ.) যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, তুমি যদি ঐ পর্যায়ে উন্নীত হতে না পার অর্থাৎ তাঁকে না দেখ তবে এটা মনে রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।"[৬৭]

অর্থাৎ ইসলামের দাবী হল এর অনুসারীরা সর্বাবস্থায় সবসময় এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তার প্রভু তার সামনে উপস্থিত এবং সে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে। মালিক সামনে থাকলে তার অধীনস্থরা তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করে এবং ত্রুটি বিচ্যুতিকে পরিহার করে। এরূপ মানসিকতা হল ইহসানের প্রথম স্তর। আর দ্বিতীয় স্তর হল, প্রথম স্তরে উপনীত হতে না পারলেও বান্দা স্বীয় অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করবে যে, তাঁর প্রভু সবসময় তার কাজ দেখছেন এং সর্বাবস্থায় পর্যবেক্ষণ করছেন।

১.৭ মুসলিমের পরিচয়

مسلم শব্দটি **اسم فاعل** এক বচনের শব্দ। এর অর্থ যে ইসলাম গ্রহণ করেছে বা আনুগত্য পোষণ করেছে। এর বহুবচন হল **مسلمون . المعجم الوسيط** অভিধান বেত্তার মতে,

الْمُسلم من صدق برسالة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأظْهر الخضوع وَالْقَبُول لَهُ

"যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালতের প্রতি সত্যতা জ্ঞাপন করেছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করে তা গ্রহণ করেছে।"[৬৮]

পবিত্র কুর'আনে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথ ভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।"[৬৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"[৭০] তিনি আরো বলেছেন, **الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ** "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই সে তাকে অত্যাচার করে না।"[৭১]

---

[৬৭] ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান, খ. ১ম, পৃ. ৩৬
قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

[৬৮] ইব্রাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য, *মু'জামুল ওয়াসিত*, (কায়রো : দারুদ দা'ওয়াহ, তা.বি.), খ. ১ম, পৃ. ৪৪৬

[৬৯] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান : ১০২

এ কথা সর্বজন জ্ঞাত যে, সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছু একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র, গাছ-পালা, পশু-পাখী সমস্ত কিছুই সুশৃংখল ভাবে আল্লাহর আদেশের অনুসরণ করে। কখনো অবাধ্য হয়না। আকাশ ও জমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত কিছু, এমনকি আকাশের সবচেয়ে বড় নক্ষত্র থেকে শুরু করে মাটির ক্ষুদ্র বালু কনা পর্যন্ত এই নিয়ম মেনে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামী নের আনুগত্য করে। আর যেহেতু ইসলাম অর্থ আল্লাহর সমস্ত আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্য পোষণ করা, সে অর্থে আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, জল-স্থল, গাছ-পাথর, জীব-জানোয়ার সবাই মুসলিম বা অনুগত।[৭২] আর যে মানুষ তার রবকে চিনতে পারেনি, সে তাঁর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে। তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্যদের ইবাদাত করে, তাঁর সাথে শির্‌ক করে। অতএব, সে ব্যক্তি তার প্রতি অনুগত যার ইবাদাত সে করে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দু'টি বিষয় দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একটি হল ফিতরাত বা সত্য গ্রহণের প্রকৃতি। আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রতি আনুগত্য পোষণ করার প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। যে কারণে মানুষ আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ও নৈকট্যে তৃপ্তি পায়। তিনি যে ন্যায়, সততা ও উত্তমকে পছন্দ করেন, মানুষের প্রকৃতি হল তা পছন্দ করা। আবার সাধারণ ভাবে মানব প্রকৃতি হল অন্যায়, মন্দ, অশ্লীল তথা যাবতীয় খারাপ বিষয়কে ঘৃণা করা যা আল্লাহও অপছন্দ করেন। সম্পদ, সন্তান ও পরিবারের প্রতি ভালবাসা, পানাহার এবং বিবাহ মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়। আরেকটি বিষয় হল ,মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা। আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। ন্যায়-অন্যায়, হেদায়াত-ভ্রান্তি, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে অবতীর্ণ করেছেন আসমানী কিতাব। এরপর মানুষকে প্রদান করেছেন বিবেক, বুদ্ধি ও স্বাধীনতা যেন সে তার ইচ্ছাকে পরিচালনা করতে পারে। এখন সে ইচ্ছে করলে সঠিক পথে যেতে পারে আবার ইচ্ছে করলে ভ্রান্তির দিকেও এগিয়ে যেতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেছেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

"আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, সে চাইলে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় কাফের হয়ে যাবে।"[৭৩]

অতএব মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যে ইসলামকে আল্লাহর প্রেরিত দীন স্বীকৃতি দিয়ে নিজের জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেছে।

---

[৭০] ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, বাব আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন ইয়াদিহি ওয়া লিসানিহি, খ. ১ম, পৃ. ১১

[৭১] ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাব তাহরীমুয যুলম, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৯৯৬

[৭২] মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

لأن الإسلام معناه الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا اعتراض كما عرفت آنفا، فالشمس والقمر والأرض مستسلمة، والهواء والماء والنور والظلام والحرارة مستسلمة، والشجر والحجر والأنعام مستسلمة

[৭৩] আল কুর'আন, সূরা দাহর : ০৩

১.৮ সম্প্রদায়

মানব সভ্যতার শুরু প্রথমত ব্যক্তি ও পরবর্তীতে সমাজের ধারণার মধ্য দিয়ে তা ব্যপ্তি লাভ করেছে। বর্তমানকালে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তার কারণে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা সবচেয়ে বৃহৎ সংগঠন হিসেবে জনগণ তথা নাগরিকদের কাছে গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। নাগরিকতা একটি সামষ্টিক প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা হলেও এর কার্যকারিতা বস্তুত: নির্ধারিত হয় সমাজব্যবস্থায় বসবাসরত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক আচরণ ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে। সমাজব্যবস্থায় বসবাসরত এ সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিকে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রচিন্তায় গোষ্ঠী, শ্রেণী, সম্প্রদায়, দল ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এই তত্ত্বগুলিকে কখনও স্বনামে আবার কখনও এগুলোর সাথে বিভিন্ন প্রত্যয়সমূহ যেমন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শব্দসমূহ প্রয়োগের দ্বারা বিশেষায়িত করা হয়ে থাকে।

সম্প্রদায় শব্দটি ইংরেজি শব্দ কমিউনিটির বাংলা অর্থ। কমিউনিটি শব্দটি প্রাচীন ফরাসী শব্দ *comuneté* থেকে এসেছে যার আদিরূপ ল্যাতিন *communis* শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো যা সাধারণত ঘটে থাকে। তবে বৃহৎ অর্থে সংঘবদ্ধ সামাজিক অবস্থাকে বুঝাতে গিয়ে এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৭৪] তবে সম্প্রদায় হল একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর একই স্থানে বসবাস অথবা একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিদ্যমানতা (a group of people living in the same place or having a particular characteristic in common).

সম্প্রদায় এমন একটি মানব সংগঠন যার সদস্যবর্গ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানে অভিন্ন সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে বসবাস করে। সম্প্রদায়ের সদস্যবর্গ তাদের জীবনপ্রণালীতে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আমরা প্রায়শ গ্রামীণ সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, উপজাতি সম্প্রদায় ইত্যাদি বলে থাকি। কিন্তু শহুরে সম্প্রদায় কথাটি কিছুটা বেমানান। কেননা শহরবাসীর জীবনপ্রণালী, সামাজিক সম্পর্ক, সংস্কৃতি গ্রামীণ বা উপজাতি সম্প্রদায়ের ন্যায় সহযোগিতাপূর্ণ বা পরস্পর নির্ভরশীল নয়।

Paul James সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন যে, সম্প্রদায় হলো ব্যক্তিবর্গের সম্মিলন বা সম্পর্ক যারা উদ্দেশ্যগতভাবে অপেক্ষাকৃত সময়োচিত সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কিত যা বংশগত সম্পর্কের বাইরে প্রসারিত হয় এবং পারস্পরিকভাবে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, এটি গুরুত্ববহ সেই সম্পর্ক যা একটি গোষ্ঠীর সামাজিক পরিচিতি এবং সামাজিক আচরণকেও নির্দেশ করে। (One broad definition which incorporates all the different forms of community is "a group or network of persons who are connected (objectively) to each other by relatively durable social relations that extend beyond immediate genealogical ties, and who

[৭৪] "Community" Oxford Dictionaries. May 2014. Oxford Dictionaries

mutually define that relationship (subjectively) as important to their social identity and social practice.[৭৫])

সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষে সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে নিম্নরূপে:

যখনই কোন গোষ্ঠীর সদস্যরা এমনভাবে একত্রে বসবাস করে যে, তারা কতিপয় বিশেষ স্বার্থে অংশীদার না হয়ে বরং একটি সাধারণ জীবন যাত্রার অংশীদার হয়, সে রকম যেকোন জনগোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলা হয়। [৭৬]

বি.ভূষণ তাঁর Dictionary of Sociology নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, "বস্তুতপক্ষে সম্প্রদায় হচ্ছে একটি সংগঠিত জনগোষ্ঠী, যারা একটি ভৌগোলিক এলাকা দখল করে আছে। এ জনগোষ্ঠী অভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে একত্রে অংশগ্রহণ করে এবং আবশ্যকীয়ভাবে একটি নিজস্ব প্রশাসনিক সামাজিক এককসহ কিছু সাধারণ মূল্যবোধ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপলব্ধির মাধ্যমে একে অন্যের সাথে অবস্থান করে।"[৭৭] (Originally the community denoted a collectivity of people who occupied a geographical area: people who were engaged together in economic and political activities and who essentially constituted a self-governing social unit with common values and experiencing feeling of belonging to one another).

ম্যাকাইভার ও পেজ তাদের Society গ্রন্থে বলেছেন, 'কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোষ্ঠীর সদস্যরা যেখানেই বাস করুক না কেন, একত্রে বসবাস করতে গিয়ে তারা যদি জীবনের মৌল ও সাধারণ স্বার্থগুলো কোন বিশেষ স্বার্থে ভোগ না করে একই সাথে ভোগ করে, তবে তারা সম্প্রদায় গঠন করেছে বলা যায়।[৭৮]

সম্প্রদায়ে আমরা স্বনির্ভরতার ছোঁয়া দেখতে পাই। এখানে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থে নয় বরং সামগ্রিক জীবনের মৌল শর্তাবলী পূরণের জন্য এর সদস্যরা পরস্পরের সহযোগিতা করে। সম্প্রদায়ে সমাজের ন্যায় অসংখ্য প্রথা-প্রতিষ্ঠান নেই। এটি কিছুটা ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ। তাই এর অধিবাসীরা অভিন্ন প্রথা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত। আধুনিক আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্ব-নির্ভরতার বিষয়টি ক্রমশ গৌণ হয়ে যাচ্ছে। তবে প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সম্প্রদায়কে সহজে সনাক্ত করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- বসবাসের অঞ্চল (locality)

---

[৭৫] James, Paul; Nadarajah, Yaso; Haive, Karen; Stead, Victoria (2012). pdf download*Sustainable Communities, Sustainable Development: Other Paths for Papua New Guinea*. Honolulu: University of Hawaii Press. p. 14. See also James, Paul (2006).*Globalism, Nationalism, Tribalism: Bringing Theory Back In —Volume 2 of Towards a Theory of Abstract Community*. London: Sage Publications.

[৭৬] এ এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান ও মোঃ ইকবাল হুসাইন, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, (ঢাকা : লেখাপড়া প্রকাশনী, ২০১০ খ্রী.), পৃ. ৯৮

[৭৭] Bhushan, B. Dictionary of Sociology-(Delhi : Anmol Publications Pvt. Ltd., 1989)

[৭৮] MacIver, R .M. and Page , *Society*, (London: MacMillan Company, 1967)

ও সম্প্রদায়গত মনোভাব (community sentiment). এ দুটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এখনও গ্রামের জনগোষ্ঠী কিংবা উপজাতীয় সম্প্রদায় এমন একটি শহরের অলিগলি বা মহল্লার জনগণ তাদেরকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র ও উত্তম বলে চিহ্নিত করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা নির্দিষ্ট এলাকায় একই ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথা, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি অনুসরণের মাধ্যমে বসবাস করে এবং অন্য সম্প্রদায় থেকে নিজেদেরকে পৃথক ও স্বতন্ত্র মনে করে।

১.৯ সাম্প্রদায়িকতা

সাম্প্রদায়িকতা প্রত্যয়টি সম্প্রদায় প্রত্যয়টির একটি বিশেষায়িত রূপ যা মূলতঃ নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমাজব্যবস্থার মত বৃহৎ পরিসর ব্যতিরেকে সমাজের ক্ষুদ্র অংশ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে বুঝিয়ে থাকে। বিজ্ঞ মহলে এটা পরিচিত যে, সাম্প্রদায়িকতা হলো বৃহৎ সমাজের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে বরং একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য (allegiance to one's own ethnic group rather than to the wider society).

সাম্প্রদায়িকতা সামাজিক বাস্তুসংস্থান তার পরিবেশগত দর্শনকে পরিপূর্ণ করার জন্য একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার দৃশ্যমান ফলাফল জাতি-গোষ্ঠীতে চরম দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায়। যদিও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা ধর্মকেন্দ্রিক হয়। তবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলনীতি বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের মৌলনীতি সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিরসনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করে যা সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের ক্ষেত্রে একমাত্র পন্থা হিসেবে সুধীমহলে সুবিবেচিত।

সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক একটি সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতিমালা, যেগুলো সে সম্প্রদায়ের সকল সদস্যকে পারস্পরিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ করে এবং একইভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোতে আবদ্ধ রাখে। কোনো কোনো সময়ে এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে এবং দেখা দেয়ও; যা পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। সাম্প্রদায়িক এসব বিরোধের ন্যায়সঙ্গত সমাধান করা সম্ভব হয় না বলে তা করুণ পরিণতির দিকে ধাবিত হয়।

ঐতিহাসিকভাবে, সম্প্রদায়গুলোর বৈশিষ্ট্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিত করার সবচেয়ে উপযুক্ত মানদণ্ড হিসেবে ধর্মকে গ্রহণ করা যায়। ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে যোগ-সম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠা স্বতন্ত্র জিনিস। শুধু তাই নয়; সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে স্বতন্ত্রভাবে না দেখলে তার স্বরূপকে ঠিক বোঝা যাবেনা। ধর্মের আচার-বিচার এবং তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তাকে আমরা বলি ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পৃথক জিনিস। কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া হয় যখন সে এক বিশেষ

ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচারণ ও ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে।[৭৯]

বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমায় ধর্মকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাস্প এর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এ কারণে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও উপ-ব্যবস্থা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সাহিত্য ও দর্শন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ধর্মই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। পূর্বে ধর্মই ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের জন্য দিকনির্দেশনার প্রধান উৎস। অবশ্য, বাংলার আদি ইতিহাসই এদেশের জনগণকে তাদের জাতি-গোষ্ঠীগত ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। খ্রিস্টীয় যুগ শুরু হওয়ারও অনেক পূর্বে যখন বাংলায় আর্যায়নের ধারা অব্যাহত ছিল, তখন জনগণের পরিচয় শনাক্ত করার প্রধান মানদন্ড ছিল জাতিত্ব (ethnicity)। দেশের শাসন-ক্ষমতার অধিকারী আর্যদের চোখে এদেশীয় অনার্যরা ছিল ব্রাত্য জাতি অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতির চেয়ে অনেক নিম্নমানের প্রাকৃত সংস্কৃতির ধারক জনগোষ্ঠী। একইভাবে, পরাভূত প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর চোখে আর্যরা ছিল ভিন্ন সংস্কৃতি তথা সংস্কৃত সংস্কৃতির ধারক জাতি বা সম্প্রদায়। যদিও আর্য ও অনার্যরা কিছুকালের জন্য পরস্পরের মধ্যে একটা দূরত্ব বা ব্যবধান বজায় রাখে, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাকৃত সংস্কৃতি তার আত্তীকরণ ক্ষমতাবলে সংস্কৃত সংস্কৃতিকে তার অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয় এবং তা দ্বারা প্রভূত পরিমাণে লাভবান হয়। ধারাবাহিক আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বঙ্গীয় সমাজের বৃহত্তর অংশকে আর্য-সদৃশ করে তোলা হয়, অথচ এ প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য পুরোপুরি বজায় থাকে, যা আর্য আগ্রাসনের মুখে শুধু যে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে তা নয়, বাংলা সহ বহু দেশীয় ভাষার উদ্ভব ঘটায়।

উপর্যুক্ত আর্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত মূল নৃ-গোষ্ঠী পর্যায়ের (এথনিক) জাতিগুলোকে (আর্য ও অনার্যদের) একটি বর্ণসোপানে বিভক্ত করে। তথাপি আর্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেও জাতি টিকে ছিল। জাতিগুলোর আরোপিত উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতার ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান বর্ণ তার মধ্যে কতিপয় উপবর্ণ গড়ে তোলে। যখন জনগণকে বর্ণ এবং জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তখন আঞ্চলিকতাকে কখনো এর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি, যদিও একথাও সত্য যে বাংলার বিশেষ এলাকা প্রধানত অধ্যুষিত ছিল একটি বিশেষ জাতি দ্বারা।

সাম্প্রদায়িকতাকে বিভিন্ন লেখকগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন: ম্যূরে বুকচিন (Murray Bookchin) বলেছেন, সাম্প্রদায়িকতা সরকারের একটি তত্ত্ব বা সরকারের একটি পদ্ধতি যেখানে স্বাধীন গোষ্ঠীসমূহ একটি ফেডারেশনে অংশগ্রহণ করে এবং সেই সাথে নীতি ও সাম্প্রদায়িক মালিকানার চর্চা করে।[৮০] (communalism as a theory of government or a system of government in which independent communes participate

[৭৯] বদরুদ্দিন উমর , *সাম্প্রদায়িকতা*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫), পৃ. ১১
[৮০] *Random House Unabridged Dictionary*, Second Edition,1998, New York.

in a federation", as well as "the principles and practice of communal ownership").
সাম্প্রদায়িকতা হলো, জাতিরাষ্ট্রের কল্পিত সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে বরং সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে বাস্তবিকভাবে তুলে ধরে। (allegiance to the community is seen as more real than allegiance to the imagined community of the nation-state.)[৮১]
সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা হলো জাতি বা গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলক অবস্থা যেখানে তারা সম্প্রদায়গত মৌল সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং বর্ণগত উদ্দেশ্য লাভে একাগ্র থাকে। তবে দর্শনগত বা ধর্মীয় বিষয়টি সম্প্রদায়গত সংঘাত বা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির একমাত্র উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১.১০ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

পৃথিবী ব্যাপী মানুষে মানুষে যে অরাজকতা, সাম্প্রদায়িকতা, হানা-হানি, বিবাদ, সংঘাত-সহিংসতা বিরাজমান। যার ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিভাষাটি একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। এ পরিভাষাটিতে দুটি শব্দ বিদ্যমান। এগুলো হল - 'সাম্প্রদায়িক' যার ইংরেজী প্রতিশব্দ communal এবং সম্প্রীতি যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Harmony. বাংলা অভিধানে সাম্প্রদায়িক শব্দটির অর্থ করা হয়েছে-দল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পর্কিত, সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি বিশিষ্ট।[৮২] Oxford dictionary এর ভাষ্যে 'involving different groups of people in a community.'[৮৩] আরো বিস্তারিত ভাবে বললে, 'Involving people from many different races, religions or language groups.'[৮৪]
সম্প্রীতি শব্দটির অর্থ হল সদ্ভাব, সৌহার্দ, প্রেম, প্রণয়, সন্তোষ।[৮৫] Harmony শব্দের অর্থ করা হয়েছে ' A state of peaceful existence & agreement.'[৮৬] Longman

---

[৮১] Giorgio Shani, Indigenous Modernities: Nationalism and Communalism in Colonial India, *The International Studies Association of Ritsumeikan University: Ritsumeikan Annual Review of International Studies,* 2005. ISSN 1347-8214. Vol.4, pp. 87-112

[৮২] আহমদ শরীফ সম্পাদিত , *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১২ খ্রী.),পৃ. ৫৫৯

[৮৩] A S Hornby,*Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (UK : Oxford University Press, 2000), Page. 243

[৮৪] *Longman Dictionary of Contemporary English*, (Essex : Pearson Education Limited, England, 2010), Page. 33

[৮৫] *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

[৮৬] *Oxford Advanced Learner's Dictionary,* page. 589

Dictionary তে উল্লেখ করা হয়েছে, 'When people live or work together without fighting or disagreeing with each other.'[৮৭]

তত্ত্বগতভাবে সম্প্রদায় প্রত্যয়টির সাথে সংহতি শব্দটি যোগ হয়ে 'সাম্প্রদায়িক সংহতি' রূপে গণ্য হয়েছে যেখানে বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যকার পারস্পরিক একাত্মতা ও সুশৃঙ্খল বোঝাপড়াকে বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রদায়কে বেশীরভাগ তাত্ত্বিকগণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দান করেছেন। আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকেও তাত্ত্বিকগণ ধর্মীয় ঐতিহ্য বলেই ধারণা দিতে চান। নন্দগোপাল মেনন'র মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো ধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি ফলাফল (communal harmony is the product of religious traditions).[৮৮] অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যকার সদ্ভাব ও সম্প্রীতি আনয়নের চেষ্টা করে থাকে। উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক কল্পনাসমূহ হতে উৎসারিত সহাবস্থানের নৈতিক অবস্থানকে এগিয়ে নেয়া (Communal harmony, on the other hand, strives to create goodwill and harmony among various communities. The aim is to foster an ethic of coexistence rooted in and/or inspired by religious and cultural values and social imaginaries)।[৮৯]

আশিষ নন্দীর মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কার্যকরী ও সফল হয় কারণ রাষ্ট্রীয় পরিসীমার বাইরে এর অবস্থান এবং এর অধিবাসীরা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুশীলন এবং মেলবন্ধনের অনুভূতি দ্বারা সৃষ্ট যা সংকীর্ণ গোত্রীয় পরিধির বাইরে অবস্থান করে (Communal harmony works and is successful because it lies outside the realm of the state and its subjects are shaped by religious values, practices, and feelings of camaraderie that transcend narrow sectarian boundaries).[৯০]

বিজয় পাণ্ডে বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এমন নির্দিষ্ট বিবেকবোধ, অনুভূতি এবং প্রভাব সৃষ্টি করে যা শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়তা দান করে। এটা সংজ্ঞায়িত করা উপযুক্ত হবে যে, ইহা ধর্মকে রাজনীতিকরণ করার চেয়ে বরং বিরোধীতা করে সাম্প্রদায়িকতাকে যা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার সন্দেহ, ভয় এবং শত্রুতার একটি পূর্বশর্ত (Communal harmony shapes certain sensibilities, dispositions, and effects that facilitate the

---

৮৭ *Longman Dictionary of Contemporary English,* page. 802

৮৮ Nandagopal R. Menon, *Communal Harmony as Governmentality: Reciprocity, peace-keeping, state legitimacy, and citizenship in contemporary India,* Modern Asian Studies 49(2), 2015, pp. 393–4

৮৯ Ibid

৯০ Ashis Nandy, 'The politics of secularism and the recovery of religious toleration', in Rajeev Bhargava (ed.), Secularism and Its Critics (New Delhi : Oxford University Press, 1998), pp. 321–344

creation and maintenance of peace and stability. It opposes communalism, which, rather than politicized religion, is better redefined as 'a condition of suspicion, fear and hostility between members of different religious communities).[৯১]

অতএব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে বিভিন্ন জাতি, দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের একই সমাজ বা দেশে একত্রে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করার নীতিকে বুঝায়। এমন সমাজ বা দেশে বিরাজমান বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদের অনুসারী ব্যক্তিদের মধ্যে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, সংঘাত-সহিংসতার পরিবর্তে পারস্পরিক ভালবাসা, সাম্য ও সৌহার্দভাব পরিলক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১.১১ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম সম্প্রদায়সমূহ

এ বসুন্ধরা নানা শ্রেণী, পেশা, বর্ণ, ধর্ম, ভাষাভাষী মানুষের মিলনভূমি। ইসলাম ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য সমস্ত মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক, ইসলামের অনুসারী বা মুসলিম এবং দুই, ইসলামের অনুসারী নয় বা অমুসলিম। ওলামায়ে কিরাম অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্প্রীতির মানদণ্ড তৈরীর লক্ষ্যে অমুসলিমদেরকে বিভিন্নভাবে বিভাজিত করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের ধরনের ওপর ভিত্তি করে তাদের সাথে সম্পর্ক নির্ধারিত হবে। আল্লামা ইব্নুল কায়্যিম আল জাওযিয়া তাঁর "আহকামু আহলিয যিম্মাহ" নামক গ্রন্থে অমুসলিমদেরকে এভাবে বিভাজিত করেছেন, অমুসলিম দুই প্রকার। এক, শত্রু পক্ষ; দুই, চুক্তিবদ্ধ পক্ষ। চুক্তিবদ্ধ পক্ষ আবার তিন প্রকার : ক) আহলু যিম্মাহ, খ) আহলু হুদনাহ, গ) আহলু আমান [৯২]

শায়খ নাজিহ ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ অমুসলিমদেরকে প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, "*Dar-ul-Harb* or the household of War, which refers to non-Muslims who are not bound by a peace treaty, or covenant, and whose blood and property are not protected by the law of vendetta or retaliation; and *Dar-us-Salam or* the household of Peace," [৯৩]

---

[৯১] Pandey, The Construction of Communalism in Colonial North India , pp. 6–7

[৯২] ইব্নুল কায়্যিম আজ জাওযিয়া, আহকামু আহলুয যিম্মাহ, (দাম্মাম: রামাদি লিন নাশর, ১৪১৮ হি.) খ. ২য়, পৃ. ৮৭৩

[৯৩] Abdullah, Najih Ibrahim Bin, *The Ordinances of the People of the Covenant and the Minorities in an Islamic State*, Balagh Magazine, Cairo, Egypt, Volume 944, May 29, 1988; Volume 945, June 5, 1988.

তারপর দারুস সালামকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, এক. যিম্মী, দুই. আহলু হুদনাহ, তিন. মুস্তা'মিন। [৯৪]

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে অমুসলিমগণ হলেন চার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যথা,

ক. আহলুয যিম্মাহ (أَهْلُ ذِمَّةٍ)

খ. মু'আহাদ বা আহলু হুদনাহ (أَهْلُ هُدْنَةٍ)

গ. মুস্তা'মিন বা আহুলু আমান (أَهْلُ أمَان)

ঘ. হারবী (حَربِي)

ক. **আহলুয যিম্মাহ**

মুসলিম আইনবিদগণ যিম্মী বা আহুলুয যিম্মাহ শব্দটিকে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম স্থায়ী অধিবাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। এটি একটি আরবী শব্দ। আরবীতে শব্দটি হল ذمة এর অর্থ الكفالة و العهد অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বভার। এর বহুবচন হল ذمام যেমন বলা হয় و فلان له ذمة اى حق (অমুকের জন্য রয়েছে যিম্মা অর্থাৎ অধিকার) আলী (রা.) এর কথায়ও শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি বলেছেন, ذمتى رهينه و أنابه زعيم اى ضمانى و عهدى رهن فى الوفاء به
অর্থাৎ তার বর্ম আমার হেফাজতে এবং আমি এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল অর্থাৎ বর্মটি আমার জিম্মাদারীতে এবং এটি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমি দায়বদ্ধ।

الذمام و الذمامة অর্থ الحرمة সংরক্ষণ করা আর الذمام হল كل حرمة تلزمك اذا ضيعتها المذمة এজন্যেই চুক্তিবদ্ধদেরকে বলা হয় আহলুয যিম্মাহ। আর মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা জিযিয়া প্রদান করে তারাও যিম্মী নাগরিক ।[৯৫] জাওহারী ও আবু ওবায়দা যথাক্রমে الذمة এর অর্থ করেছেন العقد (চুক্তি) এবং الأمان (নিরাপত্তা)। এছাড়া ذمة শব্দটির অর্থ বর্ণনা করে لسان العرب গ্রন্থকার আরো বলেন,[৯৬]

ذِمامة: حُرْمَةٌ وَحَقٌّ. وَفِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الذِّمَّة والذِّمامِ، وَهُمَا بِمَعْنَى العَهْد والأَمانِ والضَّمانِ والحُرْمَةِ وَالْحَقِّ، وسُمِّيَ أَهل الذِّمَّةِ ذِمَّةً لِدُخُولِهِمْ فِي عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ وأَمانهم.

ইব্‌নুল কায়্যিম ذمة শব্দটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন,[৯৭]

فَإِنَّ الذِّمَّةَ مِنْ جِنْسِ لَفْظِ الْعَهْدِ، وَالْعَقْدِ.وَقَوْلُهُمْ: " هَذَا فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ " أَصْلُهُ مِنْ هَذَا: أَيْ فِي عَهْدِهِ، وَعَقْدِهِ، أَيْ فَأَلْزَمَهُ بِالْعَقْدِ، وَالْمِيثَاقِ، ثُمَّ صَارَ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَا يُمْكِنُ أَخْذُ الْحَقِّ مِنْ جِهَتِهِ، سَوَاءٌ وَجَبَ بِعَقْدِهِ، أَوْ بِغَيْرِ عَقْدِهِ، كَبَدَلِ الْمُتْلَفِ فَإِنَّهُ يُقَالُ: هُوَ فِي ذِمَّتِهِ، وَسَوَاءٌ وَجَبَ بِفِعْلِهِ، أَوْ بِفِعْلِ وَلِيِّهِ، أَوْ وَكِيلِهِ،

---

[৯৪] Ibid

[৯৫] মুহাম্মদ বিন মুকরিম বিন আলী ও অন্যান্য, *লিসানুল আরব*, (বৈরুত: দারুস সাদির, ১৪১৪হি.), খ. ১২, পৃ. ২২১

[৯৬] প্রাগুক্ত

[৯৭] ইব্‌নুল কায়্যিম, প্রাগুক্ত

كَوَلِيِّ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَوَلِيِّ بَيْتِ الْمَالِ وَالْوَقْفِ، فَإِنَّ بَيْتَ الْمَالِ، وَالْوَقْفِ يَثْبُتُ لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ، كَمَا يَثْبُتُ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَيُطَالِبُ وَلِيُّهُ الَّذِي لَهُ أَنْ يَقْبِضَ لَهُ، وَيَقْبِضَ مَا عَلَيْهِ.

অধিকাংশ ফকীহ এর মতে পরিভাষায় আহলুয যিম্মাহ বলতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মোতাবেক পরিচালিত রাষ্ট্রের এমন স্থায়ী অমুসলিম অধিবাসীদেরকে বোঝায় যারা জিযিয়া প্রদান করে, তাদের জন্য চিরস্থায়ী অধিকার সংরক্ষিত থাকে এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের আনুগত্য করতে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে।[৯৮]
আল মাওসূ‘আতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুওয়ািয়তিয়্যাহ গ্রন্থে আহলুয যিম্মাহ এর পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, ফকীহদের পরিভাষায় আহলুয যিম্মাহ দ্বারা যিম্মীদেরকে বোঝানো হয়েছে। যারা ইমামের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় ও ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে নেয়ার শর্তে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।[৯৯]
আবুল হুসাইন আহমদ ইব্ন ফারিস আর রাযী বলেছেন,

وَيُقَالُ أَهْلُ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُمْ أَدَّوُا الْجِزْيَةَ فَأَمِنُوا عَلَى دِمَائِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ.

অর্থাৎ যারা তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্য জিযিয়া আদায় করে তাদেরকে আহলুয যিম্মাহ বলা হয়।[১০০]
এছাড়া আহলুয যিম্মাহর পরিচয়ে আরো বলা হয়েছে,

أهلُ الذِّمة، وهم الَّذين يُؤَدُّون الجِزية من الْمُشْركين كلهم

অর্থাৎ সমস্ত মুশরিকদের মধ্য হতে যারা জিযিয়া আদায় করে তারা আহলুয যিম্মাহ। [১০১]
ড.আবদুল করীম আল যায়দান এর মতে,

‘*Ahl ul-Dhimma*’ , means ‘People of the Covenant ,’ because they are protected under the covenant extended to them by Prophet Muhammad and the Muslims. Non-Muslims are guaranteed protection in the Muslim society as long as they pay a head tax and abide by the specific

---

৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৪

" أَهْلُ الذِّمَّةِ " عِبَارَةٌ عَمَّنْ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ، وَهَؤُلَاءِ لَهُمْ ذِمَّةٌ مُؤَبَّدَةٌ، وَهَؤُلَاءِ قَدْ عَاهَدُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِذْ هُمْ مُقِيمُونَ فِي الدَّارِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

৯৯ আলেমদের একটি জামা‘আত, *মাওসূ‘আতুল ফিকহিয়্যাহ*, (কুয়েত : ওয়ারাতুল আওকাফি ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাতি, তা.বি.), খ. ৭ম, পৃ. ১২০-১২১

الذِّمَّةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ الذِّمِّيُّونَ، وَالذِّمِّيُّ نِسْبَةٌ إِلَى الذِّمَّةِ، أَيِ الْعَهْدِ مِنَ الإِمَامِ – أَوْ مِمَّنْ يَنُوبُ عَنْهُ – بِالأَمْنِ عَلَى وَالْمُرَادُ بِأَهْل نَفْسِهِ وَمَالِهِ نَظِيرَ الْتِزَامِهِ الْجِزْيَةَ وَنُفُوذَ أَحْكَامِ الإِسْلاَمِ

১০০ আবুল হুসাইন আহমদ ইব্ন ফারিস আর রাযী, *মু‘অজামু মাকাইসুল লুগাহ*, (দামেশক : দারুল ফিকর, ১৩৯৯হি.), খ. ২, পৃ. ৩৬৪

১০১ আবু মানসুর মুহাম্মদ বিন আহমদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, প. ২৯৯

legislations mentioned in Islamic Law. This covenant of protection is not limited to a specific duration; rather, stays in effect as long as those with whom the covenant is made abide by its conditions. [১০২]

শায়খ নাজিহ ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ বলেছেন,

Zimmis (those in custody) are non-Muslim subjects who live in Muslim countries and agree to pay the *Jizya* (tribute) in exchange for protection and safety, and to be subject to Islamic law. These enjoy a permanent covenant. [১০৩]

মোদ্দাকথা আহলুয যিম্মাহ বা যিম্মীগণ হল ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং জিযিয়া প্রদান করে। আর রাষ্ট্র তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেয়। এছাড়া তারা মুসলমানদের অনুরূপ নাগরিক অধিকার ভোগ করে। ইসলামী রাষ্ট্র তার নিজের ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে, সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তাদের এই অধিকারসমূহ ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার কারো নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من ظلم ذميا فأن خصمه يوم القيامة

“যে ব্যক্তি কোন যিম্মীর প্রতি জুলম করল, তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হব।” [১০৪]

খ. মু‘আহাদ বা আহলু হুদনাহ

মু‘আহাদ অর্থ চুক্তিবদ্ধ। এদেরকে আহলুল ‘আহদ এবং আহলুল হুদনাহও বলা হয়। আহদ শব্দের অর্থ চুক্তি আর হুদনাহ শব্দের অর্থ صلح বা সন্ধি। অর্থাৎ **هدنة – صلح – عهد –** **عقد**এগুলো সমার্থক শব্দ। যেমন, যে সকল অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাদেরকে মু‘আহাদ বা আহলু হুদনাহ বলা হয়। অর্থাৎ অমুসলিমগণের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধ ব্যতীত অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থায় আনুগত্য স্বীকার করতে সম্মত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী স্থির করে সন্ধিবদ্ধ হয় তারাই মু‘আহাদ। আল্লামা ইব্নুল কায়্যিম জাওযিয়া এর মতে, যারা তাদের বাড়ীঘর, স্থাবর, অস্থাবর সম্পদ ও

[১০২] ড.আবদুল করীম আল যায়দান, *আহকামুল যিম্মীইয়্যিন ওয়াল মুস্তা’মিন*, পৃ. ২০

[১০৩] Abdullah, Najih Ibrahim Bin, ibid

[১০৪] আবু নায়ীম আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, বাবুল ‘আইন, হা.নং ৩৬০০

অন্যান্য বিষয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং যিম্মীদের ন্যায় তাদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হয় না কিন্তু মুসলমানগণ তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে রেহাই পায়। তাদেরকে আহলু 'আহদ, আহলুস সূলহ এবং আহলুল হুদনাহ বলা হয়। [১০৫]

المعجم الوسيط প্রণেতা বলেন,

وَيُقَال عَاهَدَ الذِّمِّيّ أعطَاهُ عهدا فَهُوَ معاهد ومعاهد

অর্থাৎ যেসব যিম্মী ব্যক্তিদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া হয় তাদেরকে **معاهد** বলে। [১০৬]

معجم مقايس اللغة গ্রন্থকারের মতে, মু'আহাদ হল সেসব ব্যক্তি যারা জিযিয়া আদায় করার ওপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ ব্যাপারে কিয়াস হল যে তাদের জিযিয়া প্রদানের কারণে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে।

অতঃপর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে। তবে তারা আর মু'আহাদ থাকবে না। তার ভাষায়,[১০৭]

إِنَّهُمْ يُعَاهَدُونَ عَلَى مَا عَلَيْهِمْ مِنْ جِزْيَةٍ. وَالْقِيَاسُ وَاحِدٌ، كَأَنَّهُ أَمْرٌ يُحْتَفَظُ بِهِ لَهُمْ، فَإِذَا أَسْلَمُوا ذَهَبَ عَنْهُمُ اسْمُ الْمُعَاهَدَةِ

শায়খ নাজিহ ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ আহলুল হুদনাহের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন,

"People of the *Hudna* (truce) are those who sign a peace treaty with Muslims after being defeated in war. They agree to reside in their own land, yet to be subject to the legal jurisprudence of Islam like *Zimmis*, provided they do not wage war against Muslims." [১০৮]

ড.আবদুল করীম আল যায়দান এর মতে,

"The residents of non-Muslims countries who are at peace with Muslims through specific peace agreements, international treaties, or other mechanisms, who temporarily come to Muslim countries for work, education, business, diplomatic missions, and so forth. Muslim jurists refer to them in Arabic as mu'aahadoon, which means, "those with whom there is a pact". [১০৯]

---

[১০৫] ইব্নিল কায়্যিম, প্রাগুক্ত,

أَهْلِ الْهُدْنَةِ، فَإِنَّهُمْ صَالَحُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يَكُونُوا فِي دَارِهِمْ، سَوَاءٌ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى مَالٍ، أَوْ غَيْرِ مَالٍ، لَا تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ كَمَا تَجْرِي عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَكِنْ عَلَيْهِمُ الْكَفُّ عَنْ مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَؤُلَاءِ يُسَمَّوْنَ أَهْلَ الْعَهْدِ، وَأَهْلَ الصُّلْحِ، وَأَهْلَ الْهُدْنَةِ.

[১০৬] ইব্রাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য, *আল মুআজামুল ওয়াসীত*, (কায়রো : দারুদ দাওয়াহ, তা.বি.), খ. ২ পৃ. ৬৩৩

[১০৭] আবুল হুসাইন আহমদ ইব্ন ফারিস আর রাযী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৬১

[১০৮] Abdullah, Najih Ibrahim Bin, ibid

[১০৯] ড.আবদুল করীম আল যায়দান, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকগণের সাথে সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত নির্ধারিত হবে সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন বা পরিমার্জন কোনভাবেই বৈধ হবে না। তাদের ওপর কর-খাজনাও বাড়ানো যাবে না। তাদের জায়গা জমি দখল করা যাবে না। তাদের বাড়ী-ঘর কেড়ে নেয়া যাবে না। তারা কঠোর ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতার বাইরে থাকবে। তাদের মান-ইজ্জত, সম্মান-সম্ভ্রমের কোন ক্ষতি হবে না। তাদের সামর্থের মাত্রাতিরিক্ত কোন বোঝা তাদের ওপর চাপানো যাবে না। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ চুক্তি প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন,

"যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ থাকবে, তোমরাও তাদের জন্য স্থির থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।" [১১০]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সম্ভবত তোমরা কোন জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। বিজয়ীও হবে এবং সে জাতি নিজেদের ও নিজের সন্তান সন্ততির প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদের মুক্তিপণ দিতে চাইবে তাহলে তোমরা নির্ধারিত মুক্তিপণ কিংবা চুক্তির বাইরে সামান্য পরিমাণ বেশি নেবে না। কেননা সেটা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না।" [১১১]

এছাড়া তিনি আরো বলেছেন,

"যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অবিচার করল কিংবা তার অধিকার ক্ষুণ্ন করল বা তাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দিল অথবা তার সন্তুষ্টি ছাড়াই কোন কিছু তার কাছ থেকে কেড়ে নিল, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।" [১১২]

'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিককে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না । অথচ তা চল্লিশ বছরের দুরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।"[১১৩]

গ. মুস্তা'মিন

মুস্তা'মিন শব্দটি أمن শব্দ থেকে এসেছে এর অর্থ হল নিরাপত্তা আশ্রিত। যে অমুসলিম ব্যক্তি সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা কোন মুসলিমের নিরাপত্তায় ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে তাকে নিরাপত্তা আশ্রিত বা মুস্তা'মিন বল হয়। অভিধানবেত্তাদের মতে,[১১৪]

---

[১১০] আল কুর'আন, সূরা তাওবাহ : ৭

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

[১১১] ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আমর আল আযদী, *সুনান*, (বৈরুত : আল মাকতাবাতু আসরিয়্যাহ,তা.বি.), কিতাবুল জিহাদ, খ. ৩য়, পৃ. ১৫৬

[১১২] প্রাগুক্ত

[১১৩] ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিযাইয়া, হা নং ২৯৩৫

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

Dhaka University Institutional Repository

شخص يطلب التأمين ويلتزم بدفع الأقساط "دفع المستأمن أقساط التأمين في موعدها

ইব্নুল কায়্যিম বলেন,

وَأَمَّا الْمُسْتَأْمِنُ فَهُوَ الَّذِي يَقْدَمُ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ اسْتِيطَانٍ لَهَا، وَهَؤُلَاءِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: رُسُلٌ، وَتُجَّارٌ، وَمُسْتَجِيرُونَ حَتَّى يُعْرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ وَالْقُرْآنُ، فَإِنْ شَاءُوا دَخَلُوا فِيهِ، وَإِنْ شَاءُوا رَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ، وَطَالِبُوا حَاجَةٍ مِنْ زِيَارَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا، وَحُكْمُ هَؤُلَاءِ أَلَّا يُهَاجِرُوا، وَلَا يُقْتَلُوا، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ، وَأَنْ يُعْرَضَ عَلَى الْمُسْتَجِيرِ مِنْهُمُ الْإِسْلَامُ وَالْقُرْآنُ، فَإِنْ دَخَلَ فِيهِ فَذَاكَ، وَإِنْ أَحَبَّ اللَّحَاقَ بِمَأْمَنِهِ أُلْحِقَ بِهِ، وَلَمْ يُعْرَضْ لَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ، فَإِذَا وَصَلَ مَأْمَنَهُ عَادَ حَرْبِيًّا كَمَا كَانَ.

অর্থাৎ মুস্তা'মিন হল সেসব অমুসলিম নাগরিক যারা কোন প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে কিছু দিনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে এসে বসবাস করে। এরা চার প্রকার হতে পারে, এক) দূত, দুই) ব্যবসায়ী, তিন) আশ্রয়প্রার্থী তারা ইচ্ছে কারলে তাতে প্রবেশ করতে পারে, ইচ্ছে করলে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং চার) পর্যটক বা অন্য কোন প্রয়োজনে প্রবেশকারী। তাদের জন্য বিধান হল তাদেরকে বিতাড়িত করা হবে না। হত্যা করা হবে না এবং তাদের নিকট থেকে জিযিয়াও গ্রহণ করা হবে না।[১১৫]

শায়খ নাজিহ ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ মুস্তা'মিনের পরিচয় দিয়ে বলেন,

"*Musta'min* (protected one) are persons who come to an Islamic country as messengers, merchants, visitors, or student wanting to learn about Islam. A *Musta'min* should not wage war against Muslims and he is not obliged to pay *Jizya*, but he would be urged to embrace Islam. If a *Musta'min* does not accept Islam, he is allowed to return safely to his own country. Muslims are forbidden to hurt him in any way. When he is back in his own homeland, he is treated as one who belongs to the Household of War." [১১৬]

আহকামুল যিম্মীইয়্যিন ওয়াল মুস্তা'মিন নামক গ্রন্থে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

"The residents of non-Muslims countries with whom Muslims do not have a pact of peace, or who may be at war with Muslims, who temporarily come to Muslim countries for work, education, business,

---

[১১৪] ড. আহমদ মুখতার, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১২৫

[১১৫] ইব্নিল কায়্যিম, প্রাগুক্ত

[১১৬] Abdullah, Najih Ibrahim Bin, ibid

diplomatic missions, and so forth. Muslim jurists refer to them in Arabic as musta'minoon, which means, "seekers of protection".[১১৭]

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তার প্রতিনিধি রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং প্রয়োজন বিবেচনা করে যে কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করার এবং অস্থায়ীভাবে অবস্থান করার অনুমতি দেয়ার ইখতিয়ার রাখেন। এমন কি ইসলামী রাষ্ট্রের যেকোন মুসলিম নাগরিকও ভিনদেশী যে কোন অমুসলিম নাগরিককে সাময়িক নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান করতে পারবে। আর রাষ্ট্রপ্রধান তা রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী না হলে তার সে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদানকে অনুমোদন দেবেন। [১১৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন: "আবু মুররা (রা.) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন উম্মু হানী (রা.) ইব্‌ন হুবায়রাকে আশ্রয় প্রদান করা সত্ত্বেও আলী (রা.) তাকে হত্যা করতে চাইলে উম্মু হানী তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবগত করান। এ ঘটনা শুনে তিনি বলেন,

قد اجرنا من اجرت يا ام هاني

হে উম্মু হানী, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি। " [১১৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ,

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا

"উচু-নীচু নির্বিশেষে সকল মুসলিমের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দানের জন্য একই রূপ হুকম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যে কোন মুসলিম কোন অমুসলিমকে নিরাপত্তা দান করলে তা মেনে চলা সকল মুসলিমের কর্তব্য। অতএব যে কেউ কোন মুসলিমের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তার ওপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হবে।" [১২০]

ইসলামী রাষ্ট্র যিম্মীদের মতো মুস্তা'মানের নিরাপত্তা রক্ষারও সার্বিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ইসলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের জন্য কোন মুস্তা'মানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, তাকে হত্যা করা কিংবা তার জান-মাল-'ইযযাত-আব্রুর প্রতি কোন রূপ হামলা করা জায়িয নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

---

[১১৭] ড. আবদুল করীম আল যায়দান, প্রাগুক্ত

[১১৮] ড. আহমদ আলী, *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ফেব্রুয়ারী ২০১০), পৃ. ১৫

[১১৯] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিযাইয়া, হা নং ২৯৩৫

[১২০] প্রাগুক্ত, বাবুল হারামুল মাদীনাহ, হা.নং ১৮৭০

“আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে।” [১২১]

ঘ. হারবী

হারবী শব্দটি আরবী حرب শব্দ থেকে উদ্ভুত যার অর্থ যুদ্ধ। অর্থাৎ যাদের সাথে যুদ্ধের সম্পর্ক বিদ্যমান। সাধারণত: দারুল হারবের অমুসলিম নাগরিকগণকে হারবী বলা হয় । উপর্যুক্ত তিন শ্রেণীর বাইরে যে সমস্ত অমুসলিম রয়েছে তাদেরকে হারবী অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রু রূপে গণ্য করা হয়। তাদের জান-মাল-‘ইযযাত আব্রু রক্ষা করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায় না। কোন হারবীর ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হলে রাষ্ট্র প্রধান বা তাঁর প্রতিনিধির অনুমতি নিয়েই প্রবেশ করতে হবে। অনুমতি ব্যতিত কোন হারবী ইসলামী রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করলে তাকে দারুল হারবের গুপ্তচর বা লুটেরা বলে ধরে নেয়া হবে। রাষ্ট্র প্রধান দেশ ও জনগণের স্বার্থে তার বিরুদ্ধে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। ইচ্ছে করলে তিনি তাকে হত্যাও করতে পারবেন, কারারুদ্ধ করেও রাখতে পারবেন অথবা বিনিময় নিয়ে কিংবা বিনা বিনিময়ে ছেড়েও দিতে পারবেন। রাষ্ট্রের কোন নাগরিক মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম- তাকে হত্যা করলে, হত্যাকারীর জন্য কিসাস বা দিয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে তার এ কাজ রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বের জন্য অবমাননাকর হিসেবে গণ্য হবে। এ জন্য রাষ্ট্রপ্রধান দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে তাকে অবস্থা অনুযায়ী যে কোন রূপ সাধারণ শাস্তি দিতে পারবেন।[১২২]

---

[১২১] আল কুর'আন, সূরা তাওবাহ : ৬

[১২২] ড. আহমদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় পবিত্র কুর'আনের নির্দেশনা

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় পবিত্র কুর'আনের নির্দেশনা

পবিত্র কুর'আন মানব জাতির জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। পৃথিবীর সমস্ত পৌত্তলিকতা, অরাজকতা, কুসংস্কার, সংঘাত-সহিংসতা দূরীকরণে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এতে দিক নির্দেশনামূলক বহু নীতিমালার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এখানে একদিকে মানুষের বিচিত্রতা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে এই বিচিত্রতার অনৈক্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। মানব জাতির মধ্যে ধর্ম, বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভূ-খণ্ড ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য-বিভিন্নতার কারণে সৃষ্ট অনৈক্য, বিদ্বেষ, বৈরী মনোভাব ও প্রতিহিংসার যে ব্যাধি সংক্রমিত হয়েছে পবিত্র কুর'আন হল এর মহৌষধ। আল্লাহ তা'আলা এখানে এ ব্যাধির কারণগুলোকে চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছেন। আর রোগ যখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে যায় তখনকার প্রতিষেধক হিসেবে প্রণয়ন করেছেন বহু নীতিমালা। তিনি মানুষের মধ্যে সৌহার্দ সম্প্রীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সকল মানুষকে এক পরিবারভূক্ত ঘোষণা করেছেন। তাদেরকে আবদ্ধ করেছেন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে। মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়ে শান্তির পথকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আর অমুসলিম জাতির সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে নিশ্চিত করতে মুসলমানদেরকে দিয়েছেন বিশেষ দিক নিদের্শনা। এতে সমাবেশ ঘটেছে পরধর্মমত সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, আমানতদারীতা, বিনয় ইত্যাদি নানা গুণাবলীর। নিষেধ করা হয়েছে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা যে অনুপম বিধানাবলী প্রণয়ন করেছেন তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

২.১ সমস্ত মানুষ এক পরিবারভুক্ত বা জাতিভূক্ত

ইসলাম জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল ও অবস্থান নির্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরীর লক্ষ্যে তাদেরকে একই পরিবারভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেন, "হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া এবং তাদের দু'জনার থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী।"[১২৩]

অর্থাৎ মানব জাতি একে অন্যের অতি আপনজন। কারণ এক মানুষ থেকেই সমস্ত মানুষের উৎপত্তি এবং রক্ত-মাংস ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অংশ। অতএব দল-মত নির্বিশেষে তাদের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইব্‌ন কাছীর (রহ.) বলেন,

---

[১২৩] আল কুর'আন, **সূরা নিসা ৪ :০১**

يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها زَوجَها وَبَثَّ مِنهُما رِجالًا كَثيرًا وَنِساءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَساءَلونَ بِهِ وَالأَرحامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيكُم رَقيبًا

" দু'জন হতে অর্থাৎ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) হতে বহু নর ও নারী সৃষ্টি করে দুনিয়ার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের প্রকার, গুণে, রংয়ে, আকারে এবং কথাবার্তায় বিভিন্নতা রয়েছে। তিনি যেমন তাদেরকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন, ঠিক তেমনই এক সময়ে তিনি সকলকে একত্রিত করে পুনরায় নিজের দখলে নিয়ে নিবেন এবং একটি মাঠে জমা করবেন।"[১২৪]

অর্থাৎ মানবজাতি উৎপত্তির শুরু থেকেই সবাই একই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ একই মূল থেকে তাদের উৎপত্তি এবং একই বংশের সাথে তারা সম্পৃক্ত। এ মৌলিক সত্যটি আল্লাহ এজন্যই পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করেছেন যেন মানুষ তাদের মধ্যস্থিত যাবতীয় মতপার্থক্য ও বৈষম্য সত্ত্বেও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষকে একই জাতিভূক্ত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, "তোমাদের এ উম্মাত আসলে একই উম্মাত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব আমার ইবাদত কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, প্রত্যেকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"[১২৫]

এ আয়াতে কারীমায় 'তোমরা' বলে সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মানবজাতি: তোমরা আসলে একই দল ও একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন তাঁরা সবাই একই দীন ও একই জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। পরবর্তীতে যত ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে তা এ ধর্মেরই পরিবর্তিত ও বিকৃত রূপ। মানুষ নিজেরা এই বিভেদ সৃষ্টি করেছে। মূলত: সকল মানুষ আদম সন্তান হিসেবে এক জাতিভুক্ত এবং তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীর ফি যিলালিল কুর'আন' এ উল্লেখিত হয়েছে যে,

" সকল নবীর উম্মাতরা আসলে তোমাদেরই উম্মাত। সকলের একই ধর্ম, একই আকীদা-বিশ্বাস, একই জীবন ব্যবস্থা এবং তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা অন্য কারো নয়।"[১২৬]

হাফিয ইমামুদ্দীন ইব্ন কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমরা নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, আমাদের সবারই একই দীন।" (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০)

---

১২৪ আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাসীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল আজীম*, (দারুত ত্বয়্যিবাতু লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৯৯ খ্রী.), খ. ১ম, পৃ. ৩৫৪

أَيْ وَذَرَأَ مِنْهُمَا: أَيْ مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءَ رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً، وَنَشَرَهُمْ فِي أَقْطَارِ الْعَالَمِ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ وَلُغَاتِهِمْ، ثُمَّ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَعَادُ وَالْمَحْشَرَ

১২৫ আল কুর'আন, সূরা আম্বিয়া : ৯২-৯৩

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

১২৬ সাইয়্যেদ কুতুব ইব্রাহীম, *ফি যিলালিল কুর'আন*, (বৈরুত: দারুশ শুরুক্ব, ১৪১২ হি), খ. ৪র্থ, পৃ. ২৩৯৫

إن هذه أمتكم. أمة الأنبياء. أمة واحدة. تدين بعقيدة واحدة. وتنهج نهجا واحدا. هو الاتجاه إلى الله دون سواه.

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন কাসীর وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "অতঃপর লোকেরা মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ তাদের নবীগণের (আ.) উপর ঈমান এনেছে এবং কেউ কেউ ঈমান আনেনি।"[১২৭]

এছাড়া মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুর'আনে এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, " হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকাজ কর! তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত। অতএব তোমাদের এই যে জাতি এটাতো একই জানি এবং আমিই তোমাদের রব; এতএব, আমাকে ভয় কর।"[১২৮]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

" শুরুতে সব মানুষ একই উম্মাত ছিল। পরবর্তী সময়ে তারা বিভিন্ন আকীদা ও পথ বানিয়ে নেয়। হে নবী! যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো, তাহলে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে সে বিষয়ে অবশ্যই ফায়সালা করে দেয়া হত।"[১২৯]

২.২ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষকে এক পরিবার ভুক্ত করে বিশ্বব্যাপী তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে একই পরিবারের সদস্যরা যেমন পরস্পর পরস্পরের প্রতি আন্তরিক ও সহানুভুতিশীল হয় তদ্রূপ পৃথিবীর সকল মানুষ একই পিতা আদম (আ.)ও মা হাওয়া (আ.) এর সন্তান হওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক অনুভব করবে। অথচ প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত মানুষ এই বিশ্বমানবতাকে উপেক্ষা করে নিজেদেরকে বংশ, গোত্র ও গোষ্ঠীর বৃত্তে আবদ্ধ করেছে। বৃত্তের ভিতরের ব্যক্তিদেরকে আপন জন এবং বাইরের লোকদের দূরের মানুষ বলে গণ্য করেছে। তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মানুষের এই বিভাজন তাদের মর্যাদার দিক থেকে নয়, বরং তাদের পরিচিতির জন্য। আর পৃথিবীর সকল মানুষ একই পিতা মাতার সন্তান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে এবং তোমাদের মাঝে বানিয়েছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু

---

[১২৭] প্রাগুক্ত

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ دِينُنَا وَاحِدٌ»

[১২৮] আল কুর'আন, সূরা মু'মিনুন : ৫১-৫২

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

[১২৯] আল কুর'আন, সূরা ইউনুস : ১৯

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Dhaka University Institutional Repository

জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।”[১৩০] এ আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন,“**يَا أَيهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم** আয়াতটি সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস যখন কোন ব্যক্তিকে বলেছিল তুমি অমুকের ছেলে। আরো বলা হয়, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুয়াজ্জিন বেলাল (রা.) যখন আযান দিচ্ছিলেন তখন কুরাইশ নেতা সুহাইল বিন আমর হারিস বিন হিশাম ও আবু সুফিয়ান তাকে কালো কাক বলে। তখন আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন, **يَا أَيهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم** [১৩১]

অর্থাৎ আদি পিতা আদম (আ.) ও মা হাওয়া থেকেই সকল মানুষের সৃষ্টি। এদিক থেকে পৃথিবীর সব মানুষ ভাই ভাই। এজন্যে তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। তারা সবাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই তাদের সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকা উচিত।

এছাড়া পবিত্র কুর’আনে আল্লাহ আরো বলেছেন, ‘‘ তিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁর থেকে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন।’’[১৩২]

অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে,

“তিনিই ঐ সত্তা, যিনি এক মানুষ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে থাকার ব্যবস্থা ও সঁপে দেয়ার বিধান। যারা বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারী তাদের জন্য আমি নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট করে বলে দিলাম।”[১৩৩]

২.৩ভারসাম্য রক্ষার জন্য শ্রেণী বৈষম্য

আল্লাহ তা‘আলা মানুষের আকার, আকৃতি, বর্ণ, ভাষা, অর্থ-সম্পদ, মেধা, শক্তি, কৌলীন্য, বংশীয় আভিজাত্য, স্বাধীনতা, পরাধীনতা প্রভৃতির মধ্যে তারতম্য রেখেছেন, এই তারতম্যের কারণ তাদের মর্যাদার পার্থক্য নয়। বরং মানুষের এই শ্রেণীবৈষম্যের দ্বারা তিনি তাদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বর্ণনা করেন,

---

[১৩০] আল কুর’আন, সূরা হুজুরাত : ১৩

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

[১৩১] ‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ‘আব্বাস(রা.), *তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,তা.বি.) ১ম খ, পৃ. ৪৩৭

{يَا أَيهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم} نزلت هَذِه الْآيَة فِي ثَابت بن قيس بن شماس حَيْثُ قَالَ لرجل أَنْت ابْن فُلَانَة وَيُقَال نزلت فِي بِلَال مُؤذن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنَفر من قُرَيْش سُهَيْل بن عَمْرو والْحَارث بن هِشَام وَأبي سُفْيَان بن حَرْب قَالُوا لِبلَال عَام فتح مَكَّة حَيْثُ سمعُوا أَذَان بِلَال مَا وجد الله وَرَسُوله رَسُولا غير هَذَا الْغُرَاب فَقَالَ الله يأيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

[১৩২] আল কুর’আন, সূরা যুমার : ৬

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

[১৩৩] আল কুর’আন, সূরা আন‘আম : ৯৮

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

" দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে আমিই তো জীবন-যাপনের উপকরণ বিলি-বন্টন করেছি এবং তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে অপর কিছু ব্যক্তির উপর বেশি মর্যাদা দিয়েছি। যেন তারা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে।"[১৩৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্‌ন কাসীর (রহ.) বলেন,

"অর্থাৎ আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আমি যাকে যা ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা দিয়ে থাকি এবং যখন যা ইচ্ছা ছিনিয়ে নেই। জ্ঞান, বিবেক, ক্ষমতা ইত্যাদিও আমারই দেয়া এবং এতেও আমি পার্থক্য রেখেছি। এগুলো সবাইকে আমি সমান দেইনি। এর হিকমাত এই যে, এর ফলে তারা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। এর ওর প্রয়োজন হয় এবং ওর এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং একে অপরের অধীনস্থ থাকে।"[১৩৫]

২.৪ স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার

ইসলাম সর্বোচ্চ মানের ধর্মীয় উদারতার শিক্ষা দেয়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে তার ধর্ম পালনের সুযোগ করে দেয়। তাদেরকে কোন বিশেষ ধর্ম বা মতবাদ মানতে কখনো বাধ্য করে না এবং এ কারণে চরমপন্থীদের মতো তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ড বা অন্য কোন কঠিন শক্তি প্রয়োগ ও নির্যাতন না চালিয়ে স্ব ধর্ম পালনের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রদান করে। অমুসলিমরা যেসব কাজ তাদের ধর্মে হালাল বলে মনে করে ইসলাম তাদেরকে সেসব কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে না এবং তারা যেগুলোকে হারাম মনে করে তা পালন করতে তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করে না। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সে সমস্ত কাজ অবৈধ হলেও ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের ধর্ম পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা তারা পায়। ইসলাম মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় ব্যাপার হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেয় না। কারণ তাদের ধর্ম কুফর এবং ইসলাম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ধর্মীয় মতবাদ। এ দু'টো কখনো একত্রিত হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, "তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য।"[১৩৬]

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াতের দুটি অর্থ করা হয়েছে " এক, তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন যা তোমরা অনুসরণ কর তা কুফর আর আমার জন্য আমার দ্বীন যা আমি অনুসরণ করি তা

---

[১৩৪] আল কুর'আন, সূরা যুখরুফ : ৩২

قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

[১৩৫] ইব্‌ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, ৭ম খ, পৃ. ২২৬

أَنَّهُ قَدْ فَاوَتَ بَيْنَ خَلْقِهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَرْزَاقِ وَالْعُقُولِ وَالْفُهُومِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقُوَى الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، فَقَالَ: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ}

وَقَوْلُهُ: {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} قِيلَ: مَعْنَاهُ لِيُسَخِّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْأَعْمَالِ، لِاحْتِيَاجِ هَذَا إِلَى هَذَا، وَهَذَا إِلَى هَذَا

[১৩৬] আল কুর'আন, সূরা কাফিরুন : ০৬

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

ইসলাম। দুই, তোমাদের কর্মের প্রতিফল তোমাদের জন্য, আর আমার কর্মের প্রতিফল আমার জন্য।"[১৩৭]

২.৫ সকল ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ

ইসলাম সমগ্র মানব জাতির বৃহত্তর ঐক্যে বিশ্বাসী। সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের কাছে প্রেরিত কিতাবের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। এজন্য মুসলমানদের অন্তরাত্মা বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ ও গোঁড়ামী থেকে মুক্ত থাকে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুর'আনে মুমিনদের সফলতা লাভের শর্ত হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ কুর'আন এবং বিভিন্ন যুগে ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছে সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা সকল নবী ও রাসুলগণের কাছে প্রেরিত ওহীর উৎস এক স্থানে। আর তা হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তিনিই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কাছে বিভিন্ন সময়ে হেদায়াতের বাণী প্রেরণ করেছেন। এই অনুভূতি থেকেই তিনি মানুষকে বংশ, গোত্র বা জাতি প্রীতিতে লিপ্ত না হয়ে বরং প্রকৃত সত্যের অনুসারী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সত্য যে স্থানে যে আকৃতিতেই আবির্ভূত হোক তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে,

" আর যে কিতাব তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সে সবগুলোর ওপর ঈমান আনে। আর আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে। এ ধরনের লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কল্যাণ লাভের অধিকারী।"[১৩৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন," **وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ** এর অর্থ আল্লাহর তরফ হতে যা তোমার নিকট এসেছে এবং যা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণের কাছে এসেছে তার উপর ঈমান রাখে এবং রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না ও তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ হতে যা এসেছে তা নিয়ে ঝগড়া করে না।"[১৩৯]

এছাড়া পবিত্র কুর'আনের আরো অনেক আয়াতে সকল আসমানী গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে হিংসা,

---

[১৩৭] আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী, *তাফসীরে কুরতুবী*, (কায়রো: দারুল কুতুবীল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রী.), খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩৫৮

{لكم دِينكم ولي دينِ} فيه وجهان: أحدهما: لكم دينكم الذي تعتقدونه من الكفر , ولي ديني الذي أعتقده من الإسلام , قاله يحيى بن سلام. الثاني: لكم جزاء عملكم , ولي جزاء عملي.

[১৩৮] আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা : ৪-৫

[১৩৯] ইব্‌ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৭০

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ} أَيْ: يُصَدِّقُونَ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنَ اللَّهِ، وَمَا جَاءَ بِهِ مَنْ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمْ، وَلَا يجحدون ما جاؤوهم بِهِ مِنْ رَبِّهِمْ

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্বেষ, ঝগড়া, ফাসাদ পরিত্যাগ করে মানবজাতির ঐক্য গঠনের যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা লক্ষ্যনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ, তাঁর রাসূল, রাসূলের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ, এমনকি পূর্ববর্তী রাসুলগণের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর ওপর ঈমান আন।"[১৪০] তিনি অন্যত্র বলেন,

"আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো। তবে তাদের জালিমদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের এ কথা বল যে, আমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সব কিছুর ওপর আমরা ঈমান এনেছি এবং আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু তো একজনই।"[১৪১]

"বলে দিন; হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।"[১৪২]

"রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"[১৪৩]

"আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর এবং তাদের কারও প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।"[১৪৪]

"বলুন আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর, আর কিছু পেয়েছেন মূসা ও

---

[১৪০] আল কুর'আন, সূরা নিসা : ১৬২

[১৪১] আল কুর'আন, সূরা আনকাবুত : ৪৬

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ

[১৪২] আল কুর'আন, সূরা মায়েদা : ৬৮

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

[১৪৩] আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা : ২৮৫

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

[১৪৪] আল কুর'আন, সূরা নিসা : ১৫২

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

ঈসা এবং অন্যান্য নবী রাসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত।”[১৪৫]

২.৬ সদাচরণ ও ন্যায় বিচার পাবার অধিকার

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এটি জাতি, ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। কোন হিংসা বিদ্বেষ নয়, বরং প্রতিপক্ষ মানুষের প্রতি ভালো আচরণ করার শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুর'আন শান্তিকামী অমুসলিমদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায় বিচারের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।”[১৪৬] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মাওয়ার্দী বলেন," لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ এর চারটি দিক রয়েছে,এক: এর অর্থ তাদের সাথে ন্যায় বিচার কর,তাদের নৈকট্যের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করো না, এটি ইব্ন হাব্বান এর মত। দুই: মুকাতিল বলেন, তোমাদের সম্পদ হতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের অংশ প্রদান কর, আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা রক্ষা করার আদেশ দেন। তিন : কিছু সংখ্যক মুফাস্সিরীন এর মতে, এর দ্বারা নারী ও শিশু উদ্দেশ্য। কেননা, তারা কখনও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না। অতএব আল্লাহ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করেন। চার : 'আমের ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, আবু বকর (রা.) জাহেলী যুগে তাঁর স্ত্রী কুতাইলাকে তালাক প্রদান করেছিলেন যিনি আসমা বিন্ত আবু বকর এর মাতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফের কুরাইশদের মধ্যে সম্পাদিত হুদাইবিয়া সন্ধির সময়ে তিনি তার মেয়ের কাছে এসে তাঁকে কানের দুল ও আরো কিছু জিনিস উপহার দিলেন। আসমা (রা.) এগুলো গ্রহণ করতে অপছন্দ করে বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন।” [১৪৭]

---

[১৪৫] আল কুর'আন, সূরা আলে ইমরান : ৮৪

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

[১৪৬] আল কুর'আন, সূরা মুমতাহিনা : ০৮

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

[১৪৭] আল্লামা মাওয়ার্দী, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৯-৬২০

أحدهما: يعني وتعدلوا فيهم , قاله ابن حبان فلا تغلوا في مقاربتهم , ولا تسرفوا في مباعدتهم. الثاني: معناه أن تعطوهم قسطاً من أموالكم كان لهم عهد فأمر الله أن يبروهم بالوفاء , قاله مقاتل. الثالث: أنهم النساء والصبيان لأنهم ممن لم يقاتل , فأذن الله تعالى ببرهم , حكاه بعض المفسرين. الرابع: ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه طلق امرأته قتيلة في الجاهلية

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দের্শ দিয়ে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে।"[১৪৮]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত বিভেদ, দলাদলি হতে মুক্ত থেকে নিরপেক্ষ ন্যায় নিষ্ঠা অবলম্বনের জন্য আদিষ্ট। কোন জাতির স্বার্থে এবং কোন জাতির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করা তার কাজ নয়। সব মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক সমান। সেটি হচ্ছে ন্যায়বিচার করা।

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদীনায় ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ইহুদীদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ফয়সালা করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সাথে সাথে বিবাদ মীমাংসার সময়ে ন্যায়বিচার করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেন, "এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায় ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।" [১৪৯]

অর্থাৎ মুসলমান শাসক আল্লাহ তা'আলাকে ভালবেসে তাঁর নির্দেশ পালনার্থে সমাজে প্রকৃত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। কোন প্রকার মোহ, লোভ, প্রবৃত্তির তাড়না তাদেরকে ন্যায় বিচার থেকে বিরত রাখতে পারবে না। তারা পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে ইনসাফ করবে।

২.৭ ইসলাম গ্রহণে জোর জবরদস্তি নিষেধ

ইসলাম হল উদারতার ধর্ম, এতে জোর জবরদস্তির স্থান নেই। আল্লাহ তা'আলা ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তিনি পবিত্র কুর'আনে ইসলামের মর্মবাণী মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন যেন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তা গ্রহণ করার সুযোগ

وهي أم أسماء بنت أبي بكر , فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش , فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر قرطاً وأشياء , فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له , فأنزل الله هذه الآية.

[১৪৮] আল কুর'আন, সূরা শূরা : ১৫

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

[১৪৯] আল কুর'আন, সূরা মায়েদা : ৪২

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dhaka University Institutional Repository

পায়। সাথে সাথে যারা ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করবে তাদেরকে তিনি মানুষের ওপর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বল প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ ঈমান আনা সম্পূর্ণভাবে মনের ব্যাপার। আর অন্তরের উপর জোর প্রয়োগ করা অন্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর দায়িত্ব শুধু মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করা। আল্লাহর বাণী প্রচার করা। এ ব্যাপারে তাদের ওপর কোন প্রকার জোর জবরদস্তি করা, বল প্রয়োগ করা তাঁর দায়িত্ব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে এ দায়িত্ব সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর বর্তায়, যে তারা চরমপন্থাকে পরিত্যাগ করে উদারতার সাথে মানুষের মাঝে ইসলামের মর্মবানী প্রচার করবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে, "আর তোমার পরওয়ারদেগার যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান নিয়ে আসতো সমবেতভাবে। তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করবে ঈমান আনার জন্য?"[১৫০]

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নি:সন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত' দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।"[১৫১]

" আমি আপনাকে সুসংবাদ ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি।"[১৫২]

" তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কুর'আনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।" [১৫৩]

" নূহ (আ.) বললেন, হে আমার জাতি! দেখ তো আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরেও তা তোমাদের চোখে না পড়ে তাহলে আমি কি উহা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি?"[১৫৪]

---

[১৫০] আল কুর'আন, সূরা ইউনুস : ৯৯

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

[১৫১] আল কুর'আন, সূরা বাকারাহ : ২৫৬

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[১৫২] আল কুর'আন, সূরা ফুরকান : ৫৬

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

[১৫৩] আল কুর'আন, সূরা ক্বাফ : ৪৫

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

[১৫৪] আল কুর'আন, সূরা হূদ :২৮

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ

"তুমি তো তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নও।"[১৫৫]

২.৮ ধর্মীয় ব্যাপারে সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের তাগিদ

পৃথিবীর সকল মানুষ আদিতে একই উম্মতভূক্ত ছিল। পরবর্তীতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাদের আবাস গড়েছে। আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী এই মানুষদের সাথে ধর্মীয় ব্যাপারে সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের তাগিদ করেছেন। তাদের সাথে অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে সদ্ব্যবহার, উত্তম আচরণ ও ভালভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা অমুসলিমরা যেসব বিশ্বাস পোষণ করছে তাতে তাদের পরিপূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তারা অন্ধভাবে এসব ধ্যান ধারণা পোষণ করছে ও কার্যকলাপ সম্পাদন করেছে। তাই মুসলমানদের উচিত তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না হেনে তাদের সাথে সমাজে সহাবস্থান বজায় রাখা। কেননা, মুসলমানরা যদি তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে তাহলে তারাও মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবে। এভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সূচনা হবে যা মানবজাতির শান্তির পথে এক বিরাট বাঁধা। এজন্যেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন পবিত্র কুর'আনে নির্দেশ দিচ্ছেন,

"তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজ কর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করত।" [১৫৬]

"তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।" [১৫৭]

" আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্যে ইবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে

---

[১৫৫] আল কুর'আন, সূরা গাশিয়াহ : ২২

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

[১৫৬] আল কুর'আন, সূরা আন'আম : ১০৮

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

[১৫৭] আল কুর'আন, সূরা আনকাবুত : ৪৬

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Dhaka University Institutional Repository

পালনকর্তার দিকে আহবান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই আছেন। তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত। তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছো, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।" [১৫৮]

২.৯ মুসলমান শুধু সতর্ককারী

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর অবর্তমানে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর এ দায়িত্ব তাঁর উম্মতের উপর বর্তায়। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনের মাধ্যমে তাঁর হাবীবকে ইসলাম প্রচারের বন্ধুর পথ সম্পর্কে জ্ঞাত করেছেন এবং ইসলাম বিরোধী জাতির সাথে তাঁর করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কুফরীর অন্ধকারে যাদের মন কলুষিত হয়ে আছে তারা তাঁর কথা খুব সহজেই মেনে নিবে না। বরং তারা বিভিন্ন অজুহাত তুলবে নানা প্রশ্নবানে তাঁকে জর্জরিত করবে এবং তাঁর পদে পদে বাঁধার প্রাচীর দাঁড় করাবে। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাজ হল পথ হারা এসব মানুষের সাথে বিবাদ বিসম্বাদে না জড়ানো। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ না করা। তাদের কাছে তাওহীদ রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদেরকে ইহকাল ও আখিরাতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ পাক বলেন,

" আপনি বলুন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের জন্যে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। যারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। আর যারা আমার আয়াতসমূহ ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।"[১৫৯]

" যারা অস্বীকার করে তারা বলে, তার মালিকের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন নাযিল হয় না? আপনি তো হচ্ছেন একজন সতর্ককারী। আর প্রত্যেক জাতির জন্যেই একজন পথ প্রদর্শক আছে।"[১৬০]

---

[১৫৮] আল কুর'আন, সূরা হাজ্জ্ব : ৬৭-৬৯

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

[১৫৯] আল কুর'আন, সূরা সূরা হজ্জ : ৪৯-৫১

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

[১৬০] আল কুর'আন, সূরা রাদ :০৭

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

" হে নবী, কাফেররা মনে করে সম্ভবত আপনার কাছে যা অহী নাযিল তার কিয়দাংশ আপনি ছেড়ে দেন এবং এ কারণে আপনার মনোকষ্ট হবে যখন তারা বলে বসবে, এ ব্যক্তির ওপর কোন ধন ভাণ্ডার অবতীর্ণ হলো না কেন, কিংবা তাঁর সাথে কোনো ফেরেশতা এলো না কেন? আসলে আপনি তো একজন ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র। যাবতীয় কাজের কর্মবিধায়ক তো হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।"[১৬১]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শেষোক্ত আয়াতে نَذِيرٌ শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, "আপনি তাদের কাছে আমি আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তা প্রচার করুন। নিশ্চয়ই আপনি একজন সতর্ককারী, তাদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করুন ...আপনার উপর প্রচার করা এবং সতর্ক করা ছাড়া কোন দায়িত্ব নেই।"[১৬২]

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা আরো শক্ত ভাষায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন,

'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের ওপর আমি আপনাকে প্রহরী বানিয়ে পাঠাইনি।"[১৬৩]

২.১০ অমুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি রক্ষার নির্দেশ

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আরবের মুশরিক অনেক গোত্রের সাথে বিভিন্ন মেয়াদে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এরপর মুসলমানরা অষ্টম ও নবম হিজরীতে মক্কায় দু'বার হজ্ব পালন করে। এ সময়ের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ এ সমস্ত গোত্রের অনেকে এমন ছিল যারা চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতো এবং সুযোগ পেলেই সকল অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুতায় লিপ্ত হতো। বনূ কিনানাহ ও বনূ দামরাহ ব্যতিত চুক্তিবদ্ধ সকল গোত্রই চুক্তিভঙ্গ করেছিল। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরা তওবার প্রথম থেকে পঞ্চম রুকু পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল করে মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেন যে,

---

১৬১ আল কুর'আন, সূরা হুদ : ১২
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

১৬২ মুহাম্মদ বিন জাবীর আত ত্বাবারী, *জামিউল বয়ান ফি তা'য়ীলুল কুর'আন*, (বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালাহ, ২০০০ সন খ্রী.), খ. ১৫, পৃ. ২৫৮
يقول تعالى ذكره: فبلغهم ما أوحيته إليك، فإنك إنما أنت نذير تُنْذرهم عقابي، وتحذرهم بأسي على كفرهم بي، وإنما الآيات التي يسألونكها عندي وفي سلطاني، أنزلها إذا شئت، وليس عليك، إلا البلاغ والإنذار

১৬৩ আল কুর'আন, সূরা নিসা: ৮০
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

যেসব মুশরিক মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে তা ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়া হল। তবে যেসব গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে। যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা তাকওয়া বিরোধী কাজ। আল্লাহর কাছে তারাই প্রিয় ও পছন্দনীয়, যারা সব অবস্থায় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

"তবে সেসব লোকের কথা আলাদা, যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছো, অতপর তারা (চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে) এতটুকুও ত্রুটি করেনি- না তারা কখনো তোমাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করেছে, তাদের চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা মেনে চলবে; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।"[১৬৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, 'তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ যেমন হুদাইবিয়ার পর বনূ কিনানার সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ও পরে যারা তোমাদের নয় মাসের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ নয় মাস পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে। আল্লাহ চুক্তি পালনকারী মুত্তাকীদের পছন্দ করেন।"[১৬৫]

এছাড়া অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করতে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুর'আনের অন্যান্য আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনঃ

"মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট বলবৎ থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্যে সরল থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।"[১৬৬]

" আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।"[১৬৭]

---

[১৬৪] আল কুর'আন, সূরা তওবা : ০৪

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

[১৬৫] 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস(রা.), *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩

{إِلاَّ الَّذين عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكين} يَعْنِي بني كنَانَة بعد عَام الْحُدَيْبِيَة {ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً} لم ينقضوا عَهدهم مِمَّن كَانَ لَهُم تِسْعَة أشهر {وَلَمْ يُظَاهِرُواْ} وَلم يعاونوا {عَلَيْكُمْ أَحداً} من عَدوكُمْ {فَأتمُّوا إِلَيْهِمْ} لَهُم {عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ} إِلَى وَقت أَجلهم تِسْعَة أشهر {إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} عَن نقض الْعَهْد

[১৬৬] আল কুর'আন, সূরা তওবা : ০৭

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

[১৬৭] আল কুর'আন, সূরা নাহল : ৯১

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

২.১১ চুক্তিবদ্ধ ভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে স্বজাতিকে সাহায্যের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তিতে পৃথিবীর সকল মুসলমান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ইসলামী রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিমদের একে অন্যের সুখে দুঃখে সহমর্মী হওয়া উচিত। একে অন্যের প্রতি সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া বাঞ্ছনীয়। যে সব মুসলিম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অমুসলিম জাতির দ্বারা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে অন্যান্য মুসলমানদের কর্তব্য তাদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করতে সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা চালানো। এরূপ অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তাদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে যদি চুক্তিবদ্ধ জাতির সাথে কৃত প্রতিজ্ঞাসমূহ ভঙ্গ হয় তবে চুক্তিবদ্ধ মুসলমানরা চুক্তিভঙ্গ করে তাদেরকে সাহায্য করার অধিকার রাখে না। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বলেন,

"নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারা সবাই পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে অথচ এখনো হিজরত করেনি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হিজরত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই, যদি তারা দ্বীনের খাতিরে তোমাদের কাছে কোন সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যেন এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না হয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার সব কিছুই দেখেন।"[১৬৮]

২.১২ অমুসলিমকে আশ্রয় প্রদানের নির্দেশ

শুধু চুক্তিবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নয় বরং ইসলাম এমনই এক অসাম্প্রদায়িক ধর্ম যেখানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের জীবন অনেক পবিত্র এবং অমূল্য। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে মুসলমানদেরকে অন্যান্য মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার তাগিদ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিপদে পড়ে যদি ভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে মুসলমানদের কর্তব্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়া। বিপদসঙ্কুল সময়টিতে তার জন্য সর্বাত্মক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

" আর মুশরিকদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে তুমি আশ্রয় দেবে, যাতে করে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে; এজন্যেই যে, এরা এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা কিছুই জানেনা।"[১৬৯]

---

[১৬৮] আল কুর'আন, সূরা আনফাল :৭২

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[১৬৯] আল কুর'আন, সূরা তাওবা : ৬

২.১৩ বিতর্ক উত্তম পন্থায়

প্রতিটি সম্প্রদায় দল ও জাতির একেকটি আদর্শ থাকে। তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব আদর্শকে ভালবাসে এবং একে অন্যান্য মতাদর্শ থেকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট হয়। এ কারণেই বিভিন্ন দল ও মতের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরী হয়। বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক সংঘাত, বিশৃংখলা, মারামারি, হানাহানি ইত্যাদি। মহান আল্লাহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরীর উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রেও মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"তুমি তোমার রবের পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহবান কর এবং বিতর্ক কর উৎকৃষ্ট পন্থায়।"[১৭০]

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি পথ হারা মানুষকে ইসলামের দিকে কুরআন, প্রজ্ঞা এবং সদুপদেশের দ্বারা আহবান কর যেন তারা ইসলামের সুশীতল পরশে আসতে পারে। আর যদি কেউ তোমার কথা না শুনে তার মতাদর্শ নিয়ে তোমার সাথে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয় অথবা তোমার তাকে যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাতে হয় তবে তুমি তার সাথে উত্তম পন্থায় ভদ্রতা বজায় রেখে বিতর্কে লিপ্ত হবে। এ আয়াতে বিতর্কের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা أَحْسَنُ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লামা মাওয়ার্দী তাঁর তাফসীরে এ শব্দের চারটি ব্যাখ্যা করেছেন, এক: এর অর্থ ক্ষমা করা, দুই: হৃদয়কে জাগ্রত করা এবং বুদ্ধিকে ধ্বংস না করা , তিন: পরবর্তীদের পথপ্রদর্শন করা এবং পূর্ববর্তীদের সমালোচনা না করা, চার: মানুষের বোধশক্তি অনুযায়ী কথা বলা। যেমন নাফে' ইব্ন উমর থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, " নিশ্চয়ই আমরা নবীদের জাতি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের বুদ্ধি অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলতে।"[১৭১]

وجادلْهُم بالتي هي أحسنُ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইব্ন কাসীর বলেন, "তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তর্ক বির্তক করতে চায়, তার সাথে তা হবে সুন্দর ভঙ্গিতে, নম্র-ভদ্র ভাবে এবং সুন্দর ভাষায়।"[১৭২]

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

[১৭০] আল কুর'আন, সূরা নাহল : ১২৫

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

[১৭১] আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল মাওয়ার্দী, *তাফসীরে মাওয়ার্দী*,(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ২২০

{وجادلْهُم بالتي هي أحسنُ} فيه أربعة أوجه: أحدها: يعني بالعفو. الثاني: بأن توقظ القلوب ولا تسفه العقول. الثالث: بأن ترشد الخلف ولا تذم السلف. الرابع: على قدر ما يحتملون. روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم).

[১৭২] ইব্ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬১৪

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুর'আনে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

"তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া কোন রকম তর্ক-বিতর্ক করো না।"[১৭৩]

এছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মূসা ও হারুন (আ.) কে যখন ফিরআউনের নিকট হেদায়াতের দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তখন তাদেরকে বলেছেন, " তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হতে পারে সে তোমাদের উপদেশ কবুল করবে অথবা সে ভয় করবে।"[১৭৪]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে সহনশীল ও উত্তম পন্থায় অন্য সম্প্রদায়ের সাথে আলাপ আলোচনায় বসতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২.১৪ ক্ষমার নীতি অবলম্বন

সারা জাহানের মালিক আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হলেন পরম করুণাময় ও দয়াশীল। তিনি চান পৃথিবীর বুকে সকল মানুষ মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করুক। তাইতো তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদেরকে উদার হৃদয়ের, কোমল স্বভাবের এবং সহিষ্ণু চরিত্রের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইসলাম প্রচারের যে মহান দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাতে তিনি কিছু মানুষকে পাবেন যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করবেন। আর কিছু মানুষ এর বিরোধী হবে এটাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা দিক নির্দেশনা দিয়ে বলছেন, তাকে নিজের সংগী সাথীদের জন্য স্নেহশীল, সাধারণ মানুষের জন্য দয়ার্দ্র হৃদয় এবং নিজের বিরোধীদের প্রতি সহনশীল ও সহিষ্ণু হতে হবে। বিরোধীদের কঠোর ব্যবহারকে সহ্য করে তাদের বিরক্তিকর ও অপছন্দীয় কথাগুলোও উদার মনে এড়িয়ে যেতে হবে। তারা যত খারাপ ব্যবহারই করুক না কেন, যতই বর্বর হোক না কেন, ইসলামের আদর্শ হল কঠোর প্রতিক্রিয়া, কর্কশ আচরণ ও বর্বরোচিত প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। তাদের সকল কর্মকাণ্ড ধৈর্যের সাথে সহ্য করে উদারতার পরিচয় দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

" তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মুর্খ লোকদের এড়িয়ে চলো।"[১৭৫]

আল্লাহ পাক আরো বলেন,

مَنِ احْتَاجَ مِنْهُمْ إِلَى مُنَاظَرَةٍ وَجِدَالٍ، فَلْيَكُنْ بِالْوَجْهِ الْحَسَنِ بِرِفْقٍ وَلِينٍ وَحُسْنِ خِطَابٍ

[১৭৩] আল কুর'আন, সূরা আনকাবুত : ৪৬

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

[১৭৪] আল কুর'আন, সূরা ত্বহা : ৪৪

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى

[১৭৫] আল কুর'আন, সূরা আ'রাফ : ১৯৯

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Dhaka University Institutional Repository

"ঈমানদারদেরকে তুমি বলো, যারা আল্লাহ তা'আলার দিনগুলো থেকে কিছু আশা করে না, তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়, যাতে করে আল্লাহ তা'আলা এ দলকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পুরোপুরি বিনিময় দিতে পারেন।"[১৭৬]

প্রথমোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মাওয়ার্দী বলেন, خُذِ الْعَفْوَ এর ব্যাখ্যায় তিনটি মতামত পাওয়া যায়। এক, ইব্ন যুবাইর, হাসান ও মুজাহিদ (রহ) এর মতে, এর অর্থ মানুষের আচরণকে ও তাদের কর্মকাণ্ডকে ক্ষমা করা। দুই, দাহহাক, সুদ্দী ও ইব্ন আব্বাস (রা.) এর একটি অভিমত হল, এর অর্থ মুসলমানদের সম্পদ থেকে ক্ষমা করা এবং এটি যাকাত ফরজ হওয়ার পূর্বের অবস্থা যা পরে রহিত হয়ে যায়। তিন, ইব্ন যায়েদ এর মতে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করা এবং এটি জিহাদ ফরজ হওয়ার পূর্বে।

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ এর ব্যাখ্যায় দুটি মত পাওয়া যায়। এক, উরওয়াহ ও কাতাদাহ (রহ.) এর মতে এর অর্থ সৎকাজ। দুই, ইব্ন যায়েদ বলেন, নবী (স) থেকে বর্ণিত আছে যখন خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ আয়াতটি নাযিল হল তখন তিনি জিব্রাঈল (আ.)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে জিব্রাঈল এটা কী? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি জানিনা, আপনি যিনি জানেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর জিব্রাঈল ফিরে এসে আবার বলল, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনার প্রভু আপনাকে আদেশ করেছেন যে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে সম্পর্ক গড়তে, যে আপনাকে অধিকার বঞ্চিত করে তাকে অধিকার প্রদান করতে এবং যে আপনার প্রতি যুলম করে তাকে ক্ষমা করে দিতে।"[১৭৭]

২.১৫ মুসলমানদের উদারতার চেতনা

মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা হল উদারতার চেতনা। সুন্দর ও সৌহার্দপূর্ণ আচার-আচরণ, বন্ধুভাবাপন্ন লেনদেন, প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার এবং উদার মানবিকতার মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ ঘটে। এগুলো এমন বিষয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অত্যাবশ্যকীয়। এই উদারতার প্রকাশ ঘটেছে মুশরিক পিতা-মাতা যখন মুসলিম সন্তানকে শিরক ও কুফরীর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তখন তাদের সাথে করণীয় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতে। এ প্রসঙ্গে কুর'আনের নির্দেশ হল:

---

[১৭৬] আল কুর'আন, সূরা জাসিয়া : ১৪

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

[১৭৭] আল্লামা মাওয়ার্দী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৮৮

قوله عز وجل: {خُذِ الْعَفْوَ} فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: العفو من أخلاق الناس وأعمالهم , قاله ابن الزبير , والحسن , ومجاهد. الثاني: خذ العفو من أموال المسلمين , وهذا قبل فرض الزكاة ثم نسخ بها , قاله الضحاك والسدي وأحد قولي ابن عباس. والثالث: خذ العفو من المشركين , وهذا قبل فرض الجهاد , قاله ابن زيد. {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} فيه قولان: أحدهما: معناه بالمعروف , قاله عروة وقتادة.
والثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل حين نزلت عليه هذه الآية {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}: (يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا) قال: لا أدري أسأل العالم , قال (ثُمَّ عَادَ جِبْرِيلُ فَقَالَ) (يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك , وتعفو عمَّن ظلمك) قاله ابن زيد.

"তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বাস করবে সৎভাবে।"[১৭৮] মুসলমানদের উদারতার গুণাবলী বর্ণনায় বলা হয়েছে,

"আহারের প্রতি তাদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য প্রদান করে এবং বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান চাইনা, কৃতজ্ঞতাও নয়।"[১৭৯]

এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন বন্দী বলতে শুধু মুশরিক বন্দীরই অস্তিত্ব ছিল। মুশরিক পাড়া-প্রতিবেশীকে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান বৈধ হবে কিনা এ বিষয়ে কোন কোন মুসলিমের মনে সন্দেহ সংশয় ছিল। তাদের এ সংশয়ের জবাবে কুর'আনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে,

"যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য এবং তোমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"[১৮০] এছাড়া আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে যাকাতের যে আটটি খাত বর্ণনা করেছেন তাতে প্রথমেই ফকির মিসকিন এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন " যাকাত কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্থদের জন্য।"[১৮১]

এ আয়াতে ফকীর ও মিসকিন কোন ধর্মের অনুসারী তা উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ এ অর্থ ধর্ম, দল, মত, নির্বিশেষে সকল অসহায়, দরিদ্র, দুস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

২.১৬ ধৈর্য ধারণের নির্দেশনা

পৃথিবীতে মুমিনদের জীবন চলার পথ হল বন্ধুর প্রকৃতির। এ পথে অনেক কষ্ট, বাঁধা, বিপত্তি। কন্টকাকীর্ণ এ পথের পদে পদে মুসলমানদেরকে বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যাচার, নির্যাতন নিপীড়নের স্বীকার হতে হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এ অবস্থায় মুসলিম জাতিকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিচ্ছেন। ইসলাম প্রচারের কাজে অথবা মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করার কারণে অমুসলিমদের দ্বারা

---

[১৭৮] আল কুর'আন, সূরা লুকমান: ১৫

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

[১৭৯] আল কুর'আন, সূরা দাহর : ৮

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

[১৮০] আল কুর'আন, সূরা বাকারা : ২৭২

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

[১৮১] আল কুর'আন, সূরা তওবা : ৬০

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তারা যত নির্যাতিতই হোক না কেন তাদের উচিত পৃথিবীতে অশান্তি বিশৃংখলা সৃষ্টি না করা। তাদের প্রতি বর্বরোচিত প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। আর যদি প্রতিরোধ গড়ার বা প্রতিশোধ নেয়ার প্রয়োজন হয় তবে ততটুকু নেয়া ঠিক যতটুকু অন্যায় তাদের প্রতি করা হয়েছে। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আরো নির্দেশ হচ্ছে, সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-ফাসাদ, বিশৃংখলা, বর্বরোচিত প্রতিশোধ, নৃশংসতা ইত্যাদি এড়িয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা, ধৈর্য ধারণ করা। তাদের উপর কৃত সকল যুলম, অত্যাচার, অবিচারের বিষয়গুলো আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়ে ধৈর্যের সাথে বসবাস করা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন, "আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার ওপর কোনো একটি জনগোষ্ঠী যদি ঈমান আনে, আর একটি দল যদি তার ওপর আদৌ ঈমান না আনে, তারপরও তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা নিজেই আমাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দেন, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী।"[১৮২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন, "যদি তোমরা কাউকে শাস্তি দাও তাহলে ঠিক ততটুকু শাস্তিই দেবে যতটুকু তোমাদের সাথে করা হয়েছে, অবশ্য যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো তাহলে, ধৈর্যশীলদের জন্যে তাই হচ্ছে উত্তম। তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্যই। এদের ওপর দুঃখ করো না এবং এরা যেসব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোক্ষুণ্ন হয়ো না।"[১৮৩] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরো বলেন,

"আমরা আল্লাহ তা'আলার ওপর নির্ভর করবোই না কেন? তিনিই আমাদের পথসমুহ দেখিয়েছেন; তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছ তাতে অবশ্যই আমরা ধৈর্য ধারণ করবো। নির্ভর করতে হলে সবার আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা উচিত।"[১৮৪]

২.১৭ আল কুর'আন পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী

ইসলামের উদারতার আরেকটি নিদর্শন হল যে, ইসলাম কখনো পূর্ববর্তী ধর্ম ও তাদের অনুসারীদেরকে অস্বীকার করেনি। বরং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসরণকারীদের ঐশী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রকাশ করেছেন। তিনি মানব জাতিকে অবহিত করেছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বেও নবী ও রাসূল

---

[১৮২] আল কুর'আন, সূরা আরাফ : ৮৭

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

[১৮৩] আল কুর'আন, সূরা নাহল : ১২৬-১২৭

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ

[১৮৪] আল কুর'আন, সূরা ইবরাহীম : ১২

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

প্রেরণ করেছেন। এসব নবী ও রাসূলগণের নিকট তিনি মানুষের জন্য হেদায়াতের বাণী প্রেরণ করেছেন। মূসা ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পাঠিয়েছেন তাওরাত গ্রন্থ। দাউদ (আ.) ও ঈসা (আ.) এর নিকট যথাক্রমে পাঠিয়েছেন যবুর ও ইনজিল কিতাব। আর অন্যান্য রাসূলগণের নিকট আরো অনেক সহীফা অর্থাৎ ছোট গ্রন্থ নাযিল করেছেন। যেগুলো ছিল আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য আলোকবর্তিকা। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা পবিত্র কুর’আনকে বানিয়েছেন পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী। তিনি ঘোষণা করছেন যে, তাওরাত, যবুর, ইনজিল ও অন্যান্য ঐশী গ্রন্থসমূহ মিথ্যা নয়। বরং আল্লাহ তা‘আলাই মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে এক সময় এগুলোকে প্রেরণ করেছিলেন। তবে যেহেতু সময়ের পরিক্রমায় মানুষ এসব গ্রন্থসমূহে রদবদল ঘটিয়েছে। নিজেদের স্বার্থে এসব গ্রন্থের কিছু অংশ প্রকাশ করেছে এবং কিছু অংশ গোপন রেখেছে, তাই অনুসরণীয় গ্রন্থ হিসেবে এসব ঐশী গ্রন্থের যোগ্যতা হারিয়ে গিয়েছে। এখন এসব ঐশীগ্রন্থের স্থলে সর্বশেষ অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কুর‘আনই একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুর’আনে বলেন,

“এর আগে মূসার কিতাব ছিল পদপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী ভাষায়, যাতে যালেমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দেয়।”[১৮৫]

“এবং আমি নুহ ও ইব্রাহীমকে রিসালাত দান করেছি, তাদের বংশধরদের দিয়েছি নবুয়ত ও কিতাব। তারা হিদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছে। অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম তনয় ঈসাকে ও তাঁকে দিয়েছি ইঞ্জিল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরজ করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে। অতঃএব যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।”[১৮৬]

এ কু’রআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে

---

[১৮৫] আল কুর’আন, সূরা আহকাফ : ১২

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ

[১৮৬] আল কুর’আন, সূরা হাদীদ :২৭

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে।”[১৮৭]

২.১৮ মাপ ও ওজনে ইনসাফ করা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কু'রআনে অর্থনৈতিক লেনদেনের কারণেও যেন সাম্প্রদায়িক সংঘাতের সূচনা না হয় তার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, মুসলমানদেরকে মানুষের অধিকার সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। তাদেরকে অর্থনৈতিক লেনদেনসমূহ ন্যায়পরায়ণতার সাথে সম্পাদন করতে সর্তক করেছেন। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পদের ক্ষতি সাধন করতে নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে পৃথিবীতে তাদের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূচনা করে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি পবিত্র কুর'আনে বলেন,

“আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাণ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্র কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না।”[১৮৮]

২.১৯ অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ

মহান আল্লাহ মানুষকে মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি অনুগত অথবা তাঁর অবাধ্য সকল মানুষের প্রাণই সম্মানিত। তিনি পবিত্র কুর'আনে মুসলমানদেরকে অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন অন্যায় ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধ। আর ধর্ম,বর্ণ, দল, মত নির্বিশেষে কোন নিরীহ মানুষের প্রাণ রক্ষা করা সমগ্র মানবতাকে রক্ষা করার শামিল। কেননা, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের যদি অন্য মানুষের প্রাণের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত থাকে এবং তাদের প্রত্যেকে একে অন্যের জীবনের স্থায়ীত্বে ও সংরক্ষণে সাহায্যকারী হবার মনোভাব পোষণ করে তা হলেই কেবল মানবজাতির অস্তিত্ব নিশ্চিত ও নিরাপদ হতে পারে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে শুধুমাত্র ঐ এক ব্যক্তির উপর অন্যায় করে না বরং সে একথাও প্রমাণ করে যে, তার হৃদয়ে মানুষের জীবনের প্রতি মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতির কোন স্থান নেই। সে সমগ্র মানবতার শত্রু। কারণ তার মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাওয়া গেলে সারা দুনিয়া থেকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের জীবন রক্ষা করতে চায় তার উপর মানবতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন, “ এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা

---

[১৮৭] আল কুর'আন, সূরা আনআম : ৯২

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

[১৮৮] আল কুর'আন, সূরা হুদ : ৮৫

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে।"[১৮৯]

তিনি আরো বলেন,

"সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ ন্যায় ব্যতিত হত্যা হারাম করেছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত।"[১৯০]

২.২০ মানুষের সাথে শত্রুতা চিরন্তন নয়

মুমিন ব্যক্তির বন্ধুত্ব স্থাপন এবং শত্রুতা পোষণ উভয়ই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় হয়ে থাকে। এখানে তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে না। সে শুধুমাত্র ধর্মীয় ও পার্থিব কারণে কোন ব্যক্তির অথবা দলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। কিন্তু এই শত্রুতা সত্যের স্বার্থে হোক আর মিথ্যার স্বার্থে হোক, চিরদিন অটুট থাকে না। অন্য ধর্ম, অন্য মত বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সাথে এই শত্রুতা চিরন্তন নয় এই শিক্ষাই ইসলাম মুসলমানদেরকে দেয়। কেননা, সময়ের পরিক্রমায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়। পরিবেশ পরিস্থিতিও অনেক সময় পাল্টে যায়। গতকালের শত্রু কখনো আজকে বন্ধুতে পরিণত হয় আবার বন্ধুও শত্রু হয়ে যায়। কখনো আবার আজকের দূর-সম্পর্কের মানুষ কাল নিকটাত্মীয় হয়ে যায়। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। শত্রুতার ক্ষেত্রেও এমন বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় যাতে মীমাংসা বা সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কোন উপায় না থাকে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও মুসলমানদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে নিষেধাজ্ঞার পর এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সাথীদের দৃঢ়তার উদাহরণ পেশ করেছেন। তাঁরা তাঁদের জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল "তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হল চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আন।"[১৯১]

---

[১৮৯] আল কুর'আন, সূরা মায়েদা : ৩২

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

[১৯০] আল কুর'আন, সূরা ইসরা : ৩৩

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

[১৯১] আল কুর'আন, সূরা মুমতাহিনা :০৪

Dhaka University Institutional Repository

এরপর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরো বলেন, "যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন; আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[১৯২]

২.২১ সংঘাত তৈরীতে উসকানীমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ

যেসব কারণে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা ও বৈরী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে, যে কাজ মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূচনা করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে সেসব কাজ চিহ্নিত করে মুসলমানদেরকে এগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস না করে। এমনও তো হতে পারে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। আবার নারীরাও যেন নারীদের উপহাস না করে, হতে পারে যাদের উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করবেনা, খারাপ নামে ডাকবেনা। ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা একটি বড় অপরাধ। যারা এ আচরণ থেকে ফিরে না আসবে তারা যালিম। হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" [১৯৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। এখানে তিনি لَا يَسْخَرْ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইমাদুদ্দীন বলেন, "আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে এবং তাদেরকে ঠাট্টা-উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসে আছে যে, গর্ব অহংকার হল সত্য হতে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে ঘৃণা ও তুচ্ছ জ্ঞান করার নাম। (মুসলিম ১/৯৩) আল্লাহ তা'আলা এর কারণ বর্ণনা করছেন যে, মানুষ যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করছে এবং উপহাসের পাত্র মনে করছে সেই হয়তো আল্লাহ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

[১৯২] আল কুর'আন, সূরা মুমতাহিনা :০৭

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

[১৯৩] আল কুর'আন, সূরা হুজুরাত : ১১-১২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

তা'আলার নিকট বেশী মর্যাদাবান। পুরুষদেরকে এটা হতে নিষেধ করার পর পৃথকভাবে নারীদেরকেও এটা হতে নিষেধ করেছেন।"[১৯৪]

এরপর আল্লাহ তা'আলা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব তৈরী হয়, একজনের প্রতি অন্যজনের মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, শত্রুতার সূত্রপাত হয় এমন সকল কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যেমন একে অপরকে অহেতুক দোষারোপ না করা, কোন ব্যক্তিকে মন্দ নামে আখ্যায়িত না করা। কেননা, এতে যে কোন ব্যক্তি তার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে।

এদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে বহুবিদ অনুমান করা হতে, সন্দেহ পোষণ করা হতে, অপবাদ দেয়া ও গীবত করা হতে বিরত থাকতে বলেছেন, অন্যের গোপন দোষ ত্রুটি অন্বেষণ করতেও নিষেধ করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও মানব জাতিকে দাঙ্গা ফাসাদের হাত থেকে রক্ষার জন্য এ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কু-ধারণা হতে বেঁচে থাক, কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা কারও গোপন তথ্য সন্ধান করোনা। একে অপরের দোষ-ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা একে অপর থেকে পৃথক থেকোনা এবং হে আল্লাহর বান্দারা! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।"[১৯৫]

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো না, একে অপরের সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করো না। একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, বরং আল্লাহর বান্দারা সবাই মিলে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বলা ও মেলামেশা করা পরিত্যাগ করে।"[১৯৬]

বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত। এজন্যেই তিনি অবতীর্ণ করেছেন পবিত্র কুর'আন যা শান্তির বার্তা শোনায়। এতে রয়েছে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের উপাদান। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ যেভাবে বহুদা বিভক্ত মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তা অতুলনীয়। পবিত্র কুর'আনের নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এবং বাস্তবায়নই সাম্প্রদায়িক সংঘাত সহিংসতা দূরীভুত করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনাবিল ফল্গুধারা।

---

[১৯৪] ইব্‌ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭৬

[১৯৫] মালিক বিন আনাস, *মুআত্তা ইমাম মালিক*, (বৈরুত : দারুল ইহয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৭৫খ্রী.), খ. ২, বাব মা জাআ ফিল মুহাজিরাহ, পৃ. ৯০৭

[১৯৬] মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত তিরমীজি, *জামিউল কাবীর*, (বৈরুত : দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮খ্রী.), খ. ৩, বাব মা জাআ ফিল হাসাদ, পৃ.ং ৩৯৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভূমিকা

৩.১ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভূমিকা

মহান আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর নবুয়তী জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব জীবনের সার্বিক দিকে শান্তি, শৃংখলা ও সমৃদ্ধি আনয়নের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন । তিনি একদিকে মানুষের আত্মিক ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের শিক্ষা প্রদান করেছেন, অন্যদিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ। কেননা মানুষ সামাজিক জীব। তাকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, রক্ত, গোত্র ও ভাষার মানুষের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মানুষ এই বিভিন্নতায় নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ঝড়ছে বহু নিরীহ মানুষের রক্ত। শুধু সম্প্রদায়গত পার্থক্যের কারণে নির্দয়ভাবে মানুষ মানুষের প্রাণ সংহারে উদ্যত হচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষে মানুষে সাম্য, শৃংখলা ও ঐক্য গঠন করে সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল ও অনুসরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। শতধা বিভক্ত আরব সমাজে আগমণ করে নবুয়তী জীবনের মাত্র তেইশ বছরে সম্পূর্ণ বর্বর, অসভ্য, অসামাজিক, অসহিষ্ণু এক জাতিকে একটি সভ্য সুশৃংখল কল্যাণকামী ও সহিষ্ণু জাতিতে পরিণত করেছেন। আরব সমাজের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মূলে করেছেন কুঠারাঘাত। ধর্ম, বর্ণ, রক্ত, গোত্র ও ভাষার পার্থক্যের উর্ধ্বে মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করে তাদের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করেছেন।

বিশ্বমানবের মুক্তির বার্তাবাহক মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার এক অনুপম আর্দশ। এক্ষেত্রে তাঁর অবদানগুলোকে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ভাগের আলোকে আলোচনা করা যায়।

৩.১.১ প্রাক নবুয়তী জীবন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজীবন নিস্পাপ ছিলেন। তাঁর হৃদয়-মন মানুষের প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। নবুয়ত পাওয়ার পূর্বে তাঁর চল্লিশ বছর কালীন জীবনে তিনি তৎকালীন অসহায় মানুষের প্রতি মহানুভব ছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি বিবাদমান মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতেন। বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিলে স্বপ্রণোদিত হয়ে সমাধানে এগিয়ে আসতেন। যেমন,

হিলফুল ফুদূল গঠন: প্রাক ইসলামী যুগের ঘোর তমসাচ্ছন্ন সময়ে জাজিরাতুল ‘আরবে বিরাজ করছিল চরম অশান্তি। মানুষের মাঝে ছিল মানবতার অভাব। যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-নৃশংসতা, মদ-

Dhaka University Institutional Repository

জুয়া, নারীর অবমাননা, অসহনশীলতা ও চরম গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিশৃঙ্খল এই পরিবেশে সাম্প্রদায়িক 'আরব জাতি বছরের চারটি মাস ছাড়া সবসময়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। তাদের এসব যুদ্ধের কারণ ও উৎপত্তি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন এর বর্ণনায়। তারা 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) এর সমকালীন পরিবেশ ও জীবন' নামক গ্রন্থে বলেন, "এই অবসর সময়ে তাহারা ব্যবসা-বানিজ্য এবং আমোদ-প্রমোদের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিত। এই উপলক্ষ্যে 'উকায, যুলমাজ্না প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি মেলা বসিত। তন্মধ্যে 'উকায মেলাই ছিল সর্বপ্রধান। ঐ সমস্ত মেলায় বিভিন্ন গোত্রের কবিগণ আসর জমাইয়া বসিত এবং অসাধারণ ধী-শক্তি ও অনুপম প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইত। তাহারা নিজ নিজ গোত্রের বংশ-মর্যাদা অতিথি সেবা বীরত্ব ও রণ-নৈপুণ্য এবং তৎসঙ্গে বিপক্ষ গোত্রের নীচতা, কার্পণ্য কাপুরুষতা ও কুৎসা-কাহিনী বর্ণনা করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিত। যাহাদের আত্মীয়-স্বজন কোন শত্রুর হাতে নিহত হইয়াছে তাহারা নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হওয়ার পরে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য এই সমস্ত সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া শত্রুদিগকে চিনিয়া রাখিত। এতদ্ব্যতীত ঘোড়দৌড়, জুয়া খেলা, মদ্য পান ইত্যাদি এসব মেলাতে হরদম চলিতেই থাকিত। এই সমস্ত ব্যাপার হইতে অনেক সময় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি ও যুদ্ধ বিগ্রহের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিত।"[১৯৭]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শৈশব কালে এই 'উকাযের মেলা হতেই ফিজার যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। নিষিদ্ধ মাসে এ যুদ্ধের সূত্রপাত হওয়ায় একে 'হরবুল ফিজার' বলা হয়। তিনি তাঁর আপন চাচাদের সাথে এ রণাঙ্গনে উপস্থিত হন। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি উল্লেখ করে ইব্ন হিশাম বলেন,

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিজার যুদ্ধে কয়েকদিন অংশগ্রহণ করেন। তাঁর চাচারা তাঁকে সঙ্গে করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর বর্শাগুলো প্রতিহত করতাম এবং তা কুড়িয়ে এনে চাচাদের হাতে তুলে দিতাম।"[১৯৮]

---

১৯৭ শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)এর সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* , (ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মার্চ ২০০৯ খ্রী), পৃ. ১৯৫-১৯৬

১৯৮ আব্দুল মালেক ইব্ন হিশাম, *সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ*, (মিসর : শিরকাতু মাকতাবাতু ওয়া মাতবা'আতু মুসতাফা আলবাবী আলহালবী ওয়া আওলাদিহি বি, ১৯৫৫ খ্রী.), খ. ১ম, পৃ. ১৮৬

"وَشَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أَيَّامِهِمْ، أَخْرَجَهُ أَعْمَامُهُ مَعَهُمْ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ أَنْبُلُ عَلَى أَعْمَامِي: أَيْ أَرُدُّ عَلَيْهِمْ نَبْلَ عَدُوِّهِمْ إِذَا رَمَوْهُمْ بِهَا."

এ ফিজার যুদ্ধে 'আরববাসীরা মারাত্মক ক্ষতির স্বীকার হয় । বহু প্রাণহানি ঘটে, অসংখ্য শিশু ইয়াতিম ও নারী বিধবা হয় এবং অনেক সম্পদ বিনষ্ট হয়। ড. মজীদ আলী খানের ভাষায়,

"As a result of constant fighting thousand of lives were lost and there was no one to help them. The life in Arabia was not secure. Cruel persons oppressed the weak and the poor. Some kind-hearted people thought for it and made enormous efforts to form a committee for peace."[১৯৯]

শিশু মুহাম্মদ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে খুব কাছে থেকে এর ভয়াবহতা পর্যবেক্ষণ করেন যা তাঁর কচি মনকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। এ যুদ্ধের নৃশংসতা 'আরববাসীদের মধ্যে যারা প্রচ্ছন্ন মনের অধিকারী তাদের বিবেককেও নাড়া দেয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা যুবায়ের বিন 'আব্দুল মুত্তালিব। তাঁরা গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সহনশীলতা, সহমর্মিতা সৃষ্টি এবং বিদেশি অসহায়, দুর্বল ও দরিদ্র মানুষদের সহযোগিতার মন মানসিকতা তৈরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালান।

এর ফলে আরবের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি, দানশীল ও অতিথি পরায়ন আব্দুল্লাহ বিন জুদ'য়ান তাইমীর গৃহে অন্যায় এবং অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকার নামা সম্পাদিত হয়। যার নাম দেয়া হয় হিলফুল ফুদূল। এ সম্পর্কে "আর রাহীকুল মাখতুম" শীর্ষক গ্রন্থের গ্রন্থকার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। যার কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল,

"যে সকল গোত্র আলোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে প্রধান গোত্রগুলো হচ্ছে বনূ হাশিম, বনূ মুত্তালিব, বনূ আসাদ বিন আব্দুল উয্যা, বনূ যোহরা বিন কিলাব ও বনূ তামিম বিন মুররাহ। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। পূর্বে নিয়ম ছিল গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোন ব্যক্তি,আত্মীয় স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি শত অন্যায় অত্যাচার করলেও সংশ্লিষ্ট সকলকে তার সমর্থন করতেই হবে ; তা সে যত বড় বা বিভৎস অন্যায় হোক না কেন। এ পরামর্শ সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। কাজেই, এ ধরনের জঘণ্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন-

ক. দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

খ. বিদেশী লোকদের ধন-প্রাণ ও মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

গ. দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনই কুণ্ঠাবোধ করব না।

---

[১৯৯] Dr. Majid Ali Khan, Muhammad the Final Messenger, Sh, (Lahore : Muhammad Ashraf Publishers, 1983), P. 91

ঘ. অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।"[২০০]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর চাচা যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিব এ আলোচনা বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তরুণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন সে কল্যাণমুখী চিন্তা-ভাবনার উদ্ভাবক। সমবয়সী চাচা যুবায়ের ছিলেন এর প্রথম সমর্থক।

এভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই মানুষে মানুষে সৌহার্দ সম্প্রীতি রক্ষায় ভূমিকা রেখেছেন। এ সেবা সংঘে অংশ গ্রহণের ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষ্যেই পরবর্তীতে জানা যায়। ইব্‌ন কাছীর তাঁর 'সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ' গ্রন্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি তুলে ধরেন,[২০১]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا لَوْ دُعِيتُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، تَحَالَفُوا أَنْ يَرُدُّوا الْفُضُولَ عَلَى أَهْلِهَا وَأَلَّا يَعُزَّ ظَالِمٌ مَظْلُوم

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন: রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন ৩৫ বছর মতান্তরে ২৩ বছর তখন যুদ্ধ প্রিয় আরব গোত্রসমূহ আবার রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মুখোমুখি হয় যখন কুরাইশগণ পবিত্র কা'বার ভবন সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সবাই কা'বার সংস্কারে অংশগ্রহণ করাকে পুণ্যের কাজ মনে করায় প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে সংস্কারের দায়িত্বসমূহ বন্টন করে সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ নামক যে পাথরটি আদম 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেহেশত থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন প্রত্যেক গোত্রই সম্মান লাভের আশায় তা পুনঃস্থাপন করার কাজটি করতে চাইলে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়ে যায় এবং সবাই যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে জাতির এই ক্রান্তি লগ্নে শান্তিপূর্ণ ভাবে এ সমস্যার সমাধান দিয়ে যুদ্ধের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। সীরাতে ইব্‌ন হিশামে বর্ণিত আছে যে,

"ঐ সময় সমগ্র কুরাইশ সম্প্রদায়ের প্রবীণতম ব্যক্তি আবু উমাইয়া ইবনুল মুগীরা নিম্নরূপ আহ্বান জানালেন, "হে কুরাইশগণ, এই পবিত্র মসজিদের দরজা দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবে, তাকেই তোমরা এই বিবাদের মীমাংসার দায়িত্ব দাও।" সবাই এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। অতঃপর দেখা গেল, সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বপ্রথম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, "এতো আমাদের আল আমীন (পরম বিশ্বস্ত) মুহাম্মদ। তাঁর ফয়সালা আমরা মাথা পেতে নেব।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবদমান লোকদের

[২০০] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী ,*আর রাহীকুল মাখতুম*, (দামেশক : দারুল 'উসামা , ১৪৬৭ হি.) , পৃ. ১২

[২০১] আবুল ফিদা ইসমাইল ইব্‌ন কাছীর , *সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, (বৈরুত :দারুল মা'অরিফাতি লিত ত্বিবা'আতি ওয়া নাশরি ওয়াত তাওযিই'য়ি, ১৯৭৬ ইং), খ. ১ম, পৃ. ২৫৭-২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

কাছাকাছি গিয়ে উপনীত হলে সবাই তাঁকে তাদের বিবাদের বিষয়টা জানালো। তিনি বললেন, "আমাকে একখানা কাপড় দাও।" কাপড় দেয়া হলে তিনি তা বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদ উক্ত কাপড়ের মধ্যস্থলে স্থাপন করে বললেন, "প্রত্যেক গোত্রকে এই কাপড়ের চারপাশ ধরতে হবে।" সবাই তা ধরলো ও উঁচু করে যথাস্থানে দিয়ে রাখলো। অত:পর তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ তুলে যথাস্থানে রাখলেন ও তার উপর গাঁথুনি দিলেন।[২০২]

৩.১.২ মাক্কী জীবন

৬১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্ত হন। শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়। মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবনের এ সময়কালকে বলা হয় মাক্কী জীবন। এ সময় কাফির মুশরিকরা তাঁর উপর অত্যাচারের খড়গ চালালেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। তার কিছু উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হল:

বিদেশী অমুসলিমের অধিকার আদায়: মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের উপর কাফের মুশরিকদের ঠাট্টা- বিদ্রূপ, অত্যাচার নির্যাতন যখন চরমে তখন মুরদ আরাশী নামক এক ব্যক্তি বিক্রির উদ্দেশ্যে একটি উট নিয়ে মক্কায় আসে এবং আবু জাহলের সাথে এ বিষয়ে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আবু জাহল এর মূল্য দিতে গড়িমসি শুরু করলে সে কুরাইশদের বিভিন্ন নেতার কাছে ধরনা দিতে থাকে মূল্য আদায় করিয়ে দিতে। একদিন সে পবিত্র কা'বার চত্বরে কুরাইশদের একটি বৈঠকে আবু জাহলের কাছ থেকে দাম আদায় করিয়ে দেয়ার অনুরোধ করলে তারা বিপদে পড়ে যায়। কারণ তাদের মধ্যে কারো এমন সাহস ছিল না যে বিদেশী লোকের পক্ষ নিয়ে আবু জাহলের কাছে যাবে তার পাওনা আদায় করে দিতে। এমতাবস্থায় দুরাচার নেতৃবৃন্দ ঠাট্টা করে একটু দূরে বসে থাকা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে ইঙ্গিত করে মুরদ আরাশীকে বলল ঐ ব্যক্তির কাছে যাও সে তোমার দাবী আদায় করে দিবে। তারা আবু জাহল ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যকার শত্রুতার কথা ভেবে এ ঘটনাতে মজা দেখার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু আরাশী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে সব বললে তিনি বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে সাথে সাথে তাকে

---

[২০২] আব্দুল মালেক ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

أَن أَبَا أُمَيَّةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ بْنِ مَخْزُوم، وَكَانَ عامئذ أَسَنَّ قُرَيْشٍ كُلِّهَا، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ فِيمَا تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ يَقْضِي بَيْنَكُمْ فِيهِ، فَفَعَلُوا. فَكَانَ أَوَّلَ دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا:

هَذَا الْأَمِينُ، رَضِينَا، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُمَّ إِلَيَّ ثَوْبًا، فَأُتِيَ بِهِ، فَأَخَذَ الرُّكْنَ فَوَضَعَهُ فِيهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ:

لِتَأْخُذَ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِنَاحِيَةٍ مِنْ الثَّوْبِ، ثُمَّ ارْفَعُوهُ جَمِيعًا، فَفَعَلُوا: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا بِهِ مَوْضِعَهُ، وَضَعَهُ هُوَ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ.

নিয়ে আবু জাহলের কাছে যান এবং তাকে বলেন এ ব্যক্তির যা পাওনা আছে তা দিয়ে দাও। আবু জাহল তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে ভয়ে বিবর্ণ মুখে লোকটির সকল পাওনা পরিশোধ করে দিল। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনের পরোয়া না করে অমুসলিম বিদেশীর অধিকার আদায় করে দিলেন। [২০৩]

রক্ষিত আমানত প্রত্যর্পণ: মানবতার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবীয় সংকীর্ণতা ও কলুষতাকে ম্লান করে তাঁর মহত্বকে নিয়ে গেলেন পাহাড় সম উচ্চতায়। বিধর্মীদের প্রতি তার মহানুভবতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলেন। জীবন মৃত্যুর ক্রান্তি লগ্নে যখন মানুষ দিশেহারা হয়ে যায় নিজের অস্তিত্বের চিন্তায় তখন তিনি মহান আল্লাহ উপর ভরসা করে তাঁর শত্রুদের অধিকার রক্ষায় তার কর্তব্যকে ভুললেন না। মক্কার কাফির মুশরিকরা তাদের নিজ স্বার্থে যদিও ইসলামের বিরোধিতা করত, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে হাসি তামাশায় মেতে উঠতো, অত্যাচার নির্যাতনে তাঁকে জর্জরিত করতো তথাপি তারা একজন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্বে তাঁকেই সবচেয়ে বেশী আস্থাভাজন হিসেবে জানত। তারা তাদের মূল্যবান সম্পদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিম্মায় আমানত রাখতো।

তাঁর হিজরতের প্রাক্কালে যখন কাফির মুশরিকরা মক্কার সংসদ দারুন নদওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্র করছে। তখন এ সংবাদ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জিব্রাইল (আ.) এর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেন । মদীনায় যাবার আগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টায় বিভোর তাদের আমানত প্রত্যর্পণ করার জন্য আলী (রা.) কে দায়িত্ব দিয়ে যান ।

নঈম সিদ্দীকির 'মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ,

"তারপর প্রিয়তম সাথী হযরত আলীকে আপন বিছানায় নির্ভয়ে ঘুমানোর নির্দেশ দিলেন সেই সাথে লোকজনের রক্ষিত আমানতগুলো তাঁর কাছে অর্পণ করলেন এবং সকাল বেলা সংশ্লিষ্ট মালিকদের কাছে ফেরত দিতে বললেন। এত উঁচু মানের নৈতিকতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর কটাই

---

[২০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯- ৩৯০

وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَهُ فَضَرَبَ عَلَيْهِ بَابَهُ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَاخْرُجْ إِلَيَّ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، وَمَا فِي وَجْهِهِ مِنْ رَائِحَةٍ ، قَدْ اُنْتُقِعَ لَوْنُهُ، فَقَالَ: أَعْطِ هَذَا الرَّجُلَ حَقَّهُ، قَالَ: نَعَمْ، لَا تَبْرَحْ حَتَّى أُعْطِيَهُ الَّذِي لَهُ، قَالَ: فَدَخَلَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ بِحَقِّهِ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. (قَالَ) :

ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلْإِرَاشِيِّ: الْحَقْ بِشَأْنِكَ، فَأَقْبَلَ الْإِرَاشِيُّ حَتَّى وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ وَاللَّهِ أَخَذَ لِي حَقِّي.

Dhaka University Institutional Repository

বা আছে যে , একপক্ষ যাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে , সে স্বয়ং হত্যাকারীদের আমানত ফেরত দেয়ার চিন্তায় বিভোর ?"[২০৪]

প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা: চাচা আবু বকর ও প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার বাইরে ইসলামের প্রচার করার উদ্দেশ্যে মুক্ত দাস যায়েদ বিন হারিসাকে সফরসঙ্গী করে তায়েফ গমন করেন। তায়েফ নেতৃবৃন্দ কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহবানে সাড়া দিলো না বরং নির্মমভাবে তাঁর উপর অত্যাচার নির্যাতনের নৃশংস খড়্গ চালালো। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তায়েফ বাসীদের দুর্ব্যবহারের উল্লেখ করে "Muhammad the Final Messenger" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার বর্ণনা করেন,

"He traveled to Taif and invited its inhabitants towards Islam. But all the chieftains of the clan refused even to listen to the holy Prophet and treated him most contemptuously and rudely. When the holy prophet (Sallallahu `alauhi wa sallam) was having the town they told a gang of vagabonds to pelt him with stones. He was so much pelted that his whole body was covered with blood and his shoes were clogged to his feet."[২০৫]

তায়েফ বাসীদের চরম অত্যাচার ও নিষ্পেষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে গেল। তিনি অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। তাঁর সফর সঙ্গী যায়েদ বিন হারিসা তাঁকে ঘাড়ে করে শহরের বাইরে নিয়ে আসলেন এবং তাঁকে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে বদদোয়া করতে অনুরোধ করলেন। অথচ দয়াময় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন "আমি ওদের বিরুদ্ধে কেন বদদোয়া করবো? ওরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান নাও আনে তবে আশা করা যায়, তাদের পরবর্তী বংশধর অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।"[২০৬]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীবের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে তাঁর কাছে জিব্রাইল (আ.) কে পাঠালেন। জিব্রাইল (আ.) আঘাতে জর্জরিত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আল্লাহর আদেশে তায়েফ বাসীদের পাহাড়ের চাপে পিষ্ট করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু মহানুভব নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণের সর্বোচ্চ

---

[২০৪] নঈম সিদ্দকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

[২০৫] Majid Ali Khan, Muhammad the Final Messenger, Sh, (Lahore : Muhammad Ashraf Publishers, 1983), P. 91

[২০৬] নঈম সিদ্দীকি , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ক্ষমা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বুখারী শরীফে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে ,

তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার জীবনে কি এমন কোন দিন এসেছে যা উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন ছিল?”তিনি উত্তরে বললেন, “হ্যাঁ, তোমার কাওমের নিকট থেকে আমাকে যে যে দুঃখ কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে, তার মধ্যে সব চাইতে কঠিন ছিল ঐ দিনটি, যে দিন আমি ঘাঁটিতে বিচলিত ছিলাম। যখন আমি নিজেকে আবদে ইয়ালাইন বিন আবদে কুলালের পুত্রদের নিকট পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করায় দুশ্চিন্তা, ব্যাথা ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় আমি নিজ পথে গমন করি। এভাবে চলতে চলতে ‘কারণে সায়ালেবে’ যখন এসে পৌঁছি তখন আমার চেতনা ফিরে আসে। এ সময় আমার মনে কিছুটা স্বস্তি আসে। সেখানে আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি যে, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দান করছে। ব্যাপারটি আরও ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারি যে, এতে হযরত জিবরাঈল (আ.) রয়েছেন। তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বলেন: “আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা সব কিছুই শুনেছেন ও দেখেছেন। এখন তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশতাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাঁদেরকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন। এরপর পর্বতের ফিরিশতা আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন: “হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কথা এটাই, আপনি যদি চান যে, এদেরকে আমি দু পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি তাহলে তাই হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “না, বরং আমার আশা, মহান আল্লাহ এদের থেকে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে। অন্য কাউকেও তাঁর অংশীদার ভাববে না।”[২০৭]

খ্রীষ্টান দাসের হাত থেকে খাদ্য গ্রহণ: যে সমাজে মানুষে মানুষে শ্রেণী বৈষম্য, উঁচু-নীচু বিভেদ; সেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টিতে ধনী গরীব স্বাধীন দাস সবাই সমান। বর্ণবাদ বা অদৃশ্যের কুসংস্কার হতে তিনি ছিলেন মুক্ত। তাইতো সর্ব কালের শ্রেষ্ঠ মানব

---

[২০৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহ*, দারু তুওকীন নাজাত, ১৪২২হিজরী, কিতাবু বাদইল খালক, ১ম খণ্ড , পৃ. ৪৫৮ , হাদীস নং- ৩২৩১

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ، قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ، ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন খ্রীষ্টান দাসের হাত থেকে খাবার খেতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তায়েফবাসীদের নির্মম আতিথেয়তায় বিহ্বল, বিষণ্ন, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে করুণ অবস্থায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শহরের উপকণ্ঠে ওলীদ ও শাইবা বিন রবীয়ার আঙ্গুর বাগানে বিশ্রাম নিতে বসলেন তখন বাগানের মালিকদ্বয়ের মনে দয়ার উদ্রেক হল। তারা তাঁদের খ্রীষ্টান দাস আদ্দাসকে আঙ্গুর ভরা পাত্র নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে পাঠালো। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদ্দাস এর সাথে কথোপকথন করলেন এবং তার কাছ থেকে আঙ্গুর খেলেন। সীরাতে ইব্‌ন হিশামে এ ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

“ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এহেন শোচনীয় অবস্থা এবং এতক্ষণ যাবৎ তাঁর ওপর যে অত্যাচার চলছিল তা প্রত্যক্ষ করে উতবা ও শাইবা ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর সাথে তাদের বংশীয় বন্ধনের কথা মনে করে বিচলিত হয়ে উঠলো। আদ্দাস নামক তাদের এক খ্রীষ্টান ভৃত্যকে ডেকে তার হাতে একটা পাত্র দিয়ে বললো, এতে করে কিছু আঙ্গুর নিয়ে ঐ লোকটিকে গিয়ে দাও এবং খেতে বল। আদ্দাস নির্দেশ পালন করলো। সে আঙ্গুর ভর্তি পাত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে নিয়ে রাখলো এবং তাঁকে বললো, খান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলেন।”[২০৮]

মুশরিকদের সাথে সৌজন্যমূলক সম্পর্ক: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্ব পর্যন্ত নিজ মাতৃভূমির অধিবাসীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। ইসলাম প্রচার এর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই কাফির মুশরিকরা তাঁকে শত্রু জ্ঞান করে তাঁর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন চালাতো। আর তাতে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতেন তাঁর চাচা আবু তালিব। তিনি ইসলাম গ্রহণ না করলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শত্রুর হাত থেকে আগলে রাখতেন। তার মৃত্যুর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন। এরপর তায়েফেও যখন কাফির মুশরিকদের দ্বারা অত্যাচারিত নির্যাতিত হয়ে মক্কায় ফিরবেন বলে মনস্থ করলেন তখন মক্কার বৈরী পরিবেশের উল্লেখ করে যায়িদ বিন হারিসাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁকে বললেন ,

“মক্কাবাসীগণ যে অবস্থায় আপনাকে মক্কা থেকে বিতারিত করেছে, সে অবস্থায় কীভাবে আপনি মক্কায় ফিরে যাবেন?”[২০৯]

---

[২০৮] আব্দুল মালেক ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ.৪৫১

: فَلَمَّا رَآهُ ابْنَا رَبِيعَةَ، عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ، وَمَا لَقِيَ، تَحَرَّكَتْ لَهُ رَحِمُهُمَا ، فَدَعَوْا غُلَامًا لَهُمَا نَصْرَانِيًّا، يُقَالُ لَهُ عَدَّاسٌ، فَقَالَا لَهُ: خُذْ قِطْفًا (مِنْ هَذَا) الْعِنَبِ، فَضَعْهُ فِي هَذَا الطَّبَقِ، ثُمَّ اذْهَبْ بِهِ إلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَقُلْ لَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ.فَفَعَلَ عَدَّاسٌ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُلْ، فَلَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ يَدَهُ، قَالَ:بِاسْمِ اللَّهِ، ثُمَّ أَكَل"

[২০৯] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী ,*আর রাহীকুল মাখতুম,* ১ম খণ্ড , দারুল ‘উসামা , দামেশক , ১৪৬৭ হি. , পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

এরূপ নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহর উপর ভরসা করলেন এবং পিতৃব্যের অনুপস্থিতিতে আশ্রয়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে মক্কায় প্রবেশ করাকে সমীচীন মনে করলেন না। তিনি মক্কার নিকট এসে লোক মারফত যথাক্রমে আখনাস বিন শুরাইক, সুহাইল বিন আমর এবং মুত‘ইম বিন ‘আদী এর নিকট তাঁকে আশ্রয় প্রদানের অনুরোধ করলেন। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মুত‘ইম একজন উদারচেতা ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশ্রয় দিয়ে মক্কায় তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নিজ সন্তানাদি ও সম্প্রদায়ের লোকদের সশস্ত্র পাহাড়া দিয়ে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় প্রবেশ করান এবং মসজিদে হারামে প্রবেশ করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দেন,

يا معشر قريش، إني قد أجريت محمدا فلا يهجه أحد منكم

“হে কুরাইশগণ, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আশ্রয় প্রদান করেছি, কেউ যেন তাঁকে আর অনর্থক বিরক্ত না করে।”[২১০] মুতইম বিন আদীর এ ঘোষণার পর থেকে আবু জাহল সহ অন্যান্য মুশরিকরাও সর্তক হয়ে যায় এবং তার নিরাপত্তার গণ্ডি পেরিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রাও হ্রাস পায়। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুত‘ইম বিন আদীর এর উপকার ও সহৃদয়তার কথা কখনো ভুলেননি। যদিও মুত‘ইম মুসলমান হননি। কাফির অবস্থায়ই বদর যুদ্ধের পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন। তথাপি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবি হাসসান বিন সাবিত মুত‘ইমের মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকগাঁথা লিখেছিলেন।[২১১]

এমনকি বদর যুদ্ধের পর মক্কার যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির জন্য জুবায়ের বিন মুত‘ইম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি বলেন,

“যদি মুত‘ইম বিন আদী জীবিত থাকতেন এবং এ দুর্গন্ধময় মানুষগুলোর জন্য সুপারিশ করতেন, তাহলে তাঁর খাতিরে ওদেরকে ছেড়ে দিতাম।”[২১২] মুসলমানদের অনুসরণীয় আর্দশ মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই অমুসলিমদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, সৌজন্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟

২১০ প্রাগুক্ত

২১১ যরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবিল উলাদুননিয়া*, (মিসর : মাতবা‘আতুল আযহাহরিয়া, ১৩২৮ হি:) খ. ১ম, পৃ. ৫১৬

২১২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবু মা মিনান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আলা, খ. ৪র্থ, পৃ. ৯১
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاَءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ»

৩.১.৩ মাদানী জীবন

বিশ্বের শান্তি দূত, মুক্তির কাণ্ডারী মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদের অত্যাচার ও নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়ে আল্লাহর নির্দেশে নবুওয়তের তেরোতম বছরে ইয়াসরিব তথা বর্তমান মদীনাতে পাড়ি জমান। বাকিটা জীবন ইসলাম প্রচারের কাজে মদীনাতেই কাটিয়ে দেন। তাঁর এ জীবনকে মাদানী জীবন নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

মদীনায় বিভিন্ন জাতির সাথে সহাবস্থান:

মদীনা শহরে তাকে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতির সাথে মিলে মিশে বসবাস করতে হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে সম্প্রীতির যে নজীর রেখেছেন তা ইতিহাসে বিরল। মদীনাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন তিন প্রকার জাতির সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে হয়েছিল যারা ছিল পরস্পর ভিন্ন অবস্থার ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিশেষায়িত। এরা হচ্ছেঃ

১. মুসলিম জনগোষ্ঠী: আল্লাহর মনোনীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও আল্লাহর পথে ধন-প্রাণ উৎসর্গ করতে সদাপ্রস্তুত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর জামায়াত বা মুসলিম উম্মাহ।

এরা আবার দুই শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল। এক দল হল মক্কার মুহাজির। যারা ইসলামের জন্য পিতৃভূমি, সহায় সম্পত্তি সব ত্যাগ করে মদীনাতে নিঃস্ব ও রিক্ত অবস্থায় আশ্রয় নিয়েছে। অপর দল হল, মদীনার আনসার। যারা ইসলামকে সর্বাত্মক সহায়তা করতে বদ্ধ পরিকর। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার মুহাজিরগণকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

২. মদীনার আদিবাসী: মদীনার আদি ও মূল বাসিন্দাদের মধ্যে মুশরিক (পৌত্তলিক) গোষ্ঠী যারা তখনো ঈমান আনেনি। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুল এ জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩. ইয়াহুদী সম্প্রদায়: মদীনার বিভিন্ন উপকণ্ঠে বসবাসরত আহলে কিতাব ইয়াহুদী সম্প্রদায়। এই কুচক্রি মহলও ছিল বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ তিনটি গোত্র হলঃ-

ক. বনু কাইনুকা: এরা ছিল মদীনার খাযরাজ গোত্রের মিত্র এবং এদের আবাসস্থল মদীনার মধ্যেই ছিল।

খ. বনু নযীর এবং

গ. বনু কুরাইযাহ: এই গোত্র দুটি ছিল আউস গোত্রের মিত্র। এদের বাসস্থান ছিল মদীনার উপকণ্ঠে। প্রায় এক যুগ যাবৎ এই গোত্র তিনটি আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল। বু'আসের যুদ্ধে আপন আপন মিত্র গোত্রের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে তারা সব সময় প্রতিহিংসা পরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন ছিল ।

এ সমস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে সহাবস্থান করার সময় নেতা হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

তিনি সেসব সমস্যার সুদূর প্রসারী ও পরিকল্পিত সমাধান করেছিলেন খুবই দক্ষতার সঙ্গে। দয়া পাবার যোগ্য সম্প্রদায়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং কঠোরতা পাবার যোগ্য সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি এ সকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তবে কঠোরতার চেয়ে দয়াই তাঁর বেশি কাম্য ও প্রিয় ছিল। যার ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামের বিজয় পতাকা বিশ্বময় উড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন: মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিলেন, যার ফলে গোত্র, বংশীয় আভিজাত্য ও রক্ত সম্পর্ককে ম্লান করে 'আল্লাহর জন্য' মানবপ্রেম তার জায়গা করে নিল প্রথম স্থানে। মক্কা থেকে হিজরত করে একে একে সাহাবীগণ নিজেদের সহায় সম্পত্তি রেখে রিক্ত-নিঃস্ব অবস্থায় যখন মদীনায় এসে আশ্রয় নিলেন, তখন মদীনায় তাদের পূনর্বাসন করার প্রয়োজন দেখা দিল। মদীনাবাসী মুসলমানগণ মক্কার মুহাজির ভাইদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তারা তাদের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। এমতাবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একটি অপূর্ব ভ্রাতৃত্বের সর্ম্পক গড়ে তোলেন। যার ফলে মক্কার মুহাজিরগণকে পূনর্বাসন করতে কোন বল প্রয়োগ নয়, কোন মদীনাবাসীকে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ নয় বরং এমন একটি সুন্দর ও সহজ সমাধান হয়ে গেল যে , স্বেচ্ছায় প্রত্যেক আনসার সাহাবী নিজের সহায় সম্পদ অর্ধেক করে তাদের দিয়ে দিচ্ছিলেন , এমনকি কেউ কেউতো নিজের একাধিক স্ত্রীর মধ্য থেকে একজনকে তালাক দিয়ে তার মুহাজির ভাইয়ের সাথে বিয়ে পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 'আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) এবং সা'আদ বিন রাবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। এরপর হযরত সা'আদ (রা.) আব্দুর রহমান(রা.) কে বললেন, "আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করে অর্ধেক গ্রহণ করুন। তাছাড়া, আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে। দুজনের মধ্যে যাকে

আপনার পছন্দ হয়- আমাকে বলুন। আমি তাকে তালাক দিব। ইদ্দত পালনের পর তাকে বিবাহ করবেন।”

হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, “আল্লাহ আপনার ধন-জন ও মালামালে বরকত দিন। আপনাদের বাজার কোথায়?” তাঁকে বনু কাইনুকার বাজার দেখিয়ে দেওয়া হল। তিনি যখন বাজার থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর নিকট অতিরিক্ত কিছু পণির ও ঘি ছিল। এরপর তিনি প্রত্যহ বাজারে যেতে থাকলেন। অতপর একদিন যখন তিনি বাজার থেকে ফিরে এলেন, তখন তাঁর শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “এটা কী?” তিনি বললেন, “আমি বিবাহ করেছি।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “স্ত্রীকে মোহর দিয়েছ তো?” তিনি বললেন, “একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ (অর্থাৎ সোয়া ভরি) দিয়েছি।”[২১৩]

আনসার ও মুজাহিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে সীরাত রচয়িতা ইব্‌ন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্‌ন হিশাম তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন “ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। তিনি যা বলেননি, তা তার ওপর আরোপ করা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি দুইজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এরপর তিনি আলী ইব্‌ন আবু তালিবের হাত ধরে বললেন, এ হলো আমার ভাই। এভাবে নবীদের সর্দার, মুত্তাকীদের নেতা, বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের রাসূল, বিশ্বজাহানে যার কোন জুড়ি নেই তিনি আর আবু তালিব তনয় আলী রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু নতুন করে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলেন” ।[২১৪]

মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে এরূপ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিচয় বহন করেন। এ ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে “রাহীকুল মাখতুম” গ্রন্থকার মুহাম্মদ গাযালী থেকে উদ্ধৃত করেছেন এভাবে,“এ ছিল মুর্খতার যুগের বংশীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী। আত্নীয়তা বা অনাত্নীয়তার সম্পর্ক যা কিছু হবে তা হবে ইসলামের জন্য। এরপর থেকে মানুষে মানুষে বংশ,

---

[২১৩] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, বাবু আখাউন নাবীইয়ি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইনাল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১

أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلّى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي، أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب

[২১৪] আব্দুল মালেক ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ৫০৪-৫০৫

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَآخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ– فِيمَا بَلَغَنَا، وَنَعُوذُ باللَّه أَنْ نَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُقَلْ–: تَآخَوْا فِي اللَّهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: هَذَا أَخِي .كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ، وَرَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي لَيْسَ لَهُ خَطِيرٌ وَلَا نَظِيرٌ مِنْ الْعِبَادِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخَوَيْنِ،

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণ ও দেশের বিভেদ মুছে যাবে। উচুঁ, নীচু ও মানবতার পরিমাপ হবে কেবলমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শুধুমাত্র ফাঁকা বুলির পোশাক পরিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং এ ছিল এমন এক কার্যকর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি যা রক্ত ও ধনসম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এটা শুধু ফাঁকা বুলি এবং গতানুগতিক সালাম ও মুবারকবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এই ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ছিল সমবেদনা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।”[২১৫]

মদীনা সনদ ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সূচনাপত্রঃ মদীনায় এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ধর্মীয় ও জাতিগত ভাবে বিভক্ত এক জনসমষ্টিকে নিজের সংস্পর্শে আনলেন, তখন তিনি তাদেরকে একতা, সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। এ লক্ষ্যে তিনি লিখিত ঘোষণা প্রণয়ন করলেন। ঐতিহাসিকগণ যাকে “মদীনা সনদ” বলে আখ্যায়িত করেন। পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান বলে আখ্যায়িত করেন। বিখ্যাত সীরাত রচয়িতা ইব্ন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে এই ঘোষণাপত্রটি হুবহু বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, “অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একটি ঘোষণাপত্র সম্পাদন করেন। এই দলীলের মাধ্যমে তিনি ইহুদীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতি প্রদান ও গ্রহণ করেন, তাদের ধর্মপালনের স্বাধীনতা ও ধন-সম্পদে তাদের মালিকানার স্বীকৃতি দেন এবং তাদের সাথে কিছু শর্ত প্রদান ও গ্রহণ করেন।”[২১৬]

এই ঘোষণাপত্রটি দুটি অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে ইসলামের ব্যাপারে পরস্পর সাহায্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেন এবং দ্বিতীয় অংশে মদীনার মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ও স্বত্বাধিকার নির্ণয় করে তাদেরকে এক জাতিভূক্ত বলে ঘোষণা দেন। এই ঘোষণাপত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরীর যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তা হল,

প্রথমত, মুসলমানদেরকে অমুসলমানদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার যেসব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল ঘোষণাপত্রের প্রথম

---

[২১৫] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ১২৬

كما قال محمد الغزالي– أن تذوب عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه. وقد جعل الرسول صلّى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا، لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر.وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة، وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال

[২১৬] আব্দুল মালেক ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ৫০১

وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَادَعَ فِيهِ يَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَشَرَطَ لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ

Dhaka University Institutional Repository

অংশে তারা ইসলামের উপর বহাল থাকবে এবং পরস্পরকে সাহায্য করবে এই মর্মে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। পাশাপাশি তাদেরকে এটাও জানিয়ে দেন যে, মদীনা রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিমরাও তাদের সমান নিরাপত্তা ও আশ্রয় পাবে। এমনকি কোন অসহায় অমুসলিম মুসলমানদের কাছে আশ্রয় ও সাহায্য চাইলে তাকে নিরাপত্তা ও সহায়তা করা তাদের কর্তব্য। ঘোষণাপত্রের ভাষ্যমতে,

"মুসলিম রাষ্ট্রে অনুগত অমুসলিমের অধিকার সমানভাবে নিরাপদ। একজন নগণ্যতম অমুসলিমকেও মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তাসহ আশ্রয় দেবে। মুমিনরা পরস্পরের মিত্র হয়ে থাকবে, তবে অন্যদের বেলায় একথা প্রযোজ্য নয়। আর ইহুদীদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি আমাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে সে আমাদের সমান অধিকার ও সাহায্য লাভ করবে। এ ধরনের লোকদের উপর কোন যুলম চলতে দেয়া হবে না এবং তাদের উপর কাউকে হামলা চালাতে সাহায্য করা হবে না। মুমিনদের রক্ষাকবচ সবার ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন। ইসলামের স্বার্থে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলে সেই যুদ্ধে মুসলমান কোন অমুসলমানের সাথে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তি ছাড়া আপোষ রফা করবে না।" [২১৭]

দ্বিতীয়ত, ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি; মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ একটি সমাজ গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি মদীনা সনদের মাধ্যমে প্রথমে মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন। তারপর তিনি মদীনার অমুসলিম জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মদীনা ও তদসংলগ্ন স্থানে বসবাসকারী ইহুদী জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমঝোতা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। এ জন্য সনদের দ্বিতীয় অংশে জানমালের সাধারণ নিরাপত্তা ও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো:

১। সবাই একজাতি: মদীনার সমস্ত মুমিন, সকল ইহুদী গোত্র ও তাদের মিত্ররা একই উম্মত বলে গণ্য হবে।[২১৮] একই জাতির অর্ন্তভূক্ত লোকদের মধ্যে যেমন হৃদ্যতা ও সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকে

---

[২১৭] আব্দুল মালেক ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০২

وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ، وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ، غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ، لَا يُسَالَمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ،

[২১৮] প্রাগুক্ত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَلَحِقَ بِهِمْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ، إنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ،--- وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ،--- وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ،

তদ্রূপ মদীনাবাসীরাও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মিলেমিশে বসবাস করবে। তারা সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে।

এ ঘোষণার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে সকল জাতির জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন।

২। ধর্মীয় স্বাধীনতা: একই উম্মাহের অর্ন্তভূক্ত হলেও ইহুদী এবং মুসলমান তাদের স্ব-স্ব ধর্ম পালন করবে।[২১৯]এ ঘোষণাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্রে ধর্মীয় উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ইহুদীদের ধর্ম পালনে কোন হস্তক্ষেপ করেননি। বাঁধা দেয়া তো দূরের কথা বরং তারা যেন তাদের ধর্ম স্বাধীন ভাবে পালন করতে পারে এজন্য চুক্তি সম্পাদন করেন।

৩। গোপনীয়তা রক্ষার স্বাধীনতা: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চুক্তির মাধ্যমে ইহুদীদের অভ্যন্তরীণ ও গোপন ব্যাপারগুলোরও নিরাপত্তা দেন। তিনি বলেন, "ইহুদীদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তাদের প্রাণের মতোই সম্মানার্হ।"[২২০] অর্থাৎ ইহুদীদের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া যেমন মুসলমানদের কর্তব্য তেমনি তাদের মান সম্মানের নিরাপত্তা দেয়াও কর্তব্য। এজন্যে মুসলমানরা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেনা।

৪। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: এ ঘোষণাপত্রে মুসলমান ও ইহুদীদেরকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও দেয়া হয়। বলা হয় "ইহুদীদের ব্যয়ভার তারা নিজেরাই বহন করবে এবং মুসলমানদের ব্যয়ভারও তারা নিজেরা বহন করবে"।[২২১]

৫। সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক: এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাতে মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে অভাবনীয় সম্পর্ক স্থাপন করেন, এই চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ লোকেরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সদিচ্ছা ও পারস্পরিক কল্যাণের ভিত্তিতে কাজ করবে; কোন অন্যায়, অনাচার কিংবা পাপাচারের ভিত্তিতে নয়। এমনকি এক পক্ষের অন্যায় অনাচারের জন্য অন্য পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করবেনা এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি সে ইহুদী হোক বা মুসলমান হোক তাকে সবাই সাহায্য করবে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। এই

---

[২১৯] প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড , পৃ. ৫০৩

لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ،

[২২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩

وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ،

[২২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩-৫০৪

وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ، وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্রে বর্ণিত হয়েছে এভাবে, "এই ঘোষণাপত্রকে যারা মেনে নিয়েছে তাদের কর্তব্য, কোন শরীক যুদ্ধরত থাকলে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা এবং পরস্পরের মধ্যে হিতকামনা, সদুপদেশ ও মহানুভবতার সম্পর্ক থাকবে, কোন পাপ কাজে একজন আর একজনের সাথে শরীক হবে না। নিজের মিত্রের ক্ষতি সাধন এক ভয়ংকর নজীরবিহীন অপরাধ। অত্যাচারিতকে সাহায্য করা সকলের কর্তব্য।"[২২২]

৬। নিরাপত্তা প্রদান : মদীনা সনদের পরতে পরতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরধর্মমত সহিষ্ণু মনোভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। এ ঘোষণাপত্রের শেষাংশে তিনি মদীনা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসরত সকল নাগরিকের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা প্রদান করেন। এমনকি মদীনাবাসীর ব্যক্তিগত জীবন-যাপনেও অন্যদের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ নিষেধ করেন। এছাড়া যে ব্যক্তি যুলম বা অপরাধে লিপ্ত না হয়ে নিষ্ক্রিয় ভাবে মদীনার সীমানার ভেতরে থাকবে সেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আশ্রয়ে থাকবে বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "এই ঘোষণাপত্রের শরীকদের জন্য ইয়াসরিবের অভ্যন্তরভাগ সম্পূর্ণ নিরাপদ। যুলম কিংবা অপরাধে লিপ্ত না হলে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিংবা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকও মদীনার চৌহদ্দির ভিতরে নিরাপত্তা লাভ করবে। যে ব্যক্তি সততা ও খোদাভীতির পথে অবিচল থাকবে, আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আশ্রয়দাতা ও সহায়ক থাকবেন।"[২২৩]

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শতধা বিভক্ত ইয়াসরিবের সমাজকে সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এর ফলে মদীনা ও আশপাশের অঞ্চলসমূহ এক শান্তি ও স্বস্তিময় স্থানে রূপান্তরিত হয়।

আব্দুল্লাহ বিন উবাইর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ: মক্কার কাফির মুশরিকদের দ্বারা ইসলাম প্রচারে চরম বাঁধা বিপত্তির মুখোমুখি হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করে চলে আসলেন। মদীনায় এসে তিনি অনুকূল পরিবেশ পেয়ে ইসলাম নামক চারা গাছটির পরিচর্যা করতে শুরু করলেন। এটি ধীরে ধীরে ডাল-পালা ছড়িয়ে মহীরুহে পরিণত হবার দিকে ধাবিত হতে লাগল। এ অবস্থা মক্কাবাসী কাফির মুশরিকদের

---

[২২২] প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড , পৃ. ৫০৪

وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ، وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثَمْ امْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ، وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ،

[২২৩] প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড , পৃ. ৫০৪

وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ،--- وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثِمَ، وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dhaka University Institutional Repository

গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাই তারা তাদের ক্রোধের আগুন নির্বাপিত করতে বেছে নিল মদীনার প্রভাবশালী নেতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন না করলে যে হত মদীনার বাদশাহ। মদীনার সর্বময় কর্তা হতে না পেরে হতাশ ও ক্ষুব্ধ 'আবদুল্লাহ বিন উবাই যখন মনে মনে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার পায়তারা করছিল এমনি সময় মক্কার নেতৃবৃন্দ তাদেরকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে হুমকি সহকারে তার কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করে। আর এ চিঠি পেয়ে সে তার মনস্কামনা চরিতার্থ করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তার মুশরিক সাথীদেরকে একত্রিত করে ফেলে। এই সংঘাতময় মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে যান এবং বলেন,"আমি দেখছি যে, কুরাইশদের হুমকি তোমাদের হৃদয়ে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে। কিন্তু এটা তোমাদের বোঝা উচিত যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে যে পরিমাণ ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছ, কুরাইশরা কোনক্রমেই তোমাদের সে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা কি তোমাদের ছেলে ও ভাইদের সঙ্গে নিজেরাই যুদ্ধ করতে চাও? নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথা শুনে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।"[২২৪] এভাবে তাঁর সময়োচিত কার্যকরী পদক্ষেপ দ্বারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরির সুযোগকে নস্যাৎ করে দেন।

বদর যুদ্ধের পটভূমিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রক্ষণশীল মনোভাবঃ যুদ্ধ মানেই নৃশংসতা, হত্যা, রক্তপাত ও ক্ষয়ক্ষতি। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সম্প্রীতির প্রতীক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান ও মালের হেফাজতের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে কাফিরদের সাথে আক্রমণাত্মক পদ্ধতির বিপরীতে রক্ষণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে দেখা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ সার্বক্ষণিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন এবং কাফিরদের আক্রমণের আশংকায় আতংকিত থাকতেন। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের পাহারায় রাতে ঘুমাতেন অথবা জাগ্রত অবস্থায় রাত্রিযাপন করতেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে,"হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "মদীনায় আগমনের পর একদা রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় রাত কাঠাচ্ছেন এবং আশা করছিলেন যে, আজ রাতে যদি তাঁর সাহাবীদের কেউ এসে পাহারা দিতেন (তাহলে কতই না ভাল হত)। আমরা ঐ অবস্থাতেই ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ অস্ত্রের ঝনঝনানি আমাদের কানে এল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস

---

[২২৪] ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আমর আল আযদী, *সুনান* ,(বৈরুত : আল মাকতাবাতু আসরিয়্যাহ, তা.বি.), বাবু খাবারিন নাযীর, খ. ৩য়, পৃ. ১৫৬

فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُمْ، فَقَالَ: «لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ، مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ، تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ، وَإِخْوَانَكُمْ» فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا،

Dhaka University Institutional Repository

করলেন, 'কে'? উত্তরে শোনা গেল, আমি সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "এ গভীর রাতে তোমার এখানে আগমনের কারণ কী"? জবাবে তিনি বললেন, "আপনার সম্পর্কে আমার মনে বিপদের আশংকা উদ্রেক হওয়ায় আপনাকে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি।" তার একথা শুনে তিনি তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।"[২২৫]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাহারা দেয়ার ব্যাপারটি শুধু কয়েকটি রাতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। বরং এটা ছিল পর্যায়ক্রমিক এবং স্থায়ী ব্যবস্থা। হযরত 'আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাহারা দেয়া হত। অতপর নিচের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

"আল্লাহ আপনাকে মানুষের আক্রমণ থেকে নিরাপদে রাখবেন।"

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুব্বা (ঘর বিশেষ) থেকে মাথা বের করে বললেন: "হে জনমণ্ডলী! তোমরা ফিরে যাও। মহামহিমান্বিত প্রভু পরওয়ারদিগার আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।"[২২৬]

আর সাহাবায়ে কেরাম ও শত্রুদের তাৎক্ষণিক আক্রমণ প্রতিহত করতে রাতের বেলা পালাক্রমে ঘুমাতেন ও সকাল বেলা জাগতেন। 'রাহীকুল মাখতুম' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে," আরব মুশরিকদের শত্রুতাজনিত এ বিপদ শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তা মুসলিম সমাজের সকল সদস্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় আসেন আর আনসারগণ তাদের আশ্রয় দান করেন, তখন আরব মুশরিকগণ তাঁদেরকে একই আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করতে উদ্যত ছিল। এজন্য সাহাবায়ে কিরাম রাতের বেলা পালাক্রমে ঘুমাতেন ও সকাল বেলা জাগতেন।"[২২৭]

---

[২২৫] ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী আন নিশাপুরী, *সহীহ*, (বৈরুত : দারু ইহয়াউত তারাছিল 'আরাবী, ১৪২২ হি.), বাবু ফাযলি সাদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.), খ. ৪র্থ, পৃ. ১৮৭৫

أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَهِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ، لَيْلَةً، فَقَالَ: «لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ» قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَامَ

[২২৬] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত তিরমিযী, জামীউল কাবীর, (বৈরুত : দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রী.), বাব ওয়া মিন সুরাতিল মায়িদা, খ. ৫ম, পৃ. ১০১

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ القُبَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ.

[২২৭] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী , প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১৩৬

ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلّى الله عليه وسلم، بل على المسلمين كافة، فقد روى أبي بن كعب، قال: لما قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه.

এরূপ ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক অবস্থায় মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে অত্যাচারিত মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি বলেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

অর্থাৎ যে লোকদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাঁরা অত্যাচারিত এবং তাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে নিশ্চয়ই আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান।[২২৮]

কিন্তু মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই যুদ্ধের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েননি। বরং অমুসলিমদের সাথে সর্বোচ্চ সহনশীল ও সংযমী আচরণ করেছেন। সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন । অহেতুক রক্তপাত ঠেকাতে তিনি মদীনার পাশে মক্কা থেকে সিরিয়া অভিমুখী বাণিজ্য পথের নিকটবর্তী অমুসলিম গোত্রগুলোর সাথে বন্ধুত্ব, মিত্রতা এবং পরস্পর পরষ্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এছাড়া তিনি এ পথে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে এবং অমুসলিমদের কাছে মুসলমানদের শৌর্য বির্যের পরিচয় দিতে বিশেষ নজরদারি বাহিনী প্রেরণ করেন। অসাম্প্রদায়িকতার রূপকার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বিশেষ বিশেষ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাতে রক্তপাতের কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। ব্যতিক্রম ঘটে শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ বিন জাহশের (রা.) নেতৃত্বে একটি বাহিনীতে। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি ছাড়াই হারাম মাসে কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে একজনকে হত্যা ও দুজনকে বন্দী করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন পবিত্র কুর'আনের মাধ্যমে তাদের এ কাজের সমর্থন দিয়ে বললেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"হারাম মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন! তাতে যুদ্ধ করা খুবই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাঁধা এবং এর বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়ে অধিক অন্যায়। হত্যা অপেক্ষা ফিতনা অধিক বেশী গুরুতর।"[২২৯]

তখন তিনি বন্দী দুজনকে মুক্ত করে দেন এবং নিহত ব্যক্তিটির অভিভাবককে রক্তপণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

ইহসানের পরিবর্তে ইহসান: মক্কায় মুশরিকদের মধ্য হতে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করা হতে বিরত থেকেছিল। তাদের সেই

---

[২২৮] আল কুর'আন, সূরা হজ্জ : ৪১

[২২৯] আল কুর'আন, সূরা বাক্বারা : ২১৭

ইহসানের পরিবর্তে তিনি বদর প্রান্তরে তাদের সাথে মুসলমানদেরকে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেন। ইব্ন ইসহাক (রহ) ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে বলেন "আমি জানতে পেরেছি যে, বনু হাশিমের কিছু সংখ্যক লোককে জোর জবরদস্তি করে যুদ্ধে নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন তারা অনুভব করে না। কাজেই বনু হাশিমের কেউ তোমাদের সামনে পড়লে তাকে হত্যা করো না। আবুল বুখতারী ইব্ন হিশাম কারো সামনে পড়লে তাকে হত্যা করো না। আর আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব কারো সামনে পড়লে তাকে হত্যা করো না। কেননা তাকেও জবরদস্তিমূলকভাবে টেনে আনা হয়েছে।"[২৩০]

তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করলেও আবু তালিবের মৃত্যুর পর আব্বাস (রা.) তার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। শত্রুর হাত থেকে তাঁকে রক্ষার জন্য তাঁর পাশে পাশে থেকেছেন। তাই তিনি তাকে হত্যা করতে বারণ করেছিলেন। বুখতারীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছিলেন এজন্যে যে, এ ব্যক্তি মক্কায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া হতে সবচেয়ে বেশী বিরত থেকেছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন রকম কষ্ট দিতো না এবং তার পক্ষ হতে তিনি কখনো কোন অপছন্দনীয় কথা শোনেননি, আর এ ব্যক্তি তাদের মধ্যে একজন ছিল যারা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের বয়কটপত্রটি ছিঁড়ে ফেলেছিল।

এভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শত্রুবাহিনীর লোকদের সাথে তাদের পূর্ববর্তী সদ্ব্যবহারের প্রতিদানে সদ্ব্যবহার করেছেন। এমনকি সাহাবীগণও এ যুদ্ধে তাদের সাধ্যানুযায়ী ইহসান করার চেষ্টা করেছেন। নিজেদের জীবনের তোয়াক্কা না করে বন্দীদের জানের হিফাজত করার চেষ্টা করেছেন। এমনি একটি ঘটনা সহীহ বুখারীর কিতাবুল আকালাহ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, প্রাক ইসলামী যুগে মক্কায় আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা.) ও উমাইয়া ইব্ন খালফের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। বদরের যুদ্ধের ভয়াবহতায় উমাইয়া নিজের জীবন ঝুঁকিপুর্ণ দেখে আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফকে তাকে ও তার ছেলে আলীকে বন্দী করার অনুরোধ করে। তিনি তাদেরকে বন্দী করে সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বিলাল (রা.) যিনি মক্কায় উমাইয়া ইব্ন খালফের দ্বারা অমানুষিক নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি তাদেরকে দেখে অত্যন্ত উচ্চস্বরে বললেন, "হে আল্লাহর আনসারগণ! এ হচ্ছে কুফরের নেতা উমাইয়া ইব্ন খালফ। এখন হয় আমি থাকবো অথবা সে থাকবে।" আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন," ইতোমধ্যে জনগণ

[২৩০] আব্দুল মালেক ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড , পৃ. ৬২৯

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَئِذٍ: إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ قَدْ أَخْرَجُوا كُرْهًا، لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِقِتَالِنَا، فَمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَقِيَ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَسَدٍ فَلَا يَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَقِيَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أُخْرِجَ مُسْتَكْرَهًا

আমাদেরকে চুড়ির মত বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে নিলো। আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু এক ব্যক্তি তার ছেলের পায়ে তরবারীর আঘাত হেনে দিলো। আর সাথে সাথে সে পড়ে গেল। ওদিকে উমাইয়া এতো জোরে চিৎকার করলো যে, এরূপ চিৎকার আমি কখনোই শুনিনি । আমি বললাম, "পালিয়ে যাও। কিন্তু আজ পালাবার কোন উপায় নেই। আল্লাহর কসম আজ আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারবো না"। আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা.) উমাইয়া ইব্ন খাল্ফকে বলেন, তুমি হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়। সে বসে গেল এবং আব্দুর রহমান (রা.) তার উপর চড়ে বসলেন। কিন্তু লোকেরা নিচ দিয়ে তরবারী মেরে উমাইয়াকে হত্যা করলো।"[২৩১] তাকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি ও আহত হলেন ।

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ: বদর যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফেরার একদিন পর যুদ্ধবন্দীদেরকে নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম এসে পৌঁছান। তিনি তাঁদের মধ্যে বন্দীদেরকে বণ্টন করে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শুধু বণ্টন করে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব পালন শেষ করেননি। বরং বন্দীদের যেন কোন কষ্ট না হয়, তাদেরকে যেন অত্যাচার নির্যাতন না করা হয় এজন্যে এ মহান নেতা তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে এমন এক নির্দেশ প্রদান করেন যা বর্তমান দুনিয়ার মানুষের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। ইব্ন হিশাম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,"যুদ্ধবন্দীদের প্রতি তোমরা সহানুভূতির মনোভাব রাখবে।"[২৩২]

তার এর নির্দেশ মান্য করতে সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা সচেষ্ট ও সচেতন থাকতেন। এমনকি তারা নিজেরা খেজুর খেতেন এবং বন্দীদেরকে রুটি খাওয়াতেন। কেননা মদীনায় খেজুর ছিল সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল বিশেষ মূল্যবান খাদ্য।[২৩৩]

---

[২৩১] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাব ইযা অকালাল মুসলিম হারিইবান ফি দারিল হারব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا، بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةَ، وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ» قَالَ: لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ، كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ: عَبْدَ عَمْرٍو، فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ، خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لِأُحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ، فَأَبْصَرَهُ بِلاَلٌ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ: لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ، فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا، خَلَّفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ لِأَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبَوْا حَتَّى يَتْبَعُونَا، وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا، فَلَمَّا أَدْرَكُونَا، قُلْتُ لَهُ: «ابْرُكْ» فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوهُ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ

[২৩২] আব্দুল মালেক ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ৬৪৫

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَقْبَلَ بِالْأُسَارَى فَرَّقَهُمْ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ: اسْتَوْصُوا بِالْأُسَارَى خَيْرًا

[২৩৩] প্রাগুক্ত

فَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ خَصُّونِي بِالْخُبْزِ، وَأَكَلُوا التَّمْرَ، لِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بِنَا، مَا تَقَعُ فِي يَدِ رَجُلٍ مِنْهُمْ كِسْرَةُ خُبْزٍ إِلَّا نَفَحَنِي بِهَا. قَالَ: فَأَسْتَحْيِي فَأَرُدُّهَا عَلَى أَحَدِهِمْ ، فَيَرُدُّهَا عَلَيَّ مَا يَمَسُّهَا.

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে উদারতা: মদীনায় ফিরে এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সাথে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে করণীয় প্রসঙ্গে পরার্মশ করেন। পরার্মশ সভায় আবু বকর (রা.) বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, এতে মুসলমানরা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হবে এবং আল্লাহ তা'আলা হয়তো এদের কাউকে ইসলামের জন্য কবুল করবেন। উমর বিন খাত্তাব (রা.) ভিন্নমত পোষণ করেন, তিনি মনে করেন, এরা ইসলামের চির শত্রু এবং মুসলমানদের ঘোর বিরোধী। এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং ইসলামকে চিরতরে মুছে ফেলতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। তিনি বলেন, এরা অন্যায়, অধর্ম ও অত্যাচারের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। এদেরকে অবিলম্বে হত্যা করে ফেলা হোক। প্রত্যেক মুসলমান খোলা তরবারী হাতে দণ্ডায়মান হোক এবং নিজ হাতে নিজের আত্মীয়বর্গের মাথা কেটে ফেলুক, আমার এটাই মত।" রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার পরামর্শ শুনলেন, তিনি বন্দীদের ব্যাপারে কঠোরতার চেয়ে উদারতাকে অধিক পছন্দ করলেন। তিনি আবু বকর (রা.)-এর অভিমত অনুযায়ী মুশরিকদেরকে হত্যা না করে মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুক্তিপণের পরিমাণ চার হাজার পর্যন্ত ছিল। দয়ার সাগর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা মুক্তিপণ দিতে অসমর্থ হবে তাদের জন্য এমন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা কোন শত্রুর পক্ষে কল্পনা করাও দুষ্কর। তিনি বলেন, যে মুক্তিপণ দিতে অসমর্থ হবে সে মদীনার দশজন ছেলেকে পড়া-লেখা শেখাবে। যখন তারা ভালভাবে তা শিখে নেবে তখন এটাই তার মুক্তিপণ হিসেবে বিবেচ্য হবে।[২৩৪]

বিত্তহীন যুদ্ধবন্দীদের অনুকম্পা প্রদর্শন: মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব বন্দীদের মুক্তিপণ দেয়ার সামর্থ ছিল না তাদের উপর অনুগ্রহ করেন। তিনি তাদেরকে বিনা মুক্তিপণেই মুক্তি দিয়ে দিলেন। এরা হলেন আবুল আস ইব্ন রাবী, মুত্তালিব ইব্ন হানতাব, সাইফী ইব্ন আবু রিফায়া, এবং আবু 'আয্যা আমর ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন উসমান। এদের মধ্যে আবু 'আযযা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র এবং বহু কন্যাদায় গ্রস্থ; সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীয় আর্থিক সঙ্গতির উল্লেখ করে তাকে অনুকম্পা প্রদর্শন করতে অনুরোধ করে। ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুক্তিপণ মাফ করে দিলেন এবং অঙ্গীকার নিলেন যে, সে আর কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেনা।[২৩৫] এভাবে মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শত্রুপক্ষের বন্দীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেছিলেন।

---

[২৩৪] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ১৬৬

[২৩৫] আবু বকর আহমদ ইব্ন হুসাইন আলবায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী*, (লেবানন: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রী.), বাব মা জাআ ফি মিনাল ইমামি 'আলা মান রয়া মিন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২০

বন্দীদের অঙ্গহানি না করা: নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধবন্দীদের সাথে সর্বোচ্চ ভাল ব্যবহার করেছেন। তাদেরকে দাস না বানিয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছেন। বিত্তহীনদের অনুগ্রহ করেছেন। কোন বন্দীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেননি, তাদের প্রতি অত্যাচার নিপীড়ন চালাননি। এমন কি বন্দীদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ও হেফাজত করেছেন। তার সাহাবীগণও যেন তাদের প্রতি কোন নির্যাতন না করেন সে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করেছেন। এমনি একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় বন্দী সুহাইল ইব্‌ন ‘আমর এর বেলায়। সে ছিল অত্যন্ত বাকপটু ও সুবক্তা। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে সবর্দা অগ্রগামী থাকতো। তাই উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাকে মুক্তি দেয়ার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন সুহাইলের সামনের দাঁত দুটো উপড়ে ফেলি যাতে কথা বলতে তার জিহ্বা বেরিয়ে আসে এবং আপনার বিরুদ্ধে আর কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে না পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ”আমি তার চেহারা বিকৃত করবো না। তাহলে নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ আমার চেহারা বিকৃত করে দেবেন।”[২৩৬]

বন্দীকে প্রহার করে তথ্যাদি গ্রহণ অপছন্দনীয়: দয়ার সাগর নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিম বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। অন্য মত, অন্য ধর্মের মানুষ হলেও তিনি বন্দীদের কোন কষ্ট দেয়া সহ্য করতেন না। এমনকি তাদেরকে মারধর করে আঘাত করে কোন তথ্যাদি গ্রহণ করাকেও তিনি অপছন্দ করেছেন। আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় এসেছে,

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে ডাকলেন। তখন তাঁরা বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ তারা কুরাইশদের জন্য পানি বহনকারী উটের সন্ধান লাভ করলেন, যার পিঠে বনূ হাজ্জাজ গোত্রের একজন কৃষ্ণকায় গোলাম বসা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ তাকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেন যে, “বল, আবূ সুফিয়ান কোথায়?” তখন সে বললঃ আল্লাহর শপথ! আমি তার ব্যাপারে কিছুই জানি না। কিন্তু এই হলো কুরায়শ বাহিনী, যাতে আবূ জাহ্‌ল, ‘উতবা, শায়বা ইব্‌ন রাবী‘আর দুই ছেলে এবং উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ উপস্থিত আছে।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَزَّةَ الْجُمَحِيُّ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي ذُو بَنَاتٍ وَحَاجَةٍ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ يَفْدِينِي، وَقَدْ عَرَفْتَ حَاجَتِي، فَحَقَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهُ وَأَعْتَقَهُ , وَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَعَاهَدَهُ أَنْ لَا يُعِينَ عَلَيْهِ بِيَدٍ وَلَا لِسَانٍ , وَامْتَدَحَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَفَا عَنْهُ. فَذَكَرَ الشِّعْرَ،

[২৩৬] আব্দুল মালেক ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ৬৪৯

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَنْزِعْ ثَنِيَّتَيْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَيَدْلَع لِسَانَهُ، فَلَا يَقُومُ عَلَيْكَ خَطِيبًا فِي مَوْطِنٍ أَبَدًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أُمَثِّلُ بِهِ فَيُمَثِّلُ اللَّهُ بِي وَإِنْ كُنْتُ نَبِيًّا

Dhaka University Institutional Repository

যখন সে তাঁদের নিকট এরূপ বললঃ তাঁরা তাকে মারপিট করল। তখন সে বললঃ আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি তোমাদেরকে (আসল) খবর দেব। এরপর যখন তাঁরা তাকে ছেড়ে দিল, তখন সে বললঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে কোন খবরই রাখি না; বরং এই হলো কুরাইশ বাহিনী, যাতে আবূ জাহল,'উতবা, শায়বা ইব্‌ন রাবী'আর দুই ছেলে এবং উমাইয়া ইব্‌ন খালফ উপস্থিত আছে। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ সব শুনছিলেন। এরপর সালাত আদায় শেষে বললেন, ঐ যাত-পাকের কসম, যার হাতে আমার জান! তোমরা তাকে তখন মার-ধর করছ, যখন সে তোমাদের নিকট সত্য কথা বলছে। আর যখন সে মিথ্যা কথা বলছে, তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দিচ্ছ। এই কুরাইশরা তো আবূ সুফিয়ানের (কাফিলা) রক্ষা করার জন্য এসেছে।[২৩৭]

বন্দীদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমদের প্রতি কতটা উদার ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তা তাঁর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আবু আইউব(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (বন্দিনী) মা ও তার সন্তানকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার এবং তার প্রিয়জনদের (পরস্পর থেকে) বিচ্ছিন্ন করবেন।
আবু 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। এ অনুচ্ছেদে আলী (রা.) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তৎপরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তারা বন্দিনী মা-সন্তান, পিতা-পুত্র এবং ভাইদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষিদ্ধ বলেছেন।[২৩৮]

প্রাণ হরণকারীকে ক্ষমাঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দয়ার সাগর। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি তিনি সর্বোচ্চ সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। এমনকি তাঁর প্রাণ হরণ করতে আসা ব্যক্তিদেরকেও তিনি অবলীলায় ক্ষমা করে দিয়ে মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তার জীবনের চরম শত্রুকে পরম ক্ষমা করার বহু দৃষ্টান্ত আছে। যেমন ইব্‌ন শিহাব (রা.) থেকে জানা যায় যে, বদর যুদ্ধে পরাজিত হবার গ্লানি ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মক্কার কাফির মুশরিকরা গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে নিহত মুশরিক নেতা উমাইয়া ইব্‌ন খালফের ছেলে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া এবং কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে শয়তান ব্যক্তি, মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামকে নির্যাতন করার ব্যাপারে অগ্রগামী উমায়ের ইব্‌ন ওহাব জুমাহীর মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়, উমায়ের তার ছেলে বদরের যুদ্ধবন্দী ওহাবকে

[২৩৭] আবু দাউদ সুলাইমান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৬৭২
[২৩৮] ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত, আবওয়াবুস সিয়ার, হাদীস নং ১৫৫২

মুক্ত করার অজুহাতে মদীনায় গিয়ে অতর্কিতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর হামলা করে তাঁকে হত্যা করবে এবং সাফওয়ান উমায়েরের পারিবারিক দায়ভার বহন করবে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে এ কাজ করতে গিয়ে একাধিক বারের বেশি আঘাত করা সম্ভব হয়তো নাও হতে পারে এবং এর ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হয়েও বেঁচে যেতে পারেন, এজন্যে উমায়ের অল্প আঘাতেই তাঁর প্রাণনাশ করার অভিপ্রায়ে তরবারীতে তীব্র বিষ মাখিয়ে নিল। আল্লাহ তা‘আলা অহীর মাধ্যমে তাঁকে তার এ গোপন অভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন। উমায়ের গলায় তরবারী ঝুলিয়ে মসজিদে নববী প্রাঙ্গনে উপস্থিত হল। তার কুটিল চাহনি ও সন্দেহজনক হাবভাব দেখে উমর (রা.) সাহাবীগণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারপাশে সর্তক অবস্থান নেয়ার ইঙ্গিত করলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানেন যে, উমায়ের তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন তথাপি তিনি তার আগমণের সংবাদে সহাস্যে বললেন, “তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো” মহানুভব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রাণের দুশমনকে হাতের মুঠিতে পেয়েও তাকে শায়েস্তা করার কোন পদক্ষেপই নিলেন না। বরং তার সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করে শুধু তার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। সে আসল কারণ না বলে সত্যকে গোপন করলো। অথচ তিনি সত্য ঘটনাটি জানেন । উদার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি প্রতিশোধপরায়ন না হয়ে মক্কায় তাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন। এ কথা শুনে উমায়ের সত্য স্বীকার করে নিল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিয়ে সাহাবীদেরকে বললেন, “তোমাদের এই ধর্ম ভাইকে উত্তম রূপে ধর্ম ও কোরআনের শিক্ষা দাও এবং তার প্রার্থিত বন্দিদের মুক্তি দাও।”[২৩৯] ভিন্ন মতের

---

[২৩৯] আবুল ক্বাসেম হাবারানী, *মু‘অজামুল কাবীর*, (কায়রো : মাকতাবু ইব্ন তাইমিয়াহ, ১৯৯৪ খ্রী.), বাব উমাইর ইব্ন ওহাব ইল জুমাহী, খ. ১৭, পৃ. ৫৮

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَلَمَّا رَجَعَ الْمُشْرِكُونَ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ قَتَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، أَقْبَلَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ الْجُمَحِيُّ حَتَّى جَلَسَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي الْحِجْرِ فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ الْعَيْشَ بَعْدَ قَتْلَى بَدْرٍ قَالَ: أَجَلْ وَاللهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ بَعْدَهُمْ وَلَوْلَا دَيْنٌ عَلَيَّ لَا أَجِدُ لَهُ قَضَاءً وَعِيَالًا لَا أَدَعُ لَهُمْ شَيْئًا لَرَحَلْتُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَتَلْتُهُ إنْ مَلَأْتُ عَيْنِي مِنْهُ، فَإِنَّ لِي عِنْدَهُ عِلَّةً أَعْتَلُّ بِهَا لَهُ، أَقُولُ قَدِمْتُ عَلَى ابْنِي هَذَا الْأَسِيرِ، فَفَرِحَ صَفْوَانُ بِقَوْلِهِ وَقَالَ: عَلَيَّ دَيْنُكَ وَعِيَالُكَ أُسْوَةُ عِيَالِي فِي النَّفَقَةِ لَا يَسَعُنِي شَيْءٌ وَأَعْجَزُ عَنْهُ، فَحَمَلَهُ صَفْوَانُ وَجَهَّزَهُ، وَأَمَرَ بِسَيْفِ عُمَيْرٍ فَصَقَلَهُ وَسُمَّ، وَقَالَ عُمَيْرٌ لِصَفْوَانَ: أَنِ اكْتُمْنِي أَيَّامًا، فَأَقْبَلَ عُمَيْرٌ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ وَعَقَلَ رَاحِلَتَهُ وَأَخَذَ السَّيْفَ فَعَمَدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ وَيَذْكُرُونَ نِعْمَةَ اللهِ فِيهَا، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ مَعَهُ السَّيْفُ فَزِعَ وَقَالَ عُمَرُ: هَذَا الْكَلْبُ، هَذَا عَدُوُّ اللهِ الَّذِي حَرَّشَ بَيْنَنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَحَزَرَنَا لِلْقَوْمِ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ وَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَذَا عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُتَقَلِّدًا سَيْفَهُ وَهُوَ الْغَادِرُ الْفَاجِرُ يَا نَبِيَّ اللهِ لَا تَأْمَنْهُ، قَالَ: «أَدْخِلْهُ» فَخَرَجَ عُمَرُ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَحْتَرِسُونَ مِنْ عُمَيْرٍ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ وَعُمَيْرٌ حَتَّى دَخَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ عُمَيْرٍ سَيْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «تَأَخَّرْ عَنْهُ» فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ عُمَيْرٌ قَالَ: أَنْعِمُوا صَبَاحًا – وَهِيَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ – قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَكْرَمَنَا اللهُ عَنْ تَحِيَّتِكَ وَجَعَلَ تَحِيَّتَنَا تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهِيَ السَّلَامُ» فَقَالَ عُمَيْرٌ: إِنَّ عَهْدَكَ بِهَا لَحَدِيثٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَبْدَلَنَا اللهُ خَيْرًا مِنْهَا، فَمَا أَقْدَمَكَ يَا عُمَيْرُ» : قَالَ: قَدِمْتُ فِي أَسْرَانَا فَإِنَّكُمُ الْعَشِيرَةُ وَالْأَهْلُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَا بَالُ السَّيْفِ فِي رَقَبَتِكَ؟» قَالَ عُمَيْرٌ: قَبَّحَهَا اللهُ مِنْ سُيُوفٍ وَهَلْ أَغْنَتْ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، إِنَّمَا نَسِيتُهُ فِي رَقَبَتِي حِينَ نَزَلْتُ،

Dhaka University Institutional Repository

মানুষদেরকেও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখতেন। এই আদর্শই তিনি রেখে গেছেন তাঁর উম্মতগণের জন্য।

তাঁর অনুগ্রহের আরেকটি উদাহরণ হল, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবী সহ বনূ নাযীরের ইহুদীদের সাথে একটি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে গেলেন, এ সময় তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে বলল। তিনি তাদের এক বাড়ীর দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলেন। এমন সময় ইহুদীরা শয়তানের প্ররোচণায় পড়ে সেই বাড়ীর ছাদ থেকে পাথর ছুঁড়ে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের পক্ষ থেকে জিব্‌রাঈল (আ.) সে সম্পর্কে তাঁকে জানিয়ে দিলেন। মদীনার অধিপতি এই নির্মম ষড়যন্ত্র অবগত হয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে মদীনায় চলে গেলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হল তিনি তাদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে তাদেরকে মদীনা থেকে অন্যত্র চলে যেতে বলেন। এছাড়া পরিবার পরিজন এবং উটের পিঠে বোঝাই করে ধন সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে এই মর্মে প্রস্তাব পাঠান। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।[২৪০] এরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটে খায়বর যুদ্ধের পর। সীরাতে ইব্‌ন হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ যুদ্ধে বিজয়ের পর যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ঠিক তখনই যয়নাব বিনতে হারিস নামক এক ইহুদী নারী তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ মেশানো বকরী ভুনা উপহার পাঠালো। তিনি বকরীর যে অংশ খেতে বেশী পছন্দ করেন তা জেনে নিয়ে তাতে আরো বেশী বিষ মিশিয়ে ছিল।[২৪১] জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, খায়বরের এক ইহুদী নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যখন বিষ মেশানো বকরী ভুনা উপহার পাঠালো তখন তিনি রানের এক টুকরা গোশত মুখে দিলেন এবং তাঁর সাথে একদল সাহাবাও ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিবিয়েই বুঝলেন যে তাতে বিষ মেশানো তাই তিনি তা ফেলে দিয়ে বললেন ‘তোমরা তোমাদের হাত থেকে এগুলো ফেলে দাও।’ মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে স্বীকারোক্তি করে বলল, ‘আপনাকে কে এই সংবাদ দিয়েছে?’ তিনি বললেন, ‘আমার হাতের এই গোশতটিই আমাকে খবর দিয়েছে। তুমি কেন এ কাজ করলে?’ সে বলল, ‘আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে তা আপনার কোন ক্ষতি করবে না। আর যদি বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আমরা আপনার হাত হতে রক্ষা পাবো।’ এ কথা শুনে

وَلَعَمْرِي إِنَّ لِي بِهَا غَيْرَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْدُقْنِي مَا أَقْدَمَكَ؟» قَالَ: مَا قَدِمْتُ إِلَّا فِي أَسِيرِي قَالَ: «فَمَا الَّذِي شَرَطْتَ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي الْحِجْرِ» فَفَزِعَ عُمَيْرٌ وَقَالَ: مَاذَا شَرَطْتُ لَهُ؟ قَالَ: «تَحَمَّلْتَ لَهُ بِقَتْلِي عَلَى أَنْ يَعُولَ بَنِيكَ وَيَقْضِي دَيْنَكَ، وَاللهُ حَائِلٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَاكَ» ، قَالَ عُمَيْرٌ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كُنَّا يَا رَسُولَ اللهِ، نُكَذِّبُكَ بِالْوَحْيِ وَبِمَا يَأْتِيكَ مِنَ السَّمَاءِ، وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَفْوَانَ بِالْحِجْرِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ وغَيْرِي، فَأَخْبَرَكَ اللهُ بِهِ فَآمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَاقَنِي لِهَذَا الْمَسَاقِ فَفَرِحَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ حِينَ هَدَاهُ اللهُ وَقَالَ عُمَرُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، الْخِنْزِيرُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عُمَيْرٍ حِينَ طَلَعَ، وَلَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِ بَنِيَّ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسْ يَا عُمَيْرُ نُوَاسِيكَ» وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «عَلِّمُوا أَخَاكُمْ الْقُرْآنَ وَأَطْلِقُوا لَهُ أَسِيرَهُ»

[২৪০] আব্দুল মালেক ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ১৯০

[২৪১] আব্দুল মালেক ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ৩৩৭ - ৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মাফ করে দিলেন।”[২৪২] অথচ তিনি এই বিষের প্রতিক্রিয়াতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে যখন রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো তখন তিনি বলেছিলেন, “হে আয়িশা, খায়বরে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা এখন আমি ভালভাবে উপলব্ধি করছি। এ মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করছি যে ,সে বিষের প্রভাবে আমার শিরা উপশিরাসমূহ কর্তিত হচ্ছে।”[২৪৩]

এরূপ প্রাণঘাতী শত্রুকে ক্ষমা করার আরেকটি ঘটনা জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, “যাতুর রিকা যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম আমরা যখন কোন ছায়াদানকারী গাছের নিকট পৌঁছতাম তখন তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য ছেড়ে দিতাম। একবার তিনি শিবির স্থাপন করলেন। তখন লোকেরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের মাঝে এদিক সেদিক এলোমেলো অবস্থায় ছড়িয়ে পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নীচে অবতরণ করেন এবং বৃক্ষের সাথে তরবারী ঝুলিয়ে শুয়ে পড়েন। জাবির (রা.) বলেছেন, আমরা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম এমন সময় এক মুশরিক এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরবারী হাতে নিয়ে বলল, তুমি আমাকে ভয় করছ? তিনি বললেন, ‘না’ । সে বলল, ‘তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ’ । জাবির (রা.) বলেছেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ আমাদের ডাক দিলেন, আমরা সেখানে পৌঁছে দেখলাম যে, একজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বসে রয়েছে। তিনি বললেন, আমি শুয়েছিলাম এমন সময় এই ব্যক্তি আমার তরবারীখানা টেনে হাতে নিলে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে তরবারীখানা হাতে নিয়ে বলল, আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে বসে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোন প্রকার তিরস্কার করলেন না বা ধমক দিলেন না।”[২৪৪]

---

[২৪২] আবু মুহাম্মদ ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ দারেমী, *মুসনাদুদ দারেমী আল মা‘রুফ* ,(সৌদী ‘আরব : দারুল মুগনী, ২০০০ খ্রী.), বাব মা আকরামাল্লাহু ‘আয্‌যা ওয়া জাল্‌লা বিহি নাবিয়্যিহি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খ. ১ম, পৃ. ২০৮

كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ الرَّهْطُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ» وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاهَا، فَقَالَ لَهَا، «أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ؟»، فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَمَنْ أَخْبَرَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ فِي يَدِي: لِلذِّرَاعِ "، فقالتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَاذَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ؟»، قَالَتْ: قُلْتُ: إِنْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُعَاقِبْهَا

[২৪৩] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাব মারাদুন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া ওফাতিহি, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৯

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ»

[২৪৪] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাব গাযওয়াতু যাতুর রিকা , ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৪

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ القَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي العِضَاهِ، يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَنِمْنَا نَوْمَةً، ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

এভাবেই তিনি তাঁর প্রাণনাশী শত্রুদেরকে ক্ষমা করে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

বনু কাইনুকার ধৃষ্টতায় সহনশীল ব্যবহার: মদীনায় যে তিনটি ইহুদী সম্প্রদায় বসবাস করতো তাদের মধ্যে বনু কাইনুকা ছিল সবচেয়ে হিংসুটে প্রকৃতির। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের পর তারা মদীনা সনদের চুক্তি ভঙ্গ করে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায়, "তারাই প্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে।"[২৪৫]

তারা মুসলমানদের প্রতি অন্যায় ও বিদ্রূপাত্মক আচরণ করতে লাগলো। তাদের ঔদ্ধত্যের পরিমাণ যখন চরম অবস্থায় ওঠল তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নানা প্রকার হিতোপদেশ দিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বলল, "হে মুহাম্মদ, কতকগুলো আনাড়ী কুরাইশকে হত্যা করেছ বলে গর্বিত হয়ো না। যুদ্ধ সম্বন্ধে তারা একবারে অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আমাদের সাথে যখন যুদ্ধ হবে তখন বুঝবে যে ব্যাপারটা কত কঠিন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাই তিনি তাদের এমন হুমকির পরও ক্রোধ সংবরণ করে ধৈর্য ধারণ করলেন। অন্যান্য মুসলমানগণও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলেন।

এদিকে বনু কাইনুকা আরো সংঘাতময় পন্থা অবলম্বন করে। এ ক্ষেত্রে তারা মুসলিম মহিলাদেরকেও ছেড়ে দিত না। আবু আওন থেকে ইব্‌ন হিশাম একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে জানা যায় এক ইহুদী কর্তৃক একজন মুসলিম মহিলার সম্ভ্রমহানিকে কেন্দ্র করে বনু কাইনুকা বাজারে মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।[২৪৬] এতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তিনি এ সম্প্রদায়ের প্রতি রক্তক্ষয়ী প্রতিশোধের পরিবর্তে সহনশীল পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি তাদেরকে আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়ে তাদের দূর্গ অবরোধ করে রাখেন। তারা আত্মসমর্পণ করলে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মহানুভব নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে দয়ার পরিচয় দেন। তাদেরকে মদীনা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। এভাবে তিনি বিনা রক্তপাতে বিধর্মী সম্প্রদায়ের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদেরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে রক্ষা করেন। মদীনাকে সাম্প্রদায়িক সংঘাত থেকে হেফাজতের প্রচেষ্টা চালান।

وَسَلَّمَ يَدْعُونَا فَجِئْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ " ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২৪৫ আব্দুল মালেক ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ৪৭

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ بَنِي قَيْنُقَاعَ كَانُوا أَوَّلَ يَهُودَ نَقَضُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلم،

২৪৬ আব্দুল মালেক ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুদের জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনা প্রার্থনা: মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উদারচেতা ও মহানুভব চরিত্রের অধিকারী। জীবনের ক্রান্তি লগ্নেও তিনি দুঃখ, বেদনা, কষ্ট ভুলে ক্ষমা করে দিতে পারতেন প্রতিপক্ষকে। এমনি এক উপমা পাওয়া যায় উহুদ যুদ্ধের সংকটময় মূহুর্তে। যখন কাফির মুশরিকরা তাঁকে হত্যার জন্য আক্রমণ করেছে, ইব্‌ন কামআহ নামক এক মুশরিক সাহাবীগণের বেষ্টনী ছিন্ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিরস্ত্রাণের উপর আঘাত করেছে, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছে, তাঁর দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছে, এমনকি তাদের খোঁড়া গর্তে পড়ে গিয়ে তিনি আহত হচ্ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে তাদের শাস্তি কামনার পরিবর্তে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার আবেদন জানাচ্ছিলেন। ‘আব্দুল্লাহ (রা.) এর রেওয়ায়েতে সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, “নিশ্চয়ই আমি দেখেছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীগণের মধ্য হতে একজন নবী হিসেবে যাকে তাঁর জাতি আঘাত করছিল এবং তিনি তার মুখমণ্ডল হতে রক্ত মুছে নিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার কাওমকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই তারা জানে না।”[২৪৭]

শত্রুদের খাদ্য সংকট দূরীকরণের প্রচেষ্টা: ইয়ামামার নগরপতি সুমামাহ ইব্‌ন উসাল ইসলাম গ্রহণের পর ওমরাহ পালনার্থে মক্কায় গেলে সেখানকার মুশরিকরা স্বধর্ম ত্যাগের কারণে তাকে ধিক্কার জানাতে থাকে। তাদের এরূপ আচরণে তিনি অত্যন্ত আঘাত পান এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেন, “আল্লাহর শপথ। এখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি ব্যতিত গমের একটি দানাও ইয়ামামা থেকে মক্কায় রপ্তানি করা হবে না।”[২৪৮]

অতঃপর সত্যি তিনি মক্কায় শস্য রপ্তানি সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেন। অথচ সেখান থেকে মক্কার খাদ্যের এক বিরাট অংশ আমদানি হতো। রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মক্কায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মক্কাবাসীরা কিছুতেই এই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় পাচ্ছিল না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা এ ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরণাপন্ন হয়। মক্কার যে কাফির মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষ্পেষিত হয়েছিলেন, প্রিয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেছিলেন তাদের খাদ্য সংকটের সংবাদে তাঁর অন্তরে করুণার উদ্রেক হয় এবং তিনি সুমামা (রা.) কে খাদ্য অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার নির্দেশ প্রদান

---

[২৪৭] ইমাম মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, বাবু গাযওয়াতু উহুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১৭

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»،

[২৪৮] ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী , ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭০

وَلاَ وَاللَّهِ، لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ، حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই নির্দেশ পাওয়ার পর সুমামা (রা.) পুনরায় মক্কায় খাদ্য রপ্তানি শুরু করেন।

চরম অবস্থায়ও ‘আব্দুল্লাহ বিন উবাইর ব্যাপারে ধৈর্যধারণ: রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের কারণে মদীনার বাদশাহী থেকে বঞ্চিত হওয়া ‘আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য ইসলাম গ্রহণ করে। তার অন্তর ছিল কুফরীতে পরিপূর্ণ। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়। সে মুসলমান মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির জন্য আনসারদেরকে সবসময় উসকানি দিত। উহুদের যুদ্ধে এই ব্যক্তি তার দল নিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। বনু নাযীর গোত্রের সঙ্গেও গোপন আঁতাতের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছিল। অনুরূপভাবে খন্দকের যুদ্ধেও সে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা, চাঞ্চল্য ও ভীতি সঞ্চারের জন্য নানা কুট কৌশল প্রয়োগ করেছিল।
এই মুনাফিক ব্যক্তিটি নানা ছল-চাতুরি, প্রতারণা ও ধুর্ততার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরণ অব্যাহত রেখেছিল। এমনকি সে তাঁর ও তাঁর পরিবারের চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল। যখন যায়িদ বিন হারিসা (রা.) যয়নবকে তালাক প্রদান করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন সে রাসূলুল্লাহর চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। কারণ তৎকালীন আরবে পালিত পুত্রের স্ত্রীকে প্রকৃত পুত্রের স্ত্রীর ন্যায় অবৈধ গণ্য করা হত। সুতরাং যখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যয়নব (রা.) কে বিয়ে করেন তখন ‘আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সঙ্গী মুনাফিকরা কুৎসা ছড়াতে থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মদ যয়নবকে দেখামাত্র তাঁর সৌন্দর্যে এমনভাবে আকৃষ্ট হন যে, সঙ্গে সঙ্গে মন দেয়া নেয়া হয়ে যায়। যায়িদ (রা.) যখন এ খবর জানতে পারেন তখন তিনি যয়নবকে তালাক প্রদান করেন। এছাড়া আয়েশা (রা.) ও সাফওয়ান ইব্ন মু‘আত্তাল (রা.) কে জড়িয়ে ইফ্কের ঘটনা সূত্রপাতের মূল হোতাও এই ‘আব্দুল্লাহ বিন উবাই। আল্লাহ তা‘আলা ওহির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত করান। বনু মুস্তালিক যুদ্ধে সে আনসারদেরকে বলছিল যে, মদীনায় ফিরে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরকে বহিষ্কার করবে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

“এরা ঐ সকল মুনাফিক, যারা বলছিল যে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে আসি তাহলে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, মর্যাদাহীন ব্যক্তিদেরকে মদীনা হতে বের করে দেবে।”[২৪৯]

---

[২৪৯] আল কুর’আন, সূরা মুনাফিকুন : ৮

Dhaka University Institutional Repository

তার এহেন কর্মকাণ্ডে মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাকে হত্যার পরামর্শ দেন। এমনকি তার পুত্র ‘আব্দুল্লাহ যে তার পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত, যিনি একজন উত্তম সাহাবী ছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এই বলে আরজ করেন যে,“আপনি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করলে আমাদের নির্দেশ প্রদান করুন। আল্লাহর কসম! আমি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে আপনার খিদমতে এনে হাজির করব।”

কিন্তু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যা করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না। উপরন্তু এই মুনাফিক সর্দার যখন মারা গেল তখন তিনি তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, ‘আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই যখন মারা গেল তখন তার পুত্র ‘আব্দুল্লাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার জামাটি দান করুন। এটি দিয়ে আমি তার কাফন বানাবো। আপনি তার (জানাযার) নামাজটি পড়িয়ে দিন এবং তার মাগফিরাতের জন্য দু‘আ করুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁর জামাটি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, যখন অবসর হবে, আমাকে খবর দিবে। যখন তিনি অবসর হলেন, এ ব্যাপারে তাঁকে খবর দিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তার নামাজ পড়াতে অগ্রসর হলেন। এমন সময় উমর (রা.) তাঁকে টেনে ধরলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা‘আলা কি আপনাকে মুনাফিকদের নামায পড়াতে নিষেধ করেননি? কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: ’আপনি তাদের মাগফিরাতের জন্য দু‘আ করুন বা না করুন, আপনি যদি তাদের জন্য সত্তর বারও মাগফিরাতের দু‘আ করেন, তবুও আল্লাহ তা‘আলা কখনও তাদেরকে মাফ করবেন না।’ অতঃপর এ আয়াত নাযিল হল:

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

“তাদের মধ্যে যে মরে যায় তার নামাজ আপনি কখনও পড়াবেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের নামাজ পড়া বর্জন করেছেন।” [২৫০]

---

[২৫০] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল লিবাস, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৪৩

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ. فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ: «إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذِنَّا» فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ بِهِ، فَجَاءَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى المُنَافِقِينَ، فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] فَنَزَلَتْ: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানোর প্রচেষ্টা: মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন যে কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে পরিহার করার। কারণ সংর্ঘষ হলেই জান ও মালের অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। সংঘর্ষ এড়ানোর এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মারওয়ান ইব্ন হাকাম বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীস থেকে। যার সারাংশ হল, ষষ্ঠ হিজরীতে আরব উপদ্বীপের অবস্থা যখন অনেকাংশে মুসলমানদের অনুকূলে আসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে ওমরাহ করতে দেখেন। এজন্যে তিনি পবিত্র কাবাঘরে ওমরাহের নিয়তে কুরবানীর পশুসহ চৌদ্দশত মতান্তরে পনেরশত সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে নিয়ে মক্কাভিমূখে রওয়ানা হন। যুদ্ধ নয় ওমরাহের উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছেন, এটি নিশ্চিত করতে যুল হুলায়ফায় পৌঁছে তাঁরা কুরবানীর পশুকে মালা পরিয়ে দিলেন। উটের পিঠের উঁচু জায়গা কেটে চিহ্নিত করলেন এবং উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধলেন। কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খোযায়া সম্প্রদায়ের এক গোয়েন্দাকে প্রেরণ করা হল। গোয়েন্দার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন তারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে এবং আল্লাহর ঘর থেকে তাঁকে বিরত রাখতে বদ্ধ পরিকর। এ অবস্থায় তিনি কুরাইশদের সাহায্যকারী লোকজন অধ্যুষিত জনপদের পার্শ্ববর্তী পথ দিয়ে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। এমন সময় বনু কা'ব গোত্রের এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জানালেন যে মুসলমানদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিতে কুরাইশগণ 'যীতাওয়া' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছে। আর খালিদ বিন ওয়ালিদ মক্কা যাওয়ার প্রধান পথ কুরাউল গামীমে দুইশত অশ্বারোহী নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। খালিদের আক্রমণ প্রতিহত করতে এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে খাওফের নামাজ পড়েন এবং কুরাউল গামীমের প্রধান পথ ছেড়ে দিয়ে আঁকাবাঁকা অন্য এক পথ ধরে সামনে এগিয়ে গেলেন। এ পথটি ছিল পাহাড়ী পথ। প্রধান সড়কটি বাম পাশে রেখে ডান দিকে ঘুরে হিমস হয়ে 'সানিয়াতুল মারার' এর উপর দিয়ে যে পথ হুদাইবিয়াতে নেমেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পথ দিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। এর ফলে তিনি খালিদের সৈন্যবাহিনীর সাথে যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত হতো তা এড়িয়ে গেলেন।[২৫১]

এরপর মুসলমানরা হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপন করে কুরাইশদের সাথে যখন সন্ধি চুক্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন কুরাইশদের ৭০ কিংবা ৮০ জন যুদ্ধবাজ যুবক যুদ্ধের ইন্ধন যোগাতে তানঈম পর্বতে অবতরণ করে মুসলমানদের শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম শিবির প্রহরীদের পরিচালক মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাদের সকলকে বন্দি করেন। কিন্তু সন্ধিচুক্তির খাতিরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে ক্ষমা করে মুক্ত করে দেন। এ সম্পর্কেই আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন:

---

[২৫১] আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আশশায়বানী, *মুসনাদে আহমদ*, (বৈরুত : মু'সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রী.), বাব-হাদীসুল মাসুর ইব্ন মুখরিমাহ আযযুহরী ওয়া মারওয়ান ইব্ন হাকাম, ৩১ খণ্ড, পৃ. ২১২

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

"তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদের ওপর হতে তাদের হাতকে নিবৃত্ত করলেন মক্কা প্রান্তরে এবং তোমাদের হাতকে তাদের হতে। অবশ্য এর আগেই তিনি তাদেরকে তোমাদের আয়ত্বে এনে দিয়েছিলেন।"[২৫২]

বিনা বিনিময়ে বন্দী মুক্তিকরণ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মক্কার আশিজন লোক (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়), নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের হত্যা করার মানসে তান'ঈম পর্বতের দিক হতে, ফজরের সালাতের সময় অবতরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আত্মসমর্পণ করিয়ে বন্দী করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিনা-বিনিময়ে মুক্ত করে দেন। তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন, "আল্লাহ্ এমন যে, তিনি তাদের হাতগুলোকে তোমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন এবং তোমাদের হাতগুলোকে তাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন, মক্কার উপত্যকায়।" এভাবে উক্ত আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়।[২৫৩]

ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে মুশরিকের ইচ্ছা পূরণঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মন মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি। সাম্প্রদায়িকতার আগুন নেভাতে তিনি যেমন ভিন্ন পথে মক্কায় গিয়েছিলেন তেমনিভাবে হুদাইবিয়াতে মুশরিকদের ইচ্ছে মত তাদের সাথে আপোষ রফা করতে নিজ হাতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লিখা মুছে بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ লিখেছিলেন। ইমাম বুখারী মারওয়ান ইব্ন হাকাম থেকে এক দীর্ঘ হাদীসের একাংশে এ ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, "অতঃপর সুহাইল বিন আমর এল। সে বলল, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একটি চুক্তি লিপিবদ্ধ কর। অতএব রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক লিখককে ডাকলেন। বললেন, লিখ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' সুহাইল বললোঃ 'রহমান' বলতে কি বুঝায় আমরা তা জানিনা। আপনি এইভাবে লিখুন, 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'। মুসলমানগণ বলে উঠলেনঃ আমরা বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম ছাড়া কিছুই লিখবনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন লিখ, 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'। আরো লিখঃ 'এ গুলো হচ্ছে সেই সব কথা, যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধি করলেন। এ সময় সোহাইল বলল,"আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহলে আপনাকে আল্লাহর ঘর হতে বিরত রাখতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতাম না। কাজেই আপনি লিখুন, 'মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ'। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও এ এক মহাসত্য যে আমি আল্লাহর রাসূল।" অতঃপর তিনি বললেন,

---

[২৫২] আল কুর'আন, সূরা ফাতহ : ২৪

[২৫৩] আবু দাউদ সুলাইমান, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৬৭৯

Dhaka University Institutional Repository

"লিখ 'মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ'।[২৫৪] " এছাড়া আরো জানা যায় যখন এই সন্ধির লেখক আলী (রা.) কে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' কথাটি মুছে ফেলার ব্যাপারটি মেনে নিতে পারছিলেন না বলে ইতস্ততঃ করছিলেন। তখন তিনি নিজ হাতে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে দিয়ে কাফিরদের ইচ্ছে মত মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ লিখার আদেশ দিলেন।

এভাবে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পন্ন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ক্ষুব্ধ সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ন্ত্রণ করে মানবতার স্বার্থে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে এড়াতে আল্লাহর নির্দেশে সুহাইল ইব্‌ন আমরের ইচ্ছানুযায়ী হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করেন।

সহনশীলতার সাথে অঙ্গীকার পূরণ: কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে মক্কার সাম্প্রদায়িক মুশরিক সমাজ তাঁকে পূর্ববর্তী ধর্মে প্রত্যাবর্তন করাতে তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন করত। তাদের নির্যাতন নিপীড়নে নিষ্পেষিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। এরপর যারা ইসলাম গ্রহণ করে মক্কায় বসবাস করছিলেন কাফির মুশরিকরা তাদেরকেও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হুদাইবিয়া সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী কুরাইশদের দূত সুহাইল বিন আমর এর পুত্র আবু জান্দাল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সুহাইলের তত্ত্বাবধানে যখন সন্ধিচুক্তি লিখা হচ্ছিল ঠিক এ সময় সুহাইল বিন আমরের পুত্র আবু জান্দাল অত্যাচার নির্যাতনে জর্জরিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আশ্রয় লাভের আশায় শৃঙ্খলিত অবস্থায় মক্কা থেকে পালিয়ে আসলেন। ক্ষত বিক্ষত আবু জান্দালকে দেখে মুসলমানদের প্রাণ কেঁদে উঠলো। তাঁরা তাঁকে মক্কায় জালিমদের কাছে পাঠাতে চান না। যে কোন মূল্যে তাঁকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর পিতা সুহাইল তাঁকে দেখামাত্র ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল, তাঁকে মারধর করতে লাগল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্মরণ করাচ্ছিল এই বলে যে, চুক্তিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে "কুরাইশদের কোন লোক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদের নিকট এলে তিনি তাদের ফেরত পাঠাবেন।"[২৫৫]

---

[২৫৪] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাবু শুরূতু ফির জিহাদি ওয়াস সুলহাতি মিন আহলি, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩

: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: وَاللَّهِ لاَ نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ» ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِ، وَلاَ قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ، وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ» –

[২৫৫] আব্দুল মালেক ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড , পৃ. ৩১৮

এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণের মাধ্যমে জোর করে আবু জান্দালকে নিজের কাছে রেখে দিতে পারতেন কিন্তু তিনি মুশরিকদের সাথে যে শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেন। তাঁর জন্য মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জান্দালকে তাঁর পিতার কাছে ফিরে যেতে বললেন। মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এসেছে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু জান্দাল। ধৈর্য ধারণ করো এবং একে সওয়াবের উপায় মনে করো। আল্লাহ তা‘আলা তোমার এবং তোমার মত যেসব দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলমান তোমার সাথে আছে তাদের জন্য একটি ব্যবস্থা করে দিবেন। আমরা কুরাইশদের সাথে সন্ধি করেছি এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। আমরা তাদেরকে দেয়া এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবো না।”[২৫৬]

খায়বর অভিযানে শান্তির নির্দেশ: হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরাইশদের শত্রুতা থেকে মুসলমানদের নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে করলেন, তখন ইয়াহুদী ও নাজদের অন্যান্য গোত্রসমূহের সাথেও সমঝোতা করার চিন্তা করতে থাকলেন। যেন এ সকল জনগোষ্ঠীর শত্রুতা পরিহারের মাধ্যমে মুসলমানদের শান্তি ও স্বস্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত হয় এবং ইসলাম প্রচারের কাজে বেশী পরিমাণে আত্মনিয়োগ করা যায়। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইহুদীদের বাসস্থান খায়বর শহরের দিকে মনোযোগ দিলেন। কারণ এটি ছিল বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারী ও যুদ্ধবাজদের আড্ডা, সৈনিক মহড়ার কেন্দ্র এবং প্ররোচণা, প্রবঞ্চনা ও যুদ্ধের দাবানল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। এ অভিযানে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরো একটি অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পওয়া যায়। তা হল তলোয়ারের জোড়ে নয় বরং উদারতার মাধ্যমে বিধর্মীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

এ অভিযানে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীসহ রাতের বেলা খায়বর শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছেন। কিন্তু তখন তিনি ঘুমন্ত অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ করলেন না। কারণ তাঁর নিয়ম ছিল যে, কোন সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করতে চাইলে সেখানে গিয়ে রাত যাপন করতেন এবং সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনা করতেন না।[২৫৭]

এমন কি তিনি সে সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করতেন, “হে আল্লাহ! সাত আসমান এবং যার ওপর এর ছায়া রয়েছে তাদের প্রভু এবং সাত জমিন ও এদের উপর যা রয়েছে তাদের প্রভু এবং শয়তানসমূহ এবং যাদেরকে তারা ভ্রষ্ট করেছে তাদের

---

২৫৬ ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত, বাব হাদীসু মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ আয যুহরী ওয়া মারওয়ান ইব্ন. খ. ৩১, পৃ. ২১৯
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَبَا جَنْدَلٍ اصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا، فَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَأَعْطَوْنَا عَلَيْهِ عَهْدًا، وَإِنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ ".

২৫৭ ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাব গাযওয়াতু খায়বর, খ. ৫ম, পৃ. ১৩৪
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلًا، وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ بِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ،

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিপালক আমরা আপনার নিকট এই বসতির মঙ্গল, এর বাসিন্দাদের মঙ্গল এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করছি। এই বসতির অনিষ্টতা, এখানে বসবাসকারীদের অনিষ্টতা এবং এখানে যা কিছু আছে তার অনিষ্টতা হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর বলতেন চল, আল্লাহর নামে সামনে অগ্রসর হও।”[২৫৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর অভিযানের প্রাক্কালেও এরূপ প্রার্থনা করলেন। এরপর তিনি যখন খায়বর সীমানায় প্রবেশ করলেন তখন আলী (রা.) এর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে তাঁকে যথা সম্ভব উদার পন্থা অবলম্বনের উপদেশ দিলেন, উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যোগালেন। বললেন, “শান্তির সঙ্গে চল এবং তাদের ময়দানে অবতরণ কর। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং ইসলামের মধ্যে আল্লাহর যে সমস্ত প্রাপ্য রয়েছে যা তাদের কর্তব্য সে সম্পর্কে তাদেরকে জানাও। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের মাধ্যমে যদি একজনকেও হিদায়াত দেন, তাহলে তা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে।”[২৫৯]

এই হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করে দেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেছিলেন এবং তাঁর সৈন্যদলকে উদারতার পরিচয় দিতে উৎসাহিত করেছিলেন।

মানবতাবোধঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানবতার প্রতীক। মানুষ সে শত্রু হোক অথবা মিত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হতেন না। খায়বর যুদ্ধ শেষে বিলাল (রা.) দু’জন ইহুদী নারীকে ধরে তাদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পুরুষ নিহতদের স্তুপের নিকট নিয়ে গেলেন। নিহতদের স্তুপ দেখে আতংকে ভয়ে একজন মহিলা চিৎকার করে উঠলো এবং নিজের মাথায় মাটি মেখে বিলাপ করতে শুরু করে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুবাহিনীর নারীদের প্রতি এ ব্যবহার দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তাই তিনি মহিলা দু’জনকে বন্দীকারী বিলাল (রা.) কে তিরস্কার করে জিজ্ঞেস করেছিলেন:“হে বিলাল! তুমি যখন মহিলা দু’জনকে তাদের পুরুষদের বধ্য ভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলে, তখন তোমার অন্তর থেকে কি মায়া-মমতা চলে গিয়েছিল?”[২৬০]

---

[২৫৮] ইব্ন হিশাম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২য়, পৃ. ৩২৯

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُعَتِّبِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى خَيْبَرَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ، وَأَنَا فِيهِمْ: قِفُوا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهمّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَذْرَيْنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، أَقْدِمُوا بِسْمِ اللَّهِ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ قَرْيَةٍ دَخَلَهَا.

[২৫৯] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাব গাযওয়াতু খায়বর, খ. ৫ম, পৃ. ১৩৪

«انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»

[২৬০] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাব মু‘আমালাতুন নাবিইয়ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলাল খায়বর, খ. ৫ম, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

অমুসলিম মর্যাদাবান ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা: খায়বরের কামূস দুর্গের মালিক ছিল ইহুদী সরদার আবুল হুকাইকের পুত্র কিনানা। তার নববিবাহিতা স্ত্রী প্রসিদ্ধ ইয়াহুদী নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাহ যুদ্ধের পর মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তার পিতা ও স্বামী উভয়েই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এক নেতার কন্যা এবং অন্য নেতার স্ত্রী এমন সম্মানিত নারী সাফিয়্যা তাদেরকে হারিয়ে হয়ে পড়েছিলেন অসহায়। এমতাবস্থায় অসহায়ের সহায় মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হৃদয় এমন মর্যাদাবান নারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে এবং তাকে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করতে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। শত্রুর পুত্র-কন্যা, পরিবারের প্রতি অসদ্ব্যবহার করা, তাদেরকে দাস দাসী বানিয়ে রেখে তাদের প্রতি অমানবিক আচরণ করে নিজেদের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করাই যেখানে চিরাচরিত প্রথা সেখানে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। শুধু তাই নয় তিনি জানতেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাড়িতে ফিরে গেলে তার মর্যাদা রক্ষার উপায় থাকবে না এজন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সম্মানজনকভাবে তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও বলে দিলেন। হাদীসে আছে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়্যাহকে মুক্ত করার পর বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে নিজ বাড়ীতে চলে যেতে পার অথবা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীরূপে জীবন যাপন করতে পার। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীরূপে জীবন যাপন করাকেই পছন্দ করলেন।”

এছাড়া আনাস বিন মালিক বর্ণিত হাদীসে এসেছে,“এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আপনি বনু কুরাইযাহ ও নাযীরের নেতার কন্যা সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াইকে দিহ্‌য়ার হাতে সমর্পণ করছেন অথচ সে শুধু আপনার জন্যই শোভনীয়। তিনি বললেন,‘তাঁকে সাফিয়্যাহসহ ডাক’। দিহ্‌য়া (রা.) তাঁকে নিয়ে আসলেন। অত:পর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিকে তাকিয়ে দিহ্‌য়া (রা.) কে বললেন, ‘তাঁকে ছাড়া বন্দীদের থেকে অন্য একজনকে গ্রহণ কর।’ তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।”[২৬১]

এভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর যুদ্ধের পর ইহুদী সরদার হুয়াই বিন আখতাবের কন্যার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখলেন।

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالِ، فِيمَا بَلَغَنِي، حِينَ رَأَى بِتِلْكَ الْيَهُودِيَّةِ مَا رَأَى: أَنُزِعَتْ مِنْكَ الرَّحْمَةُ يَا بِلَالُ، حِينَ تَمُرُّ بِامْرَأَتَيْنِ عَلَى قَتْلَى رِجَالِهِمَا؟

[২৬১] ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত, বাব মুসনাদে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, খ. ১৯, পৃ. ৫১

فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ادْعُوهُ بِهَا " فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا "، ثُمَّ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.

Dhaka University Institutional Repository

ইহুদীদেরকে স্ব স্ব ভিটাবাড়ীতে বসবাসের অধিকার প্রদান: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। এ জন্যে তাঁর জীবনেতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় তিনি খায়বর যুদ্ধের পর যে ইহুদীদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করার শর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতেই তিনি তাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করেন। তাদেরকে নিজেদের ভিটাবাড়ীতে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন এ শর্তে যে, খায়বরের সমস্ত ক্ষেত খামার ও বাগ-বাগিচার উৎপাদনের এক অর্ধাংশ মুসলমানদের দিতে হবে এবং বাকী অর্ধাংশে ইহুদীদের অধিকার থাকবে।[২৬২]

খায়বরের মত ফিদাক, ওয়াদিল কুরা ও তাইমা অঞ্চলেও ইহুদীদের ঘাঁটি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এরা মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্বের কারণে কেউই ইসলাম গ্রহণে উৎসাহী হয়নি। কিন্তু তারা যখন খায়বরে মুসলিম বাহিনীর বিজয় ও সন্ধিচুক্তির ব্যাপারটি অবহিত হল তখন তারা মনে প্রাণে ভীত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট লোক পাঠিয়ে খায়বরের অনুরূপ সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব করে। ফিদাক এবং তাইমার অধিবাসীরা কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই যথাক্রমে ফিদাকের উৎপাদনের অর্ধাংশ দেয়ার প্রতিশ্রুতি এবং কর প্রদানের বিনিময়ে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ওয়াদিল কুরার অধিবাসীগণ শক্তি প্রয়োগ শেষে মুসলমানদের হাতে আত্মসমর্পণ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জমি ও খেজুর বাগানগুলো তাদের হাতেই ছেড়ে দেন এবং খায়বরবাসীগণের অনুরূপ তাদের সঙ্গেও একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাইমাবাসীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ:

“এই দলিল লিখিত হল আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে বনু আদিয়ার জন্য। তাদের ওপর কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল এবং মুসলমানগণ তাদের জিম্মাদার হলেন। তাদের ওপর কোন প্রকার অন্যায় করা হবে না এবং দেশ থেকে তাদের বিতারিত করা হবে না। রাত্রি হবে তাদের সাহায্যকারী এবং দিন হবে পূর্ণতা প্রদানকারী।”[২৬৩]

মু‘তা যুদ্ধে সামরিক নীতি: উদারতার পরিচয়: হুদাইবিয়া সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রতি আহবান জানিয়ে বসরার শাসনকর্তার নিকট হারিস বিন

[২৬২] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাব ইয়াস তা’যারা আরদান ফামাতা আহাদাহুমা, খ. ৩য়, পৃ. ৯৪

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ [ص:141] مَا يَخْرُجُ مِنْهَا "

[২৬৩] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী , প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ৩১৪

هذا كتاب محمد رسول الله لبني اديا، إن لهم الذمة، وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء ، الليل مد، والنهار شد

Dhaka University Institutional Repository

উমায়েরকে পত্রসহ দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ‘বলকা’ নামক স্থানের খ্রীষ্টান গভর্ণর সুরাহবিল বিন আমর গাস্সানী তাঁকে বন্দী করে হত্যা করে। ‘দূত হত্যা’ তৎকালেও আন্তর্জাতিক নীতির বিরোধী ছিল। রোম সম্রাট এই অন্যায়ের প্রতিকার করার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই ধৃষ্টতার প্রত্যুত্তরে অষ্টম হিজরীর জুমাদিউল উলা মাসে মূতা অভিমূখে তিন হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন।

এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদার সামরিক নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। যে শত্রুরা মুসলমানদের হত্যা করতে বদ্ধ পরিকর তাদের প্রতি প্রেরিত সেনাবাহিনীকে তিনি যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তাতে বর্তমান মানব বিধ্বংসী সভ্যতা বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে। যখন এক দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই দেশকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে তখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক রাসূলুল্লাহ এর আদর্শ অতুলনীয়। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে মূতা যাত্রাকালে উপদেশ প্রদান করলেন,

- “যে স্থানে হারিস বিন উমায়েরকে শহীদ করা হয়েছে সেখানে উপস্থিত হয়ে তথাকার অধিবাসীগণের নিকট প্রথমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে।
- যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সেটাই হবে উত্তম। অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে।
- আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।
- সাবধান! অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না, আমানতের খেয়ানত করো না।
- শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, এবং গীর্জায় অবস্থানের পুরোহিতদের হত্যা করো না।
- খেজুর কিংবা অন্য কোন গাছ কাটবে না এবং
- বাড়ীঘর ও দালান কোঠা ধ্বংস করো না।”[২৬৪]

এছাড়া বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে এসছে, “রাসূলুল্লাহ যুদ্ধক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।”[২৬৫]

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আবু সুফিয়ানের প্রতি মহানুভবতা: মক্কায় কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ছিল ইসলামের ভয়ানক শত্রু। ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রকারীদের বড় হোতা। তাঁর

---

[২৬৪] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী , প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ৩২৭

«اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغيروا، ولا تقتلوا وليدا وليدا ولا امرأة، ولا كبيرا فانيا، ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، ولا تهدموا بناء»

[২৬৫] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাবু কাতলুন নিসা ফিল হারবি, খ. ৪র্থ, পৃ. ৬১

«فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»

প্ররোচনাতেই বদর, উহুদ ও খন্দকের মত বড় বড় যুদ্ধ সংগঠিত হয়, অনেক প্রাণহানি ঘটে। আল্লাহর দীনের এই ঘোর শত্রুর প্রতি মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মহানুভবতা দেখিয়েছেন, তা অতুলনীয়। তাঁর এই মহত্বে অভিভূত হয়েই যে ব্যক্তি ছিল কট্টর দুশমন সেই ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর একনিষ্ঠ গোলাম হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে শুধু ক্ষমাই করলেন না বরং তাঁর ঘরে আশ্রিত মক্কাবাসীদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে তাঁকে সম্মানিতও করলেন।[২৬৬]

৬ষ্ঠ হিজরীতে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধের শর্তে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে হুদাইবিয়া সন্ধি সাক্ষরিত হয়। কুরাইশরা তাদের মিত্র বনু বকরের সাথে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের মিত্র বনু খোযায়ার উপর আক্রমণ করে হুদাইবিয়া সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৮ম হিজরীর রমজান মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় দশ হাজার মুসলমানের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। মক্কাবাসীরা যেন কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে না পারে এজন্যে তিনি এ সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখেন। এদিকে সন্ধির শর্ত ভঙ্গা করে মক্কার কুরাইশরা এর পরিণাম ভেবে অজানা আশংকায় দিনাতিপাত করতে থাকে। কারণ তখন মুসলমানরা আর দুর্বল নেই, বরং তাদের শক্তি ক্রমশঃ বর্ধমান। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধি ভঙ্গের কারণে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন আল্লাহর ইচ্ছায় কুরাইশরাও তার কোন সংবাদ না পেয়ে অত্যন্ত ভীত ও আতংকিত হয়ে যায়। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মক্কার বাইরে এসে মুসলমানদের খবর নেয়ার চেষ্টা করে। এসময় যাত্রাপথে মুসলমানরা মাররায যাহরান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলে আব্বাস (রা.) কুরাইশদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কায় প্রবেশের আগেই তাঁর নিকট এসে ক্ষমা প্রার্থনা করার পরামর্শ দিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি আতংকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে পেয়ে নিজে নিরাপত্তা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নিয়ে গেলেন। উমর বিন খাত্তাব (রা.) ইসলামের এ শত্রুকে দেখে তাকে হত্যার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুমতি দেয়ার জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন। কিন্তু দয়ার সাগর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শত্রু তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেরিয়েছে তাকে বাগে পেয়েও হত্যা করলেন না বরং তাকে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশের জন্য সময় দিলেন। আব্বাস (রা.) কে বললেন তাকে পরদিন সকালে নিয়ে আসতে । ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, "পরদিন সকালে এই মহাপাপী আবু সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে আনা হল। কোমল হৃদয় মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি করুণায় বিগলিত হয়ে উঠলেন। তার পাপের

[২৬৬] আবু দাউদ সুলাইমান, *সুনানে আবি দাউদ*, (বৈরুত : আল মাকতাবাতুল আসারিয়্যাহ, তা.বি.), বাব মা জাআ ফি খাবরি মাক্কাহ, খ. ৩য়, পৃ. ১৬২, হাদীস নং ৩০২১

জন্য তিনি মর্মবেদনা অনুভব করলেন। তাকে দেখে তিনি বললেন, হে আবু সুফিয়ান! তোমার ওপর দুঃখ হচ্ছে এজন্যে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ মহাসত্য বোঝার সময়কি এখনো তোমার হয়নি? আবু সুফিয়ান বললো, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি যে কত সহনশীল, কত সম্মানিত এবং স্বজন রক্ষক তা আমি বুঝে নিয়েছি। আমি এ কথাও বুঝেছি যে, যদি অন্য কোন মাবুদ থাকত তাহলে এতদিন তা আমার কাজে আসত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ,আবু সুফিয়ান! তোমার জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। এখনো কি তোমার বুঝবার সময় আসেনি যে, আমি সত্যই আল্লাহর রাসূল? আবু সুফিয়ান বললো! আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক। আপনি কতইনা ধৈর্যশীল, কতইনা দয়ালু ও আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনকারী। কিন্তু ওই ব্যাপারে এখনো কিছু না কিছু সংশয়তো আছেই। এসময় আব্বাস (রা.) বললেন, ‘ওহে শোন! তোমার গর্দান কেটে ফেলার আগেই ইসলাম কবুল করে নাও এবং এ কথা স্বীকার করো যে, আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।’ আব্বাস (রা.) এর এ কথার প্রেক্ষিতে আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করলেন। অন্য একটি হাদীসে এসেছে, আব্বাস (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান সম্মান প্রিয়, তাই তাঁকে কোন সম্মান প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে আশ্রিত হবে এবং যে নিজ ঘরের দরজা ভেতর হতে বন্ধ করে নেবে সে আশ্রিত হবে এবং মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে সেও আশ্রিত হবে।”[২৬৭]

মক্কা বিজয় : বিধর্মীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা: আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস (রা.) কে নির্দেশ দিলেন যে, আবু সুফিয়ানকে উপত্যকার সংকীর্ণ স্থানের ওপর পর্বত প্রান্তে থামিয়ে রাখবে যাতে সেপথ দিয়ে যাতায়াতকারী আল্লাহর সৈনিকদের সে নিজ চোখে দেখতে পারে। নির্দেশ মোতাবেক আব্বাস (রা.) তাঁকে নিয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে প্রত্যেক গোত্রের সৈন্যরা নিজ নিজ পতাকা বহন করে মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এত সৈন্যবাহিনী দেখে আবু সুফিয়ান মক্কার কুরাইশদের চিন্তায় ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠছিলেন। তাঁর আশংকা হচ্ছিল মুসলিম সেনাবাহিনীর দ্বারা আজ মক্কাবাসী হয়তো ধ্বংসই হয়ে

---

[২৬৭] আবুল ক্বাসেম সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ আত ত্বাবারানী, *আল মু’আজামুল কাবীর*, (কায়রো : মাকতাবাতু ইব্‌ন তাইমিয়াহ, ১৯৯৪ খ্রী.), বাব সখর বিন হারব বিন উমাইয়া বিন ‘আবদিশ শামস বিন আবদি মানাফ, খ. ৮ম, পৃ. ৯

فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟» قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ، وَاللهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ غَيْرُهُ لَقَدْ أَغْنَى عَنِّي شَيْئًا قَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ هَذِهِ، وَاللهِ كَانَ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى الْآنَ. قَالَ الْعَبَّاسُ: وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَسْلِمْ، وَاشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَبْلَ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُكَ، قَالَ: فَشَهِدَ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ وَأَسْلَمَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا قَالَ: «نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ»

Dhaka University Institutional Repository

যাবে। কারণ আজ মুসলিমরা তাদের প্রতি করা অতীত অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে এমন অবস্থায় যে, আজ কুরাইশদের তাঁদের মোকাবিলা করার কোন সামর্থ্য নেই। কিন্তু মানবতার কল্যাণকামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিনে আবু সুফিয়ানের এই আশংকাকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তাঁর হৃদয়ের বিশালতার পরিচয় দিলেন। যে মক্কাবাসী কাফির মুশরিকরা তাঁকে তাঁর জন্মভূমিতে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার অপরাধে একটি দিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। তাঁর ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের ওপর পরিচালনা করেছে অত্যাচারের খড়গ। তাদেরকে বাধ্য করেছে নিজেদের পরিবার পরিজন, সহায় সম্পদ ত্যাগ করে দেশান্তরী হতে। তাদেরকে তাদের অপরাধের শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে তিনি সেদিনকে ঘোষণা করলেন ক্ষমার দিন হিসেবে। কোন রকম ধড় পাকড় নয়, বরং তিনি ঘোষণা করলেন সাধারণ ক্ষমা। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, "মক্কায় প্রবেশ কালে আনসার বাহিনীর পতাকাধারী সাদ ইব্‌ন উবাদা আবু সুফিয়ানকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে আবু সুফিয়ান! আজ ভীষণ সংঘর্ষের দিন। আজ কাবা প্রাঙ্গণে হত্যাকাণ্ড বৈধ বলে বিবেচিত হবে। আবু সুফিয়ান বললেন, 'হে আব্বাস! যুদ্ধের দিনটি অধিক প্রিয়। অতঃপর একটি দল আসল যেটি ছিল অন্যদের তুলনায় ছোট। তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাহিনীর পতাকা ছিল যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম এর হাতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবু সুফিয়ান(রা.) কে অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি বললেন, আপনি কি শোনেননি সাদ ইব্‌ন উবাদা কি বলেছে? তিনি বললেন, এরূপ। অতঃপর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সাদের কথা সত্য নয়, আজ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কাবার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবেন। আজ পবিত্র কাবায় ক্ষমা করার দিন।"[২৬৮]

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতি তৈরীর আহবান: জাহেলিয়া যুগ ছিল সাম্প্রদায়িকতার যুগ। সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করেই তখন সকল বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হত। একবার কোন কারণে যুদ্ধ হলে তা বংশানুক্রমে চলতে থাকতো, সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পে ধ্বংস হত নিরীহ মানুষের জীবন ও সম্পদ। এছাড়া তখন সমাজে আভিজাত্য ও কৌলীন্যের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা হত। এই কৌলীন্য ও অভিজাততন্ত্রের প্রচণ্ড চাপে দুনিয়ার বহু নরনারী নিস্পেষিত হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় করে সকল অনাচার অত্যাচার ও অবিচারের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। কৌলীন্য প্রথা, অভিজাততন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ

---

[২৬৮] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাব আইনা রাক্কাযান নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খ. ৫ম, পৃ. ১৪৬, হাদীস নং- ৪২৮০
فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، اليَوْمَ يَوْمُ المَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الكَعْبَةُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ، ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةٌ، وَهِيَ أَقَلُّ الكَتَائِبِ، فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ: «مَا قَالَ؟» قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ»

Dhaka University Institutional Repository

সাধনে মানুষে মানুষে সাম্যের ঘোষণা দিয়ে বললেন, সকল মানুষ এক আদমের সন্তান হিসেবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। পবিত্র কাবা গৃহের প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করে ঘোষণা দিলেন,

"আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোনই শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি এককভাবেই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রাখ, আল্লাহর ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানোর সম্মান ছাড়া সমস্ত সম্মান অথবা পূর্ণতা অথবা রক্ত প্রবাহিত করা আমার এই দুই পদতলে থাকলো। স্মরণ রেখ ভুল বশতঃ হত্যা, যা লাঠি দ্বারা হয়ে থাকে তা ইচ্ছাকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য শোণিতপাতের খেসারত দিতে হবে। অর্থাৎ একশত উট দিতে হবে যার মধ্যে চল্লিশটি হবে গর্ভবতী।"[২৬৯] এছাড়া সুনানে তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, তিনি আরো বলেছেন, "হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়াত যুগের অহংকার এবং পূর্ব পুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম (আ.) এর সন্তান এবং তিনি ছিলেন মাটির তৈরী। এরপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্র তৈরী করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।"[২৭০]

নিন্দা বর্জন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট বছর পর বিনা বাঁধায় বিপুল পরাক্রমের সাথে স্বদেশে ফিরে কাবা প্রাঙ্গণে কি করছেন তা দেখার জন্য উৎসুক কুরাইশগণ জড়ো হয়েছিল, তিনি তাদের প্রতি সম্প্রীতির আহবান জানিয়ে দেয়া অভিভাষণ শেষ করে তাদের দিকে

---

[২৬৯] আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, *প্রাগুক্ত*, বাব হাদীসু রাজুল, খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৮

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: يَعْقُوبُ بْنُ أَوْسٍ . عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ . وَقَالَ مَرَّةً: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ . فَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدَّعَى، وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ، أَوْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ . قَالَ خَالِدٌ: أَوْ قَالَ: قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ . قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

[২৭০] আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা, *সুনানে তিরমিযী*, (মিসর : শিরকাতু মাকতাবাতু ওয়া মাতবা'আতু মুসত্বফা আল বাবিল হালবী, ১৯৭৫খ্রী.), বাব মিন সুরাতিল হুজরাত, খ. ৫ম, পৃ. ৩৪৯

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ ، قَالَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} "[الحجرات: 13]

Dhaka University Institutional Repository

তাকালেন। দেখলেন এক সময় যাদের দম্ভ, দর্প ও আস্ফালনে মক্কার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হত, পবিত্র ইসলামের মূলোৎপাটনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল, যারা অশ্লীল ভাষায় তাঁকে গালাগালি করত, যারা ইসলাম থেকে তাঁকে ও তাঁর সাহাবীগণকে বিরত রাখতে শারীরিক মানসিক সব রকম অত্যাচার নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত করত, তারা সবাই আজ তাঁর সামনে মাথা নীচু করে বসে আছে। আজ তাঁর সামনে সময় এসেছে প্রতিশোধ নেবার। মিথ্যার ঝংকারকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার। বিরোধীদের সকল অপকর্মের যথাযথ জবাব দেবার। মক্কার কাফির মুশরিকরা তাই তাদের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ দূরাবস্থার সংবাদ শোনার জন্যে ব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করছে । কিন্তু মহানুভব মহাপুরুষ মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি অপূর্ব করুণা দেখালেন। এহেন শত্রুর প্রতি কোন ঘৃণা নেই, নিন্দা নেই, অভিযোগ নেই, ইসলাম গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগ নেই বরং বিনা শর্তে ক্ষমা ও মুক্তির বাণী তিনি শোনালেন। তিনি প্রমাণ করলেন বিজয়ী সেনাপতি হয়েও ধ্বংস বিভীষিকা ছাড়াই শুধুমাত্র মানবের প্রতি ভালবাসা ও ক্ষমার দ্বারা চরম শত্রুকেও পরম বন্ধুতে পরিণত করা যায়। তৈরী করা যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। নাসাঈর বর্ণনা থেকে জানা যায়, "তিনি কাবা প্রাঙ্গণে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে বললেন, হে কুরাইশগণ! তোমাদের কি ধারণা? তোমাদের সাথে আমি কীরূপ ব্যবহার করব বলে মনে করছ? সবাই বলল: খুব ভাল। আপনি সদয় ভাই এবং সদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। যদিও আমরা অপরাধী, তবু আপনার নিকট আমরা সদ্ব্যবহার পাওয়ার আশা রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, আমি তোমাদের সঙ্গে ঠিক সে কথাই বলছি, যা ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের সাথে বলেছিলেন,

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"আজ তোমাদের ওপর কোন নিন্দা নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়াশীলদের চেয়েও দয়ালু।" অর্থাৎ আজ তোমাদের সকলকে মুক্তি দেয়া হল।"[২৭১]

মক্কা বিজয়ের ক্ষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চরম শত্রুদেরকে নিজ গুণে ক্ষমা করে দিয়েছেন এমনকি নিন্দা পর্যন্ত করেননি। এমনি আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইব্‌ন আব্বাস বর্ণিত হাদীস থেকে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন তখন আবু সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন 'আব্দুল মুত্তালিব ও 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবি উমাইয়্যা তাঁকে পেল। তারা তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হল। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমাকে তাদের কথা বলা হলে তিনি বললেন: 'হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার চাচাতো ভাই ও ফুফাতো ভাই এসেছে। তিনি বললেন: ওদের দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

---

[২৭১] আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইব্‌ন শুয়াইব আন নাসায়ী, *সুনানুল কুব্‌রা*, (বৈরুত : মু'অসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রী.), বাব ক্বাওলুহ তা'আলা: জাআল হাক্কু ও যাহাক্বাল বাতিলু, খ. ১০ম, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং-১১২৩৪

ثُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَا تَقُولُونَ؟» قَالُوا: نَقُولُ: ابْنُ أَخٍ، وَابْنُ عَمٍّ رَحِيمٌ كَرِيمٌ، ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: " فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِي يُوسُفُ: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [يوسف: 92

Dhaka University Institutional Repository

আমার চাচাতো ভাই তো আমাকে অপমান করেছে এবং আমার ফুফাতো ভাই তো মক্কায় অবস্থানকালে আমার চরম বিরোধিতা করেছে। তারা উভয়ে যখন এ খবর পেল তখন আবু সুফিয়ান যার সাথে তার ছেলেও ছিল সে বললো, আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে সাক্ষাত করার সুযোগ না দেন তাহলে আমি আমার এই ছেলে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে একদিকে চলে যাবো এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ধুঁকে ধুঁকে মরবো। এ সংবাদ শুনে তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হৃদয় বিগলিত হলো। তিনি তাদের অনুমতি দিলেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন।”[২৭২]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শত্রুর প্রতি উদারতা পোষণ সম্পর্কিত আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)। তিনি বলেন, “মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খালফ, আবু সুফিয়ান ইব্ন হারব ও হারিস ইব্ন হিশামকে ডেকে পাঠালেন। উমর (রা.) বলেন, আমি আপন মনে বললাম আজ আল্লাহ তা‘আলা আমাকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দান ও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দান করবেন। কেননা, স্পষ্টতই এরা যুদ্ধবন্দী। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে হত্যা করাবেন এবং আমার দ্বারাই এ কাজ করাবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় বললেন, এখন আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ হযরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মতো। এজন্য আমি তাই বলবো যা ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, কাজেই তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ক্ষমা করুন। উমর (রা.) বলেন, (তাঁর এই উদারতা দেখে) আমি লজ্জায় নতমুখ হয়ে গেলাম।”[২৭৩] অর্থাৎ তিনি যেখানে প্রতিশোধ নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আনন্দ উল্লাস করছেন, সেখানে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আজীবনের দুশমনদেরকে ক্ষমার সুসংবাদ শোনাচ্ছেন। নিন্দা করা বর্জন করছেন।

---

[২৭২] আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ আত ত্ববারনী, *মু‘অজামুল কাবীর*, (কায়রো : মাকতাবাতু ইব্ন তাইমিয়াহ, ১৯৯৪ খ্রী.), বাব সখর বিন হরব বিন উমাইয়া বিন আবদুশ শামস বিন আবদি মানাফ, খ. ৮ম, পৃ. ৯, হাদীস নং. ৭২৬৪

وَقَدْ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَدْ لَقِيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَالْتَمَسَا الدُّخُولَ عَلَيْهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهِمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ عَمِّكَ وَابْنُ عَمَّتِكَ وَصِهْرُكَ. قَالَ: «لَا حَاجَةَ لِي بِهِمَا، أَمَّا ابْنُ عَمِّي فَهَتَكَ عِرْضِي، وَأَمَّا ابْنُ عَمَّتِي وَصِهْرِي، فَهُوَ الَّذِي قَالَ لِي بِمَكَّةَ مَا قَالَ» . فَلَمَّا أَخْرَجَ إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ، وَمَعَ أَبِي سُفْيَانَ بُنَيٌّ لَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَيَأْذَنَنَّ لِي أَوْ لَآخُذَنَّ بِيَدِ ابْنَيَّ هَذَا، ثُمَّ لَنَذْهَبَنَّ فِي الْأَرْضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطَشًا وَجُوعًا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَقَّ لَهُمَا، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا وَأَسْلَمَا

[২৭৩] জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবি বকর আস সুয়ুতী, *জামি‘উল হাদীস*, বাব মুসনাদু উমর ইব্ন খাত্তাব, খ. ২৬, পৃ. ৪৩৯, হাদীস নং. ২৯৪১৯

عن الزهرى عن بعض آل عمر عن عمر بن الخطاب: أنه قال: لما كان يوم الفتح ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – بمكة أرسل إلى صفوان ابن أمية وإلى أبى سفيان بن حرب وإلى الحارث بن هشام قال عمر: فقلت قد أمكن الله منهم لأعرفنهم بما صنعوا حتى قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: مثلى ومثلكم كما قال يوسف لإخوته: (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) قال عمر: فانفضحت حياء من رسول الله – صلى الله عليه وسلم

মুশরিক নেতাকে ক্ষমা ও আশ্রয়ের প্রতীক স্বরূপ নিজ পাগড়ী প্রদান:
বদর যুদ্ধে নিহত উমাইয়া ইব্‌ন খালফের ছেলে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া, যে ছিল উহুদের যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার পেছনে ইন্ধনদাতাদের একজন। এ ব্যক্তি উমায়ের আল জুমাহী নামক এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠিয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে। তার অন্তর ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ছিল বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। আল্লাহর শত্রু কুরাইশদের এই বড় নেতা মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের সংবাদে জীবন ভয়ে জেদ্দা হয়ে ইয়েমেনের দিকে পলায়ন করেছিল। উমায়ের বিন ওহাব জুমাহী যিনি মুসলমান হয়েছিলেন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। দয়ার সাগর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হীন ব্যক্তিকে শুধু আশ্রয়ই প্রদান করলেন না বরং মক্কায় ফিরে আসার পথে তাকে যেন কেউ উত্যক্ত না করে, তার জীবন হরণ না করে এজন্যে তিনি আশ্রয়ের প্রতীক স্বরূপ তাঁর নিজ পাগড়ী প্রদান করেন যা তিনি মক্কায় প্রবেশকালে নিজ মাথায় বেঁধে রেখেছিলেন।[২৭৪] শুধু তাই নয় এই নিকৃষ্ট শত্রুর সাথে তিনি আরো উদার ব্যবহার করেছেন। এই উদ্ধত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয় লাভ করেও তার অতীত কার্যাবলীর জন্য অনুতপ্ত হয়নি, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেনি বরং তাঁর কাছে আরো দু'মাস সময় চেয়েছে। আর মহানুভব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে, তাকে হত্যার নির্দেশ না দিয়ে দুমাসের স্থলে চার মাস সময় দিলেন যেন সে ইসলামের মর্মবানী উপলব্ধি করে তা গ্রহণ করার সুযোগ লাভে ধন্য হয়। তার ইহকাল ও পরকালে মুক্তি লাভের উপায় হয়।[২৭৫]

হামজা (রা.) এর কলিজা চর্বণকারী হিন্দার প্রতি ক্ষমা: মক্কা বিজয়কালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মানুষে মানুষে শান্তি ও সম্প্রীতি তৈরীর জন্য চরম সংযম অবলম্বনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হিন্দার ক্ষেত্রে। উহুদ যুদ্ধ শেষে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হামজা (রা.) এর লাশের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা যে গর্হিত আচরণ করেছিল তা স্মরণ করলে মানব মন শিহরে উঠে। সে তাঁর কলিজা চর্বণ করেছিল। তাঁর নাক, কান কেটে মালা বানিয়ে গলায় পরেছিল। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন । এ কারণে মক্কা বিজয়ের পর তিনি যখন লোকদের বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন তখন হিন্দা বেশভূষার পরিবর্তন সহকারে মুখ ঢেকে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় উপস্থিত হয় যেন তাকে চেনা না যায় ।
তাফসীরে মাদারেকের উদ্ধৃতি দিয়ে সাফিউর রহমান বলেন, হিন্দাকে চিনতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃদু হাসলেন এবং বললেন 'তুমিই হিন্দা।' হিন্দা বলল, 'হে

[২৭৪] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ৩৪৬
[২৭৫] আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল আলামিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রী.), বাব মান ক্বালা: লা খানফাসিখুন নিকাহি বাইনাহুমা বি ইসলাম, খ. ৭, পৃ. ৩০২, হাদীস নং-১৪০৬৩

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমিই হিন্দা । অতীতে যা কিছু হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে দিন।’ নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।’[২৭৬]

বন্দীদের উপঢৌকন: রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বময় সম্প্রীতি তৈরীর জন্য অনুপম অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি সকল মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে আদমের সন্তান হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এজন্যে একে অপরের প্রতি মায়া মমতা, সহানুভুতি সহমর্মিতা থাকা প্রয়োজন। মানবাধিকারের ভাষ্যকার মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের সাথে সর্বোচ্চ ভাল ব্যবহার করেছেন। মুসলমানগণ নিজেরা উপবাস করে বন্দীদেরকে খাইয়েছেন। অসহায় বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করেছেন। এমনকি তিনি বন্দীদের মুক্তি দিয়ে তাদেরকে সাথে উপহার উপঢৌকনও দিয়েছেন। রাহীকুল মাখতুমের বর্ণনা সুত্রে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাওয়াযিন ও বনু তামীম গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়ার সময় প্রত্যেক বন্দীকে একটি করে কিবতী চাদরসহ উত্তম উপঢৌকন প্রদান করে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন।[২৭৭] আরো শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বনু তা্ঈ গোত্রের সাফিনাহ বিনতে হাতিম এর মুক্তিদান কালে। এই মহিলা যুদ্ধবন্দীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মুক্তি দিলেন না বরং তার নিরাপত্তার কথা ভেবে তাকে মসজিদে নববীর পাশে আশ্রয় দিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাকে নিরাপদে তার আপনজনদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে না পারলেন ততদিন পর্যন্ত তাকে নিরাপত্তা দিলেন। এরপর যখন তার গোত্রের কাফেলাকে পেলেন তখন তিনি তাকে স্বসম্মানে তাদের সাথে তার ভাই আদীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং সাথে সওয়ারী ও পাথেয় প্রদান করলেন। মুসনাদে আহমদে আদী ইব্ন হাতিম এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমার পিতা মারা গিয়েছেন এবং তত্ত্বাবধায়ক নিখোঁজ হয়েছেন। আর আমি অক্ষম বৃদ্ধা। এমতাবস্থায় আমার ওপর অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ আপনার ওপর অনুগ্রহ করবেন। তিনি বললেন, কে তোমার

---

[২৭৬] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত, খ. ১ম , পৃ. ৩৪৮

وفي المدارك «1» : روي أن النبي صلّى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء، وهو على الصفا، وعمر قاعد أسفل منه، يبايعهن بأمره، ويبلغهن عنه، فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يعرفها، لما صنعت بحمزة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:

أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا، فبايع عمر النساء على أن لا يشركن بالله شيئا. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: ولا تسرفن. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هنات؟ فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال، فضحك رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعرفها، فقال: وإنك لهند؟ قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبي الله، عفا الله عنك.

[২৭৭] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী , প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড , পৃ. ৩৬৮

তত্ত্বাবধায়ক? সে বলল, আদী ইব্‌ন হাতিম । রাসূলুল্লাহ বললেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে পালিয়েছে সে?"[২৭৮]

মুসায়লামার ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে ধৈর্যধারণঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের শেষ দিকে ইয়ামামাতে মুসায়লামা নামক এক ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করে। সে প্রচার করতে থাকে যে আল্লাহ তাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়তে অংশীদার বানিয়েছেন। তার নবুওয়্যাতের প্রমাণ স্বরূপ সে বানিয়ে বানিয়ে কিছু ছন্দবদ্ধ কথাও প্রচার করতে থাকে। এছাড়া সে তার অনুসারীদের জন্য মদপান ও ব্যভিচার হালাল বলে ঘোষণা করে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে। এমনকি সে এর পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আগত বনু হানীফা গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে এসে তাঁর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে। এরপর সে তার এলাকায় গিয়ে মানুষকে ইসলাম বিমুখ করতে থাকে। শুধু তাই নয় সে আত্মম্ভরিতার সাথে একটি পত্র লিখে দু'জন দূতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে প্রেরণ করে সে লিখল, "আমি নবুওয়তের ব্যাপারে আপনার শরীক। তাই অর্ধেক দেশ আমার আর অপর অর্ধেক কুরইশদের জন্য। কিন্তু কুরাইশরা সীমালংঘনকারী লোক।" তার ব্যাপারে তিনি চরম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। তার দূতগণও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে চরম ধৃষ্টতা দেখালো। ইসলামের মূল আকীদার পরিপন্থী মত প্রকাশ করলো। কিন্তু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি কোন আক্রমণাত্মক বা প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ধৈর্য্য ধারণ করলেন। সুনানে আবু দাউদ এ বর্ণিত আছে,"যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসায়লামার চিঠি পড়া শেষ করে পত্রবাহকদের বললেন, তোমরা দু'জন কী বল? তারা বলল: আমাদের বক্তব্য তাই যা এই পত্রে আছে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, যদি দূতদেরকে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা না থাকতো তবে আমি অবশ্যই এদের দুজনের গর্দান কেটে ফেলতাম।"[২৭৯]

পরমত পোষণকারীর প্রতি এমনই ছিল তাঁর উদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের শত্রুদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। আর মুসায়লামা ইয়ামামার যুদ্ধে করুণ পরিণতির শিকার হয়েছিল।

---

[২৭৮] আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, (বৈরুত : মু'সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রী.), বাব বাকীয়্যুতু হাদীসি আদী ইব্‌ন হাতিম, খ. ৩২, পৃ. ১২৩ হাদীস নং ১৯৩৮১

يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: جَاءَتْ خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ، قَالَ: رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا بِعَقْرَبٍ، فَأَخَذُوا عَمَّتِي وَنَاسًا، قَالَ: فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَصَفُّوا لَهُ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَأَى الْوَافِدُ، وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ، وَأَنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، مَا بِي مِنْ خِدْمَةٍ، فَمُنَّ عَلَيَّ، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ. قَالَ: «مَنْ وَافِدُكِ؟» قَالَتْ: عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ. قَالَ: «الَّذِي فَرَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟»

[২৭৯] আবু দাউদ সুলাইমান, প্রাগুক্ত, বাব ফির রসূল, খ. ৩য় , পৃ. ৮৩, হাদীস নং ২৭৬১

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: «مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا؟» قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ. قَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا

Dhaka University Institutional Repository

মৃত অমুসলিমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন: ইসলাম প্রচারক নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমদের সাথে উদার মানবিক আচরণ করেছেন। মানুষ হিসেবে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। ব্যক্তি ইহুদী হোক অথবা খ্রীষ্টান হোক কিংবা মুশরিক হোক তিনি কখনো তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করেননি। তাদের সাথে সর্বদা শুভ আচরণ করেছেন। এমনকি মৃত অমুসলিমদের প্রতিও তিনি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। যেমন, সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, “জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দাঁড়ালেন এবং আমরাও দাঁড়ালাম। অতঃপর বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! এটি তো একজন ইহুদীর জানাযা। তিনি বললেন, তোমরা কোন জানাযা বহন করে নিয়ে যেতে দেখলে দাঁড়াবে।”[২৮০]
অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা মুশরিকও হয় তবুও তাকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে তিনি নির্দেশ দিলেন।

নাজরানের খ্রীষ্টানদেরকে প্রদত্ত অধিকারসমূহ: মক্কা হতে ইয়েমেনের দিকে যেতে সাত দিনের দূরত্বে নাজরান নামক স্থানে খ্রীষ্টানদের একটি বড় জনপদ ছিল। এখানে এক লক্ষ যোদ্ধা পুরুষ ছিল। ৯ম হিজরী সনে এ অঞ্চলের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত করে। তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ না করে পাল্টা ‘ঈসা (আ.) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আল্লাহ তা‘আলা অহীর মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সন্ধিচুক্তি প্রস্তাব করে। তাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তিনি তাদের জন্য একটি চুক্তি লিপিবদ্ধ করেন। চুক্তিটি হল,

> “দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে। আল্লাহ্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে নাজরানের প্রধান পাদ্রী আবুল হারিস, নাজরানের অন্যান্য পাদ্রী, তাদের পুরোহিত, তাদের অনুসরণকারী ও রাহিবগণের প্রতি এই চুক্তি.... তাদের জন্যই থাকবে কম-বেশী যা কিছুই তাদের হাতে আছে তা সবই, তাদের উপসনালয়, মন্দির ও রাহেব কেন্দ্র ও আচরণ। তারা আল্লাহ্র রাসূলের প্রতিবেশী, কোন পাদরী তার পাদরিত্ব থেকে, কোন রাহেবকে তার বৈরাগ্য থেকে এবং পুরোহিতকে তাদের পৌরহিত্য থেকে বদলানো হবে না, তাদের কোন অধিকার প্রত্যাখ্যান করা হবে না, তাদের আধিপত্য ও

---

[২৮০] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাব মান ক্বামা লিজানাযাতি ইয়াহুদি,খ. ২য়, পৃ. ৪৮, হাদীস নং- ১৩১১
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ، فَقُومُوا»

Dhaka University Institutional Repository

> কর্তৃত্ব বদলানো যাবে না, তাদের উপর ধার্য রয়েছে, যে নীতিতে তারা চলছে, তাতেও কোন পরিবর্তন আনা হবে না-যতক্ষণ তারা কল্যাণ কামনা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবে, তাদের উপর কোন যুলম চাপানো হবে না, তাদেরকে যুলমকারী হতে দেয়া হবে না।"[২৮১]

এ চুক্তিতে সুস্পষ্ট ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের খ্রীষ্টানদেরকে কিছু অধিকার প্রদান করেন। যেমন-

প্রথমত, **উপসনালয়ের নিরাপত্তা প্রদান:** অর্থাৎ তাদের গির্জা, মন্দির, রাহেব কেন্দ্র ইত্যাদি তাদের হাতেই থাকবে। মুসলমানরা এগুলোর কোন রূপ ক্ষতি সাধন করবে না।

দ্বিতীয়ত**, স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার:** নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে এ খ্রীষ্টান জাতির নিরাপত্তার জামিনদার হয়ে তাদের স্ব ধর্ম শান্তিপূর্ণ ভাবে পালনের অধিকার দেন।

তৃতীয়ত, **পূর্ব নেতৃত্ব বহাল :** এ চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে যাদের হাতে এ জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল, তিনি এ ক্ষমতা তাদের হাতেই অক্ষুণ্ন রাখেন।

চতুর্থত, **যুলম থেকে পরিত্রাণ :** তিনি ঘোষণা দেন যে, তাদের প্রতি কোন অত্যাচার নির্যাতন চাপানো হবে না এবং তাদেরকে অত্যাচারী হতে বাঁধা দেয়া হবে।

এ চুক্তিপত্র ছাড়াও খ্রীষ্টানদের প্রতি একটি সুদীর্ঘ চুক্তিনামার উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে নিম্নরূপ:

> "পরম অনুগ্রহশীল আল্লাহ্‌র নামে- তাঁরই সাহায্য সহকারে: এটা মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সমস্ত মানুষের সাথে চুক্তিনামা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারীরূপে নিযুক্ত। আল্লাহ্‌র আমানতের আমানতদার তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যেন জনগণ রাসূল আগমণের পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন যুক্তি পেশ করতে না পারে। আর আল্লাহ্ তো মহা পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞানী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই চুক্তিনামা লিখেছেন তাঁর সময় মিল্লাতের লোকদের জন্য, পূর্ব ও পশ্চিম এলাকায় বসবাসকারী খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী লোকদের জন্য। তার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী, তাদের স্বভাষাভাষী, তাদের কম বাকপটু, তাদের পরিচিত অপরিচিত সব মানুষের জন্য। এই লেখাটি মূলত তাদের সঙ্গে কৃত এক চুক্তিনামা ও ওয়াদাপত্র। এই ওয়াদা যে ভঙ্গ করবে, তার বিরোধিতা করবে, এতে যে আদেশ দেয়া আছে যে তার বিপরীত কাজ করবে, সে আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা-চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাঁর দ্বীনের প্রতি অপমান ও বিদ্রূপ করেছে, এজন্য সে লা'নতে পড়ার যোগ্য হয়েছে, শাসন কর্তৃপক্ষ হোক

[২৮১] ইব্‌ন কাসীর, প্রাগুক্ত, খ. ৫ম, পৃ. ৬৭

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم من محمد النَّبِيِّ للأسقف أبي الحارث وأساقفة نَجْرَانَ وَكَهَنَتِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ من قليل وكثير جِوَارُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يُغَيَّرُ أُسْقُفٌّ مِنْ أُسْقُفَّتِهِ وَلَا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانِيَّتِهِ، وَلَا كَاهِنٌ مِنْ كَهَانَتِهِ، وَلَا يُغَيَّرُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ، ولا سلطانهم ولا ما كانوا عليه من ذلك، جوار الله ورسوله أبداً ما أصلحوا ونصحوا عليهم غير مبتلين بِظُلْمٍ وَلَا ظَالِمِينَ

বা মু'মিন মুসলিমের মধ্য থেকে কেউ হোক। কোন রাহিব বা সাধক পাহাড়ে, উপত্যকায়, গুহায়, সভ্য এলাকায়, প্রস্তরময়, বালুকাময়, কুটিরবাসী, মন্দির যেই হোক-না-কেন, আমি-ই তাদের সকলের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্রবীভূত হব, তাদের সংখ্যকের জন্য, আমি নিজে এবং আমার সহায়তাকারী আমার মিল্লাতের ও আমার অনুসরণকারী লোক। ওরা যেন আমার রক্ষণাবেক্ষণ অধীন, আমার দায়িত্বভুক্ত, চুক্তিবদ্ধ লোকেরা খারাজ ইত্যাদির যে বোঝা বহন করে, সেই কষ্টদায়ক অবস্থা তাদের থেকে আমি দূর করব, তবে তারা যা খুশী হয়ে দেবে তাই গ্রহণ করব, তাদের উপর কোন জোর খাটাব না, কোন ব্যাপারেই তাদের উপর জবরদস্তি করা হবে না। কোন পাদ্রীকে তার পদ থেকে বিচ্যুত করা হবে না, কোন রাহিবকে তার বৈরাগ্য থেকে বিরত করা হবে না, কোন ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিকে তার ধর্ম কেন্দ্র থেকে বহিস্কৃত করা হবে না, কোন বাউলকে তার বাউলী কাজ থেকে ফিরানো হবে না, তাদের গির্জা, মন্দির, ধর্ম কেন্দ্রকে ধ্বংস করা হবে না, তাদের গির্জা বা ধর্মকেন্দ্রের কোন জিনিস মসজিদ নির্মাণে ব্যবহার করা হবে না, মুসলমানদের ঘর-বাড়ি নির্মাণে ব্যবহার করা হবে না। যদি তা কেউ করে, তবে সে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতিই ভঙ্গ করল, তার রাসূলের বিরোধিতা করল। রাহিব, পাদ্রী, পুরোহিত ও অন্যান্য ধরনের উপাসনাকারীদের উপর কোন জিযিয়া বা জরিমানা ধার্য হবে না। তারা যেখানেই বাস করুক, স্থলভাগে বা নদী-সমুদ্রে, পূর্বে বা পশ্চিমে, উত্তরে বা দক্ষিণে- তাদের সকলের দায়িত্ব আমি পালন করব, সংরক্ষণ করব। তারা সকলেই আমার যিম্মায়, আমার চুক্তিতে এবং সকল প্রকার অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে পূর্ণ নিরাপত্তায় থাকবে।

অনুরূপভাবে যারা পাহাড়-পর্বতে, অন্যান্য পবিত্র স্থানে ইবাদতে এককভাবে রত হয়ে আছে, তারা চাষাবাদ করলেও তাদের উপর 'উশর বা খারাজ ধার্য হবে না। তাদের বিলাসবহুল জীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের সাথে সহযোগিতা করা হবে, যুদ্ধে যেতে তাদের বাধ্য করা হবে না, জিযিয়া বা খারাজ দিতেও বাধ্য করা হবে না। ধনশালী, জমি-জায়গার মালিক ও ব্যবসায়ীদেরকে প্রতি বছর মাত্র বারো দিরহাম দিতে বলা হবে। কারো উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হবে না, তাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করা হবে না, শুধু উত্তম ও যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তাই বলা হবে। তাদের জন্য দয়ার বাহু বিছিয়ে দেয়া হবে, তারা যেখানেই ও যে অবস্থায়ই তাদের জন্য দয়ার বাহু বিছিয়ে দেয়া হবে, তারা যেখানেই ও যে অবস্থায়ই থাকুক, সব রকমের খারাপ আচরণ থেকে তাদের রক্ষা করা হবে।

মুসলমানদের নিকট কোন খ্রীষ্টান বসবাস করলে সে তা-ই দেবে, যা দিতে সে রাযী হবে। তাকে তার উপসনালয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখা হবে এবং তার ও তার ধর্মীয় নিয়ম-নীতি পালনের মাঝে কোন আড়াল দাঁড়াতে দেয়া হবে না।

যে লোক আল্লাহ্‌র এই চুক্তির বিরোধিতা করবে, এর বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, সে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুতির নাফরমানী করল। তাদের উপাসনালয় মেরামতে তাদের সাহায্য করা হবে, এটা হবে তাদের ধর্ম পালনের ব্যাপারে তাদের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতা। তা করা হবে চুক্তি পরিপূরণ স্বরূপ। তাদেরকে অস্ত্র বহনে বাধ্য করা হবে না, মুসলমানরাই তাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। কিয়ামত কায়েম হওয়া ও এই দুনিয়ার নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা এই চুক্তিকে রক্ষা করবে, এর বিরোধিতা করবে না।”[২৮২]

আবুল হারিস ইব্‌ন আলকামাকে প্রদত্ত চুক্তিপত্রে উল্লেখিত চারটি অধিকার ছাড়াও এই চুক্তিপত্রে আরো অনেক অধিকার খ্রীষ্টানদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদান করেন। যেমন,

- খ্রীষ্টানদের নিরাপত্তার জিম্মা গ্রহণ
- ধর্ম পালনের অধিকার
- জোর জবরদস্তি নিষিদ্ধ
- অমুসলিমের ধর্ম কেন্দ্রের পূর্ণ নিরাপত্তা
- যুদ্ধের বাধ্যবাধকতা হ্রাস
- জিযিয়া ও খারাজ আদায়ের ব্যাপারে নমনীয়তা অবলম্বন
- কলহ বিবাদ নিষিদ্ধ
- ধর্ম পালনে সহযোগিতা; প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা
- তাদের জীবনের নিরাপত্তা

জীবনের নিরাপত্তা প্রদানঃ মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আরো নিষ্কণ্টক ভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। এ সময় দলে দলে লোকেরা ইসলামে প্রবিষ্ট হতে থাকে। আর যারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়নি তারাও তাঁর কাছে এসে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে আগ্রহী হয়। তিনিও তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত করেন। জিজিয়ার বিনিময়ে তাদের ওপর কোন প্রকার আগ্রাসন না করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদি কোন রূপ হস্তক্ষেপ না করে সম্প্রীতি রক্ষার প্রতিজ্ঞা করেন। যেমন, তিনি তাবুক অভিযানে বের হলে রোমান সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ‘আইলা’ নামক স্থানের অধিপতি ইউহান্না ইব্‌ন রুবা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যে লিখিত দলীল দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ হল,

---

[২৮২] উদ্ধৃত,মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনের রাষ্ট্র ও সরকার*, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রী.), পৃ. ৩০৮-৩১০

Dhaka University Institutional Repository

> "পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। এটি নিরাপত্তা পত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল নবী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে ইউহান্না ইব্ন রুবা ও ইয়েমেন অধিবাসীদের জন্য। স্থল ও জলভাগে তাদের জাহাজে নৌকা ও অন্যান্য যানবাহন চলবে। ওদের জন্য আল্লাহর যিম্মা রয়েছে, রয়েছে নবী মুহাম্মাদের যিম্মা। আর সিরিয়া, ইয়েমেন ও সমুদ্র এলাকার এবং তাদের সঙ্গী- সাথী লোকগণও এই যিম্মাদারীর অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি তাদের মধ্য থেকে কোন দুর্ঘটনা ঘটায় তাহলে তাদের ধন সম্পদ তাদের জীবন প্রাণের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না; তা উত্তম উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে যা লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করবে। তারা জল-পথে যেখানে উপস্থিত হবে, সেখানেই চলাচল করতে নিষেধ করা কারোর জন্য হালাল হবে না, এমনিভাবে স্থল ও জলপথে যেখানেই তারা উপস্থিত হবে, তাদের চলাচলে কোনরূপ বাঁধা দেয়া হবে না।"[২৮৩]

এই লিখিত চুক্তিপত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত অঞ্চলসমূহের অমুসলিমদেরকে সর্বাবস্থা ও সর্বক্ষণের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা দিলেন। তাদের জীবন যাপন এবং সম্পদের পরিপূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নিলেন।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে অমুসলিমের জান মালের নিরাপত্তার অধিকার দিয়েছেন। তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক , সামাজিক ও নাগরিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করেছেন । তাদের জীবনের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে অন্যায়ভাবে অমুসলিমদের হত্যা করার পথ বন্ধ করে দিয়ে তিনি বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি কোন মু'আহিদ (যিম্মী) কে হত্যা করে তবে জান্নাতের ঘ্রাণও সে পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।"[২৮৪]

এছাড়া ইব্ন 'আব্বাস বর্ণিত হাদীসে এসেছে, "তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর সেনাবাহিনীকে কোন অভিযানে পাঠাতেন তখন বলতেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে বের হও। আল্লাহর পথে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো, প্রতারণা করো না, তাদের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দিয়োনা, শিশুদেরকে এবং গীর্জার অনুসারীদের হত্যা করো না ।"[২৮৫]

---

[২৮৩] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাসীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, দারুল ফিকরি, ১৯৮৬ইং, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬

وَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ أَتَاهُ يُحَنَّةُ بْنُ رُؤْبَةَ صَاحِبُ أَيْلَةَ فَصَالَحَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ، وَأَتَاهُ أَهْلُ جَرْبَاءَ وأذرح وأعطوه الْجِزْيَةَ، وَكَتَبَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا فهو عندهم، وكتب لِيُحَنَّةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ أَمَنَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِيُحَنَّةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ سُفُنِهِمْ وَسَيَّارَتِهِمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ الْبَحْرِ، فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ حَدَثًا فَإِنَّهُ لَا يَحُولُ مَالُهُ دُونَ نَفْسِهِ، وَإِنَّهُ طَيِّبٌ لِمَنْ أَخَذَهُ من الناس، وأنه لا يحل أن يمنعوا مَاءً يَرِدُونَهُ وَلَا طَرِيقًا يَرِدُونَهُ مِنْ بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ.

[২৮৪] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাবু ইছমু মান ক্বাতালা মু'আহিদান বিগাইরি জারাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৯, হাদীস নং ৩১৬৬

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

[২৮৫] ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত, বাব মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬১, হাদীস নং- ২৭২৮

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: " اخْرُجُوا بِسْمِ اللهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ "

Dhaka University Institutional Repository

অধিকন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমের প্রাণের মর্যাদা একজন মুসলিমের প্রাণের মর্যাদার সমান বলেছেন। এ কারণেই একজন অমুসলিম নাগরিকের দিয়াত একজন মুসলিম নাগরিকের দিয়াত বা রক্তপণের সমান নির্ধারণ করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় ‘আমর ইব্‌ন উমাইয়া নামক এক ব্যক্তি আমির গোত্রীয় দুজন মু‘আহিদকে অনিচ্ছাকৃত হত্যা করলে তিনি তাদের রক্তপণ মুসলমানদের সমান প্রদান করতে আদেশ দেন।[২৮৬]

জোর জবরদস্তির উপর নিষেধাজ্ঞা: ইসলামে ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরে বিশ্বাস ও বাহ্যিক আমলের সমন্বয় হলেই একজন ব্যক্তিকে মুসলিম বলে গণ্য করে নেয়া হয়। অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে, জোর জবরদস্তি করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হলে এ তিনটি বিষয়ের সন্নিবেশ তার মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাই ইসলাম গ্রহণ সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্তির অন্তরের পরিবর্তনের বিষয়। তাই ইসলাম কোন ব্যক্তির উপর, তার চিন্তার ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে রাজী নয়। ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ব্যক্তির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এজন্যে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন ব্যক্তির নিকট থেকে জোর জবরদস্তি করে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, “আল্লাহ আমাকে প্রচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে শক্তি প্রদর্শনের জন্য পাঠাননি। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণে কোন চাপ প্রয়োগ নেই, জোর জবরদস্তি নেই।”[২৮৭] এটি ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও আগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এজন্যেই তিনি অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন প্রজ্ঞা, কৌশল ও সদাচারণের মাধ্যমে। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,“তোমরা দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা থেকে বেঁচে থাক।”

কলহ না করা: ধর্ম ও বর্ণের বিভিন্নতার কারণে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুগে যুগে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, সংঘাত ও দাঙ্গা। নিরীহ মানুষের জীবন সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধর্মের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক উস্কানি থেকে বিরত থাকতে উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানিয়ে বলেছেন, “দীনের ব্যাপারে তোমরা কলহ ও ঝগড়া-বিবাদ করো না।”[২৮৮]

---

[২৮৬] সম্পদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০), পৃ. ৫৬৭

[২৮৭] ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, বাব ওয়া মিন সুরাতিত তাহরীম, খ. ৫ম, পৃ. ৪২০, হাদীস নং-৩৩১৮

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بَعَثَنِي اللَّهُ مُبَلِّغًا وَلَمْ يَبْعَثْنِي مُتَعَنِّتًا

[২৮৮] আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আদ দারিমী, *মুসনাদুদ দারিমী*, (দারুল মুগনী লিন নশর ওয়াত তাওযী‘অ, সৌদী ‘আরব, ২০০০ইং), বাব মান ক্বালা:আল ‘ইলমুখ খাশিয়্যাতু ওয়া তাক্বওয়া আল্লাহ, খ. ১ম, পৃ. ৩৪১, হাদীস নং-৩১০

إِيَّاكَ وَالْخُصُومَةَ وَالْجِدَالَ فِي الدِّينِ

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মর্যাদা: ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনার অনেক উর্ধ্বে। পর মত-নির্বিশেষে সদাচরণের মধ্যেই ব্যক্তির ইবাদাত গ্রহণযোগ্যতা পায়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান? আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবীগণ বললেন, যার কোন অর্থ সম্পদ নেই সে আমাদের মধ্যে গরীব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,"আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি হবে সে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদাতসহ আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে; এদেরকে তার নেক আমলসমূহ দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিগুলো পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"[২৮৯]

অর্থাৎ যারা উদার মন মানসিকতা নিয়ে মানুষের সাথে ভালো আচরণ করে না তারা ইসলামের দৃষ্টিতে নিঃস্ব, অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্থ। এভাবে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরীর প্রেরণা যুগিয়েছেন।

উগ্র জাতীয়তাবাদ নিষিদ্ধ: ভূ-খণ্ড, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেছে। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়। তাই বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উগ্র, ক্ষতিকর, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী জাতীয়তাবাদকে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, "আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং দল থেকে পৃথক হয়ে যায় অতঃপর সে মারা গেলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু অর্জন করলো। যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অন্ধভাবে জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ করে অথবা জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করে অথবা জাতীয়তাবাদের সাহায্য করে অতঃপর নিহত হয়। তাঁর মৃত্যু জাহেলিয়্যাতের উপর হবে। যে ব্যক্তি কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করে সে আমাদের কেউ নয় এবং আমিও তার কেউ নই।"[২৯০]

---

২৮৯ ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাব তাহরীমুজ জুলমি, খ ৪র্থ, পৃ. ১৯৯৭, হাদীস নং-২৫৮১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّار

২৯০ আহমদ ইব্‌ন হুসাইন আল বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, লেবানন, ২০০৩ খ্রী.), বাব আত তারগীবু ফি লুযুমিল জামা'আতি ওয়াত তাশদীদু 'আলা, খ. ৮ম , পৃ. ২৭০, হাদীস নং-১৬৬১১

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা: বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন “আমি সাক্ষী সকল বান্দা পরস্পর ভাই ভাই।”[২৯১] সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের অনুভূতি ও চেতনা জাগ্রত থাকলে মানুষ সাম্প্রদায়িক চিন্তা থেকে বিরত থাকতে পারে। এক ভাই যেমন অন্য ভাই এর প্রতি সহনশীল হয় তেমনি এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একে অপরের প্রতি, অন্য মতের প্রতি, অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীল ও সদাচরণ করতে সক্ষম হয়।

পারস্পরিক সম্প্রীতি নবুওয়তি বৈশিষ্ট্য: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি উদার হবে পৃথিবীর সকল মানুষকে ভালোবাসবে, তাদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখবে সে যেন নবুওয়তের অংশ পেল। ‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস আল মুযান্বি থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “উত্তম পন্থা অবলম্বন, পারস্পরিক সম্প্রীতি নবুওয়্যাতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।”[২৯২]
এভাবে তিনি মানুষের প্রতি ভালোবাসা তৈরীর উৎসাহ দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার তাগিদ করেছেন।

অমুসলিমদেরকে কর্মচারী নিয়োগ: মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনে অমুসলিমদের সাথে পারস্পরিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করেছেন। নিজে তাদের প্রয়োজনে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আবার নিজে প্রয়োজন পূরণে কখনো কখনো তাদের কাছ থেকেও সহযোগিতা নিয়েছেন। তাদেরকে শ্রমিক হিসেবেও নিয়োগ দিয়েছেন। অমুসলিম বলে অবজ্ঞা না করে বরং মানুষ হিসেবে সদ্ব্যবহার করে সম্মান দেখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন থেকে আয়েশা (রা.) এ রকম একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর (রা.) (হিজরতের সময়) বনু দীল ও বনু আব্‌দ ইব্‌ন আদী গোত্রের একজন বিচক্ষণ পথ প্রদর্শককে শ্রমিক নিয়োগ করেন। সে লোকটি আস ইব্‌ন ওয়াইলের বংশধরদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং কাফের কুরাইশদের মতাবলম্বী ছিল। তাঁরা দুজন তার

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً , وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ , أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ , أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ , وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا , لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا , وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا , فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ "

২৯১ আবু দাউদ সুলাইমান, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল বিতর, খ. ২য়, পৃ. ৮৩ , হাদীস নং-১৫০৮

أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ

২৯২ ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, বাব মা জাআ ফিত তা’নী ওয়াল ‘আজাল্লা, খ. ৪র্থ, পৃ. ৩৬৬

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْتُ الحَسَنُ، وَالتُّؤَدَةُ وَالاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

Dhaka University Institutional Repository

উপর আস্থা রেখে নিজ নিজ সওয়ারী তাকে সমর্পণ করলেন এবং তিন রাত পর সাওর পর্বতের গুহায় নিয়ে যাবার জন্য বলে দিলেন। সে তিন রাত পর সকাল বেলা তাঁদের সওয়ারী নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হল। তারপর তাঁরা দু'জন রওয়ানা করলেন। তাঁদের সাথে ছিল আমের ইব্ন ফুহাইরা ও দীল গোত্রের একজন পথপ্রদর্শক। সে তাঁদেরকে তীরের পথ ধরে নিয়ে গেল।"[২৯৩]

অমুসলিমদের মধ্যে যারা বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে পেরেছে ইসলামী সমাজে তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও মূল্যায়ন করেছেন। বনি খুযা'আ গোত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশ্বাসভাজন ছিল বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ভার অর্পণ করেছিলেন। তাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যেই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা অভিযান করেন, আর বনি খুযা'আর সমস্ত লোক এই অভিযানে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে শরীক হয়।[২৯৪]

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সাথে সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেছেন।

অমুসলিমদেরকে প্রতিনিধি নির্ধারণ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী 'আব্দুর রহমান বিন 'আউফ হিজরতের পর মক্কায় তার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মক্কার কুরাইশ নেতা উমাইয়া ইব্ন খালফকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। ইমাম বুখারী 'মুসলমানের পক্ষে কোন অমুসলিমকে মুসলিম দেশে কিংবা অমুসলিম দেশে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েজ' নামক অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেন,"আব্দুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ইব্ন খালফের সঙ্গে এই মর্মে একটি চুক্তিতে উপনীত হলাম যে, সে মক্কায় আমার মাল-আসবাবের রক্ষণাবেক্ষণ করবে আর আমি মদীনায় তার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবো।"[২৯৫]

---

[২৯৩] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ইজারাহ, খ. ৩য়, পৃ. ৮৮

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا – الخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ – قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ، فَارْتَحَلاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ "

[২৯৪] মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, (ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, এপ্রিল, ২০০৯ খ্রী.), পৃ. ৪৬৭

[২৯৫] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ওকালাহ, খ. ৩য়, পৃ. ৮৮

كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا، بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةَ، وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَةِ

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রহমান বিন ‘আউফ কর্তৃক এ কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা না থাকায় বুঝা যায় তিনি অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের প্রতিনিধি নিয়োগ করার বৈধতা অনুমোদন করেছেন।

অমুসলিমদের সাথে ভাগচাষ করা: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমদের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেনেও অংশগ্রহণ করেছেন। তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করতে কুণ্ঠিত হননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক খায়বর বিজয়ের পর খায়বরের জমি গণিমাত হিসেবে মুসলমানরা লাভ করেন। কিন্তু মানবতার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বসতভিটা ও জমি থেকে উচ্ছেদ না করে তাদের প্রতি ইহসান করেন। তাদের জমি তাদের তত্ত্বাবধানেই ফিরিয়ে দেন। ইমাম বুখারী ইব্‌ন উমর থেকে বর্ণনা করেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের জমি ইহুদীদেরকে এই শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে শ্রম বিনিয়োগ করে কৃষিকাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ তারা পাবে।”[২৯৬]

নিজ বর্ম বন্ধক রাখা: মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমদের সাথে যে সব লেনদেন করেছেন সেগুলোর মধ্যে তাঁর নিজ বর্ম বন্ধক রাখার উদাহরণও পাওয়া যায়। যেমন “আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে কিছু খাদ্যদ্রব্য খরিদ করে নিজের লৌহবর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।”[২৯৭]

এভাবে তিনি অন্য মতের মানুষের সাথে মিলে মিশে সমাজে বসবাস করেছেন এবং পর ধর্ম মতের ব্যক্তিদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুসরণীয় আদর্শকে সকল মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন।

বিধর্মীদের সাথে উপহার বিনিময়: উপহার আদান প্রদান মানুষের মাঝে ভালবাসা, সম্প্রীতি, ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করে। এজন্যেই মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা পরস্পর উপহার আদান প্রদান করো। এটি তোমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি করবে।”

তিনি অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সাথেও উপহার আদান প্রদান করেছেন। এমন অনেক উদাহরণ তাঁর বাস্তব জীবনে পাওয়া যায়। যেমন, তিনি ইহুদীদের দেয়া উপহার গ্রহণ করেছিলেন বলেই

---

[২৯৬] প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুয়ারা‘আহ, খ. ৩য়, পৃ. ১০৫

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا»

[২৯৭] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুর রিহ্‌ন, খ. ৩য়, পৃ. ১৪২

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Dhaka University Institutional Repository

খায়বরের ইহুদী মহিলা তাঁকে বিষ মিশ্রিত খাদ্য খাওয়াতে সক্ষম হয়েছিল। ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থে 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা' নামক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন, "আবু হুরাইরা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহীম (আ.) তাঁর স্ত্রী সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করে এমন একটি জনপদে উপনীত হলেন সেখানে একজন বাদশাহ বা অত্যাচারী লোক ছিল। সে বলল, তাঁকে (সারাকে) উপহার হিসেবে আজারা (হাজেরা) কে দান করে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি (রান্নাকৃত) বিষাক্ত বকরী উপহার দেয়া হয়েছিল। আবু হুমায়েদ বর্ণনা করেছেন, আইলার মালিক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একখানা চাদর দিয়েছিলেন এবং সেখানকার শাসক হিসেবে সনদ লিখে দিয়েছিলেন।"[২৯৮]

বিধর্মী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সাথে উপহার বিনিময়ের বৈধতার আরো একটি প্রমাণ সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবদুর রহমান ইব্ন আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আমরা একশ ত্রিশজন লোক ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কারো কাছে কোন খাবার আছে কি? দেখা গেল এক ব্যক্তির সাথে এক সা অথবা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য (আটা) আছে। রুটি তৈরী করার জন্য আটা গোলানো হল। এ সময় দীর্ঘকায় অবিন্যস্ত চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক ব্যক্তি এক পাল বকরী নিয়ে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বিক্রি করবে না উপহার দেবে অথবা দান করবে ? সে বললো, না আমি এগুলো বিক্রয় করব। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট থেকে একটি বকরী কিনে নিলেন এবং সেটিকে জবেহ করা হল।"[২৯৯]

এছাড়া তিনি যে সব অমুসলিম দেশে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত প্রেরণ করেছিলেন তখন সেখানকার শাসকদের জন্য উপহারও প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের পাঠানো উপহার গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে তিনি অমুসলিমদের সাথে সম্প্রীতি ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে জীবন যাপন করেছেন।

---

[২৯৮] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল হিবাতু ওয়া ফাদুলিহা ওয়া তাহরীদু আলাইহা, খ. ৩য়, পৃ. ১৬৩
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ، فَقَالَ: أَعْطُوهَا آجَرَ " وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ

[২৯৯] *প্রাগুক্ত*
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟»، فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ، مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً، أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً؟ "، قَالَ: لاَ بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ،

Dhaka University Institutional Repository

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অমুসলিমের কবিতা শ্রবণঃ চরমপন্থীরা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। তাদের মতামতকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য জ্ঞান করে। এমনকি তাদের লিখিত পুস্তকাদি পড়াকে পাপের কাজ মনে করে। কিন্তু উদারতার প্রতীক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্রে এরকম কোন হীনমন্য বৈশিষ্ট্য স্থান পায়নি। বরং তিনি সকল সুন্দর ও ভালো বিষয়ের মর্যাদা দিতে জানতেন। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমাইয়া ইব্ন সালতের মত একজন মুশরিকের কবিতা শুনতেও আগ্রহী ছিলেন। কারণ তার কবিতার বিষয়বস্তু ও বর্ণনা ভঙ্গি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। সাহাবী শারীদ আছ ছাকাফী (রা.) থেকে বর্ণিত, “তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এর পেছনে (সম্ভবত উটের পিঠে) আরোহী ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি বললেন, তোমার কি উমাইয়া ইব্ন সালতের কবিতা জানা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আবৃত্তি কর। আমি একটা আবৃত্তি করলে তিনি বললেন, আরো শুনাও। এমনি করে আমি একশটি কবিতা/শ্লোক আবৃত্তি করলাম।”[৩০০]

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, “কবিতা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, এ ব্যক্তির জিহ্বা ঈমান এনেছে কিন্তু তার অন্তর কুফরী করেছে।”[৩০১]

সহজ আচরণের নির্দেশঃ মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম, অমুসলিম সবার সাথে জটিলতা পরিত্যাগ করে সহজ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সব সময় কামনা করেছেন সমাজের শান্তি ও শৃংখলা। তিনি জীবনভর চেয়েছেন মানুষ যেন সকল বিভেদ, হানা-হানি, মারা-মারি, কলহ-বিবাদকে ভূলুণ্ঠিত করে সম্প্রতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এজন্যেই তিনি মু‘আয বিন জাবাল (রা.) কে যখন ইয়েমেনের শাসক হিসেবে প্রেরণ করছিলেন তখন তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি তৈরীর আদেশই অনুরণিত হয়েছে। যেমন, “সাঈদ ইব্ন আবু বুরদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার দাদা আবু মূসা ও মু‘আয (রা.) কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন। এ সময় তিনি বলেন, তোমরা লোকজনের সাথে সহজ আচরণ করবে। কখনো কঠিন আচরণ করবে না। মানুষের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। কখনো তাদের মনে অনীহা সৃষ্টি করবে না। একে অপরকে মেনে চলবে এবং বিভেদ তৈরী করবে না।”[৩০২]

---

৩০০ ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, কিতাবুশ শি‘র, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৭৬৭

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هِيهْ» فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهْ» ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: «هِيهْ» حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ

৩০১ প্রাগুক্ত

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ: فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ

৩০২ ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী, খ. ৪র্থ, পৃ. ৬৫

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى اليَمَنِ قَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا»

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হারাম: দয়ার সাগর, মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন অসহায়ের সহায়। অবলা নারী ও অবুঝ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করেছেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের নারী ও শিশুদের প্রতিও তাঁর ছিল সমান করুনা। 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন।"[৩০৩]

শত্রুর মোকাবেলায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ: মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামরিক নীতিও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার কথাই বলে। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি কখনো শত্রুপক্ষেরও ক্ষতি চাননি। সব সময় অহেতুক রক্তপাতকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন। এমনকি শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার বাসনা করাও তাঁর কাছে ছিল অপছন্দনীয়। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে শত্রুর মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে ইচ্ছে পোষণ করবে না। আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে তখন ধৈর্য ধারণ করবে।"[৩০৪]

এছাড়া অন্য বর্ণনাতে এসেছে, "আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবু আওয়ফাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হওয়ার সময় 'উমার ইব্‌ন উবায়দুল্লাহকে একটি পত্র লিখেন। শত্রুর সঙ্গে কোনো এক মুখোমুখি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'হে মানুষেরা! তোমরা শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করার কামনা করবে না এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে নিরাপত্তার দু'আ করবে। অতঃপর যখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হবে তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে।"[৩০৫]

---

[৩০৩] প্রাগুক্ত, বাবু ক্বাতলুন নিসাঈ ও ওয়াস সিবয়ান, খ. ৪র্থ, পৃ. ৬১
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»

[৩০৪] প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, খ. ৪র্থ, পৃ. ৬৩
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا»

[৩০৫] প্রাগুক্ত
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ»

বিদায় হজ্জের ভাষণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঘোষণা: দশম হিজরীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ পালন করেন। এটি ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ্জ। তাই হজ্জ পালন কালে বিশ্ব মুসলিমের সমবেত সভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সন্নিবেশ করেন। হাদীসের সিহাহ্ সিত্তাহ ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে ঐ বক্তৃতার বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত আছে। এগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি হজ্জ উপলক্ষে তিনবার বক্তৃতা প্রদান করেছেন। ৯ যিলহজ্জ শুক্রবার দিন আরাফাতে, ১০ যিলহজ্জ শনিবার দিন মিনাতে, তৎপর ১১ যিলহজ্জ রবিবার দিন অথবা ১২ যিলহজ্জ সোমবার দিনও তিনি একটি ভাষণ প্রদান করেছিলেন। হজ্জের এই ভাষণসমূহে বিশ্বময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য দিক নির্দেশনা ও আহবান ছিল।

তৎকালীন বিশ্বে জাতিভেদ, জাত্যাভিমান, উঁচু নিচুর পার্থক্য ও ছোট বড়র তারতম্য ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। রাজার সামনে প্রজা, ধর্মগুরুর সামনে সাধারণ মানুষ, অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে নীচ বংশীয়গণ ছিল তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের পাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হজ্জের মাধ্যমে প্রথমে জাহেলী সমাজের এই নিয়ম পদ্ধতির বিলোপ সাধনে উদ্যোগী হন। এ লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কুরাইশগণ নিজেদের আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র প্রকাশার্থে সাধারণ জনগণের সাথে হজ্জের জন্য আরাফাতে না গিয়ে মুযদালিফায় অবস্থানের যে আত্মম্ভরিতা পূর্ণ কুপ্রথা মেনে চলত তার অপনোদন করেন। সকলের মধ্যে সমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কুরাইশ-অকুরাইশ নির্বিশেষে সকল হজ্জযাত্রীদেরকে নিয়ে আরাফাতের ময়দানে ৯ যিলহজ্জ তারিখে সমবেত হলেন। উপস্থিত জনতার সম্মুখে ঘোষণা দিলেন,“অন্ধযুগের সমস্ত নিয়ম কানুন আমার পদতলে পদদলিত।”[৩০৬]

পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি আহবান জানালেন, এক পিতামাতার সন্তান হিসেবে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে ধূলিস্যাৎ করতে হবে। তিনি এই ভাষণে সমস্ত জাতিভেদ ও অসাম্যের মাথায় কুঠারাঘাত করলেন । আবু নাদরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে আইয়ামে তাশরিকের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষণ শুনেছে সে আমাকে খবর দিয়েছে, তিনি বলেছেন, “হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু এক। তোমাদের পিতা এক। সাবধান! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কালো মানুষের উপর লাল মানুষের কিংবা লাল মানুষের উপর কালো মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যার মধ্যে আল্লাহভীতি আছে সেই শ্রেষ্ঠ।”[৩০৭]

---

৩০৬ ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাব হাজ্জাতুল নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খ. ২য়, পৃ. ৮৮৬
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ

৩০৭ ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত, হাদীসু রাজুলিন মিন আসহাবিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’, খ. ৩৮তম , পৃ. ৪৭৪

Dhaka University Institutional Repository

অধিকন্তু, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরীতে তিনি দাস শ্রেণীর সাথে করণীয় আচরণও শিক্ষা দেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের দাসগণ তোমাদেরই দাস। অতএব, তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খেতে দাও। তোমরা যেমন কাপড় পরিধান করো, তাদেরকে তদ্রূপ পরিধাণ করতে দাও।"[৩০৮]

এছাড়া জাহেলী যুগে আরবে আরো একটি জঘন্য কুপ্রথা ছিল যা তাদের মধ্যে সর্বক্ষণ সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে প্রজ্জ্বলিত রাখতো। কোন গোত্রের কোন ব্যক্তি অন্য গোত্রের কারো দ্বারা নিহত হলে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে তারা বংশগত কর্তব্য মনে করতো। এমনকি শত শত বৎসর অতীত হলেও তারা এই কর্তব্য পালনে বদ্ধপরিকর থাকতো। ফলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানা হানি, কাটা-কাটি, যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। মানবতার মুক্তির দূত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জঘন্য প্রথার মূলোৎপাটনে বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা দেন, "অন্ধযুগের সমস্ত খুন অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করা হল। আমি সর্বপ্রথম (আমার নিজ গোত্রের) রবী'আ ইব্ন হারিসের পুত্রের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল ঘোষণা করলাম। সে যখন বনী সা'আদ গোত্রে লালিত পালিত হচ্ছিল তখন হুযাইলের এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে।"[৩০৯]

বংশগত হানাহানি থেকে মানুষকে বিরত রাখতে তাঁর অবদান সম্পর্কে অন্য একটি বর্ণনাতে এসেছে, সুলাইমান ইব্ন আমর ইব্ন আহওয়াস বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলেন। তিনি বলেছেন, "সাবধান! অপরাধীই নিজ অপরাধের জন্য দায়ী। পিতার অপরাধের জন্য পুত্র দায়ী নয় এবং পুত্রের অপরাধের জন্যও পিতা দায়ী নয়।"[৩১০]

এছাড়া যে বর্ণবাদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বড় অন্তরায়, মানুষের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কারণ তা রোধকল্পে বললেন,"নাক কাটা কালো হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

৩০৮ প্রাগুক্ত, বাব হাদীসু 'আবদির রহমান ইব্ন ইয়াযিদ 'আন আবিইহী 'আনিন নাবিয়্যি, খ. ২৬তম, পৃ. ৩৩৪

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ أَرِقَّاءَكُمْ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ،

৩০৯ ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, বাব হাজ্জাতুল নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খ. ২য়, পৃ. ৮৮৬

وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ

৩১০ ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত, বাব হাদীসু সুলাইমান ইব্ন আমর ইব্ন আহওয়াস 'আন আবিইহী, খ. ২৫, হাদীস নং ১৬৪০৯

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ،

নির্বাচন করা হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে তবে তোমরা তাঁর কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।"[৩১১]

সর্বোপরি বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার ঘোষণা দেন। কেননা, মানুষ শুধুমাত্র এগুলোর জন্যই বিবাদ বিসম্বাদে জড়ায়। তাই তিনি অন্যায় ভাবে কোন ব্যক্তির জীবন নাশ, সম্পদ হরণ ও ইজ্জত সম্ভ্রম লুণ্ঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আবু নাদরাহ বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (উপস্থিত জনতাকে) জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন দিন? তাঁরা বলল: পবিত্র দিন। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন, এটি কি মাস? তাঁরা উত্তর দিল: পবিত্র মাস। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন শহর? তারা বলল: পবিত্র শহর। তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের জীবন ও সম্পদ মর্যাদাপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানিনা তিনি তোমাদের সম্মান বলেছেন কি না) যেমন তোমাদের এই পবিত্র শহরে, এই পবিত্র মাসে আজকের দিনটি যেমন পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ।"[৩১২] এরপর তিনি সমস্ত মানুষকে আখেরাতের জবাবদিহিতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব আমার পরলোক গমনের পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ো না। একে অপরের মুণ্ডুপাত করো না।"[৩১৩]

এভাবে জীবনের ক্রান্তিলগ্নে এসে বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে সকল প্রকার বিভেদের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অমুসলিমদের খাদ্য সম্পর্কে উদারতা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মন ছিল মানুষের প্রতি বিদ্বেষ মুক্ত। মানুষে মানুষে শ্রেণী বৈষম্য ছিল তাঁর অপছন্দনীয়। তিনি কোন মানুষকেই তুচ্ছ, অচ্ছুত ভাবতেন না। এমনকি তিনি মুসলমানদের জন্য অমুসলিমদের তৈরী খাদ্য খাওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। যেমন তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, কাবীসা ইব্ন হুল্ব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া

---

[৩১১] আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হাব্বান, *সহীহ ইব্ন হাব্বান*, বাব যিকরু আহাদিত তাখসীসাইনিল্লাযি য়াখসানু উমুমান তিলকা, (বৈরুত : মুসাসাতুর রিসালাত, ১৯৯৩ খ্রী.), ১০ খণ্ড, পৃ. ৪৪৭

«إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا»

[৩১২] ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত, হাদীসু রাজুলিন মিন আসহাবিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম', খ. ৩৮, পৃ. ৪৭৪, হাদীস নং- ২৩৪৮৯

" أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: " أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ "، قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: " فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ " . قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ: أَوْ أَعْرَاضَكُمْ، أَمْ لَا . كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَلَّغْتُ "،

[৩১৩] ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবা মান ক্বালা আল আদহা ইয়াযমুন নাহরি, খ. ৭ম, পৃ. ১০০, হাদীস নং ৫৫৫০

সাল্লামকে নাসারাদের তৈরী খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বলেন, কোন খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে তোমার মনে (অযথা) সন্দেহ ও দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয়। এ ধরনের অমূলক সংশয়ে পতিত হলে তুমি নাসারাদের মত হয়ে গেলে।[৩১৪]

আবু 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আদী ইবনে হাতিম (রা.) থেকেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে ইহূদী-নাসারাদের খাবার খাওয়ার অনুমতি আছে। ইহুদী-খ্রীষ্টানদের কেবল সেইসব খাবার আমাদের জন্য জায়েয যা আমাদের ধর্মমতে আমাদের জন্য হালাল। আমাদের জন্য হারাম এরূপ খাবার তাদের ধর্মমতে বৈধ হলেও তা তাদের ওখানে আমাদের জন্য বৈধ নয়। যেমন খ্রীষ্টান ধর্মমতে তাদের জন্য শূকর ও মদ বৈধ হলেও আমাদের ধর্মমতে তা হারাম। তাই তাদের ওখানে এসব খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করে দেখা যায়। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত প্রতীক। তিনি জীবনভর ধর্ম-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা করেছেন এবং তাঁর উম্মতদেরকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আদেশ, উপদেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাদের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। তিনি মুসলিম অমুসলিম সবার জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন তাদের সম্পদ সম্মান রক্ষায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে সকল শ্রেণীর নাগরিক মৌলিক অধিকারগুলো যথার্থ ভাবে উপভোগ করেছে। তিনি সবসময় সর্বক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সাম্যের বিধান আনয়ন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এক পিতা মাতার সন্তান হিসেবে মানুষের মাঝে সম্প্রীতি পূর্ণ সম্পর্ক থাকা আবশ্যক সে যে সম্প্রদায়ভুক্তই হোক না কেন। অন্য ধর্মমতের মানুষের প্রতি তিনি সবসময় উদার ও সহনশীল মনোভাব পোষণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণে কখনো কারো প্রতি চাপ প্রয়োগ করেননি। তাদের আচরণে ক্ষুদ্ধ ও দুঃখিত হলেও প্রতিশোধপরায়ন না হয়ে বরং তাদেরকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর উদারতা ও সহিষ্ণুতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে অসংখ্য মানুষ । এজন্যে বলা যায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবদান অনস্বীকার্য।

[৩১৪] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৫১১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় খুলাফায়ে রাশেদীনের অবদান

৪.১ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আবু বকর (রা.) এর ভূমিকা

আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলীফা। তিনি মাত্র দুবছর খিলাফাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। এমন কি খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের পূর্ব থেকেই তিনি অমুসলিমদের সাথে কোমল ও বিনম্র ছিলেন। নিম্নে এ সর্ম্পকে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা পেশ করা হল:

৪.১.১ বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সহমর্মিতা

আবু বকর (রা.) খেলাফত লাভের পূর্ব হতেই ভিন্ন ধর্মমত ও আদর্শের মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ করতেন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখতেন। তাদের সাথে কোমল আচরণ করা ছিল তাঁর স্বভাবজাত। তাঁর সহৃদয়তার এমনি একটি পরিচয় পাওয়া যায় বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর। এ সময় সত্তর জন কাফের ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল। এরা ছিল এমন ব্যক্তি যাদের হাতে মুসলমানগণ দীর্ঘ তের বছর যাবৎ নির্মমভাবে নির্যাতিত নিষ্পেষিত হয়েছিল। কাফেররা বন্দী হয়ে অত্যন্ত আতংকিত হয়ে পড়লো যে আজকে মুসলমানদের সামনে তাদের উপর অত্যাচার, অবিচার করার প্রতিশোধ নেয়ার সময় এসেছে। তাই তারা মুসলমানদের নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আবু বকর (রা.) কে ডেকে অনুনয় মিনতী করলো।[৩১৫]

এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে পরামর্শ সভার আহ্বান করলেন। এ বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হলে আবু বকর (রা.) মুক্তিপণের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার পক্ষে অভিমত দিলেন। উমর (রা.) তাদেরকে স্ব স্ব মুসলমান আত্মীয়ের দ্বারা হত্যার প্রস্তাব রাখলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর (রা.) এর মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। উমর (রা.) বর্ণনা করেন, "বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সত্তর জন নিহত হয়, এবং সত্তর জন বন্দী হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর (রা.), আলী (রা.), উমর (রা.) এর কাছে পরামর্শ চাইলে আবু বকর (রা.) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এরা সবাই আমাদের চাচাত ভাই, বংশীয় লোক এবং আত্মীয়। আমার মতে মুক্তিপণ হিসেবে কিছু কিছু অর্থ নিয়ে এদেরকে মুক্তি দেয়া উচিত। এতে আমাদের সাধারণ তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হবে। অপরদিকে অল্প দিনের মধ্যে এদের সবার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করাও সম্ভব হবে। তখন

---

[৩১৫] মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কল, *হযরত আবু বকর (রা.)*, অনুবাদ: এ.বি.এম.এ. খালেক মজুমদার, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১ খ্রী.), পৃ. ৫৭

তাদেরকে আমাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারব।"[৩১৬]

আবু বকর (রা.) এর এ প্রস্তাব ভিন্ন মতাদর্শের মানুষের প্রতি তাঁর প্রশস্ত ও কোমল হৃদয়ের পরিচায়ক। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, কঠোরতা নয় বরং করুণা প্রদর্শনের মাঝেই কাফেরদের পরাজয় নিহিত।

৪.১.২ খেলাফত প্রশ্নে সম্ভাব্য সংঘাত থেকে উত্তরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর মদীনার আনসার ও মুহাজিররা খেলাফত প্রশ্নে এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। কেননা, তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় নবুওয়্যাতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, সৈন্য বাহিনী পরিচালনা থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর অবর্তমানে এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন এ প্রশ্নে মুসলমানগণ সাকীফায়ে বনী সায়েদা নামক স্থানে পরামর্শের জন্য একত্রিত হন। এখানে মুহাজির ও আনসার উভয় দলই ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, অবদান বর্ণনা করে নিজেদেরকে খেলাফতের অধিকতর যোগ্য বলে দাবী করেন এবং অন্যদের সাথে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। প্রত্যেক দলই ইসলামে তাদের মর্যাদার অবস্থা উল্লেখ করে বক্তব্য দিয়ে একটি সংঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলেন। এমতাবস্থায় আবু বকর (রা.) তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিতার পরিচয় দিয়ে স্বভাব সুলভ ঠাণ্ডা মেজাজে পরিস্থিতিকে শান্ত করার জন্য বক্তব্য প্রদান করেন। এ বক্তব্যে তিনি উভয় দলের মর্যাদাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুহাজিরদের জন্য নেতৃত্ব এবং আনসারদের জন্য সহযোগিতা করার ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন,

"আরবদের জন্য নিজ পিতৃ পুরুষের দীন ত্যাগ করা ছিল খুব কঠিন কাজ। আর তারাও এ কাজের জন্য তৈরী ছিল না। এ সময় আল্লাহ রাসূলের জাতির প্রথম দিকের মুহাজিরদেরকে তাঁকে বিশ্বাস করা ও তাঁর উপর ঈমান আনার জন্য, তাঁর মন জোগানোর জন্য এবং নিজ জাতির নির্যাতন নিগ্রহ ধৈর্যের সাথে সহ্য করার জন্য শক্তি দান করলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর বিরোধী ছিল। তাঁর উপর অত্যাচারের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। নিষ্ঠুরতম শাস্তি তাঁকে দেয়া হতো। কিন্তু এরপরও স্বপক্ষীয় লোকের সংখ্যসল্পতা এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্য তাঁকে ভীত করেনি। এ মাটিতে এ মুহাজিররাই প্রথম ব্যক্তি, যাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার ও আল্লাহর খাঁটি বান্দা হবার সৌভাগ্য দান করা হয়েছে। তাঁরা রাসূলুল্লাহর প্রিয়জন,

---

[৩১৬] আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী ,*আর রাহীকুল মাখতুম*, (দামেশক : দারুল 'উসামা , ১৪৬৭ হি.) , পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয়-স্বজন। অতএব খিলাফতের দায়িত্বভার তাদেরই পাওনা। এ ব্যাপারে যালেমরাই শুধু মতভেদ করতে পারে।”

“তোমরা হে আনসারগণ! ওই লোক যাদের মর্যাদা দীন ও ইসলামে অনস্বীকার্য। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তাঁর দীন এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদদ যোগাবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে তোমাদের কাছে এসেছেন। তাঁর বেশীরভাগ পবিত্র স্ত্রী এবং সাহাবা তোমাদের মধ্য হতেই ছিল। প্রথম দিকের মুহাজিরদের পরেই তোমাদের স্থান। আর তোমাদের প্রাপ্য ওজারত। তোমাদের পরামর্শ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না। আর তোমাদের অংশ গ্রহণ ছাড়াও কোন কাজ সমাধান করা যাবে না।”[৩১৭] তাঁর এ বক্তব্যের পরও হাব্বাব বিন মুনজির আনসারী আনসারদেরকে এটি না মানার জন্য উসকানি দিলে উমর (রা.) ও তাঁর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এমন কি এক সময় তা সশস্ত্র সংঘর্ষের দিকে মোড় নিতে থাকে। এ সময় আবু ওবায়দা (রা.) এবং বশির বিন সায়াদের ভাষণের মাধ্যমে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হতে শুরু করলে আবু বকর (রা.) হাল ধরলেন। তিনি দেখলেন খেলাফতের ব্যাপারটি ফায়সালার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। অধিকাংশ আনসাররা খেলাফতের দাবী থেকে সরে এসেছে। এমতাবস্থায় তিনি সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী উমর বিন খাত্তাব (রা.) এবং আমীনুল উম্মাত হিসেবে খ্যাত আবু ওবায়দা (রা.) এর হাত ধরে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাকীফায়ে বনু সায়েদার উপস্থিত জনতাকে ঐক্যের আহবান জানালেন এবং অনৈক্যের পরিণাম সম্পর্কেও হুশিয়ারী উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি বললেন, “এ উমর (রা.) এবং আবু ওবায়দা (রা.) তোমাদের মধ্যে উপস্থিত। এদের যাকে ইচ্ছা তাঁরই হাতে তোমরা বাই‘আত গ্রহণ করো।”

তাঁর এই আহবান সবাইকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিল। ফলে কিংকর্তব্যবিমুঢ় জনতা বাই‘আত গ্রহণের জন্য আশার আলো পেয়ে চিন্তা করতে লাগলো। এমতাবস্থায় উমর (রা.) এ অবস্থাকে বেশীক্ষণ বিরাজমান না থাকতে দিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, “আবু বকর (রা.)! আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন।”

---

[৩১৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*, (বৈরুত: দারুত তুরাছ, তা.বি.), খ. ৩ , পৃ. ২১৯-২২০
فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم، فخص اللَّه المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه، والإيمان به، والمؤاساة لَهُ، والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم، وتكذيبهم إياهم، وكل الناس لهم مخالف، زار عليهم، فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم، وإجماع قومهم عليهم، فهم أول من عبد الله فِي الأرض وآمن بالله وبالرسول، وهم أولياؤه وعشيرته، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، ولا ينازعهم ذَلِكَ إلا ظالم، وأنتم يا معشر الأنصار، من لا ينكر فضلهم في الدين، ولا سابقتهم العظيمه في الاسلام، رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله، وجعل إليكم هجرته، وفيكم جلة أزواجه وأصحابه، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا احد بمنزلتكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفتاتون بمشورة، ولا نقضي دونكم الأمور.

তিনি হাত বাড়ালে উমর (রা.) সাথে সাথে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলেন। তাঁকে দেখে উপস্থিত সকলেই একে একে আবু বকর (রা.) কে খলীফা হিসেবে মেনে নিয়ে বাই'আত গ্রহণ করলো। এভাবে মুসলিম জাতি একটি সংঘাত থেকে রক্ষা পেল।

খলিফা নির্বাচিত হয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নীতি-নির্ধারণ সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন।

মূলতঃ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় সাকিফায়ে বনু সায়েদার এ বৈঠকের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আবু বকর (রা.) যদি বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার সাথে এ ঘটনার মোকাবিলা না করতেন তাহলে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মদীনাতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে যেত। এর মাধ্যমে তিনি আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হানাহানি ও বিবাদ-বিসম্বাদের সূত্রপাত হতে যাচ্ছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেন।

৪.১.৩ সহিষ্ণুতা

আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন স্বভাবগত ভাবে কোমল চরিত্রের অধিকারী। কিন্তু যখন কঠোরতা অবলম্বনের প্রয়োজন হত, তখন তিনি প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইস্পাতসম কঠিন হয়ে যেতেন। এমন চরিত্রের অধিকারী আবু বকর (রা.) অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সৌহার্দমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে চরম ক্রোধকেও দমিত রেখেছেন। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই মক্কা ও মদীনার ইহুদী, খ্রীষ্টান, কাফির ও মুশরিকরা সুযোগ পেলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অবমাননা করতে মরিয়া হয়ে উঠতো যা মুসলমানদের জন্য সহ্য করা কঠিন ছিল। কিন্তু আবু বকর (রা.) এরূপ অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েও চরম সহিষ্ণুতায় পরিচয় দিয়েছেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় কুরাইশদের প্রতিনিধি উরউয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল যে, 'আমি তোমার সাথে এমন কতকগুলো মুর্খ ও লম্পট দেখছি যারা কঠিন বিপদের সময় তোমাকে ছেড়ে পালাবে।' একথা শুনে আবু বকর (রা.) অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অমুসলিম ব্যক্তির প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে আত্মসংবরণ করলেন এবং কঠোর ভাষায় তার কথার প্রতিবাদ জানালেন। [৩১৮]

একদিন ফিনহাস নামক এক ইহুদী আলেমকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে পবিত্র কুর'আনের একটি আয়াতকে[৩১৯] কটাক্ষ করে মহান আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কথা

---

৩১৮ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহ*, কিতাবুশ শুরুত, (দারু তুওকীন নাজাত: ১৪২২হিজরী) ৩য় খণ্ড

৩১৯ পবিত্র কুর'আনের আয়াতটি হল, **مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً**
"এমন ব্যক্তি কেউ আছে কি, যে আল্লাহ তা'আলাকে কর্জে হাসানাহ প্রদান করবে? সে কর্জেও বিনিময়ে আল্লাহ তাকে বহুগুণে বর্ধিত করে দিবেন।"(সূরা বাকারাহ: ২৪৫)

বলে।[৩২০] তার কথা শুনে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে যান। কিন্তু সে অবস্থায়ও তিনি বিবেক বুদ্ধিলুপ্ত না হয়ে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন তা স্মরণ রেখেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কালাম নিয়ে ঠাট্টা করতে দেখে তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি ফিনহাসকে পূর্ণ শক্তিতে চপেটাঘাত করে বললেন, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যদি সন্ধিচুক্তি না থাকতো তাহলে আল্লাহর কসম আমি তোমার ঘাড়ই মটকিয়ে দিতাম।'

এখানে স্মর্তব্য যে, মানুষ রেগে গেলে অনেক সময় জ্ঞানহারা হয়ে প্রতিপক্ষের প্রাণও হরণ করে ফেলে কিন্তু আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ভিন্নমতের ব্যক্তিদের মারাত্মক কটুক্তি শুনেও চরম সংযম অবলম্বন করে মৌখিক প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ ছিলেন।

৪.১.৪ ধর্মত্যাগীদের প্রতি অনুকম্পা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিরোধানের পর এক নাজুক পরিস্থিতিতে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খেলাফত লাভ করেন। এ সময় তাঁকে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের মূলোচ্ছেদ, মুরতাদ ও যাকাত বিরোধীদের দমনের জন্য অনেক অভিযান প্রেরণ করতে হয়। এসব যুদ্ধের ময়দান হতে অগণিত শৃংঙ্খলবদ্ধ কয়েদীকে মদীনায় আনা হয়। আবু বকর (রা.) এ সমস্ত বন্দীদের সাথে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনরূপ কঠোর আচরণ করেননি। তাদের উপর প্রয়োগ করেননি অত্যাচার নির্যাতনের খড়গ। বরং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। দয়া পরবশ হয়ে তাদের চরম অপরাধগুলোকে মার্জনা করে দিয়েছেন। উতাইনা বিন হাসান এমন একজন ব্যক্তি যে ছিল মুসলমানদের নিকৃষ্টতম শত্রু। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর ইসলাম পরিত্যাগ করে বিদ্রোহ ঘোষণাকারীদের অন্যতম। এছাড়া সে ভণ্ডনবী তোলায়হার বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এ ব্যক্তি শৃংঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় বন্দী হয়ে এলে মদীনার ছেলেরা তাকে খেজুরের ডাল দিয়ে মারতো আর বলতো, 'হে আল্লাহর দুশমন। তুমিই কি ঈমান আনার পরও আবার কাফের হয়ে গেছো?' উতাইনা জবাব দিতো, আমি তো কখনো আল্লাহর উপর ঈমানই আনিনি।' তার এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনেও খলীফা আবু বকর (রা.) তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন ।[৩২১] এ সময় বনু আমের গোত্রের কোররা বিন হোবাইয়াও গ্রেফতার হয়ে মদীনায় আসে। এ ব্যক্তি আমর বিন আস (রা.) এর কাছে যাকাত এর ব্যাপারে নেতিবাচক কথা বলে। কিন্তু আবু বকর (রা.) এর সামনে তাকে হাজির করা হলে সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে।

---

৩২০ আব্দুল মালেক ইব্ন হিশাম, *সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ*,(মিসর: শিরকাতু মাকতাবাতু ওয়া মাতবা'আতু মুসতাফা আলবাবী আলহালবী ওয়া আওলাদিহি, ১৯৫৫ খ্রী.) , ১ম খণ্ড, পৃ ৫৫৯

وَاللَّهِ يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا بِنَا إِلَى اللَّهِ مِنْ فَقْرٍ، وَإِنَّهُ إِلَيْنَا لَفَقِيرٌ، وَمَا نَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَضَرَّعُ إِلَيْنَا، وَإِنَّا عَنْهُ لَأَغْنِيَاءُ، وَمَا هُوَ عَنَّا بِغَنِيٍّ، وَلَوْ كَانَ عَنَّا غَنِيًّا مَا اسْتَقْرَضَنَا أَمْوَالَنَا، كَمَا يَزْعُمُ صَاحِبُكُمْ، يَنْهَاكُمْ عَنْ الرِّبَا وَيُعْطِينَاهُ وَلَوْ كَانَ عَنَّا غَنِيًّا مَا أَعْطَانَا الرِّبَا.

৩২১ মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কল, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৬

খলীফা তার দাবীর সত্যতা সম্পর্কে আমর বিন আস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি যখন সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে লাগলেন তখন যাকাতের প্রসঙ্গ আসলে সে বলল, আমর বিন আস ! ও প্রসঙ্গটা বাদ দাও। তার একথা সত্বেও আমর বিন আস আবু বকর (রা.)কে তার সম্পর্কে সমস্ত কথা খুলে বললেন। আর সব কিছু জেনেও খলীফা তাকে ক্ষমা করে মহত্বের পরিচয় দিলেন ।

এছাড়া বনি কালবের আলকামা বিন আলাসা এবং বিখ্যাত মহিলা কবি খানসার ছেলে আবু শাজারাকেও আবু বকর (রা.) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আলকামা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের সময়ই ইসলাম ত্যাগ করেছিল এবং আবু বকর (রা.) এর সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে পলায়ন করেছিল আর আবু শাজারা মায়ের মত নিজেও কবি ছিল। সে মুরতাদদের সাথে মিলে গিয়ে কবিতার দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষদেরকে উত্তেজিত করতো এবং যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাতো। এ দুজন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলে আবু বকর (রা.) তাদেরকে মার্জনা করে দেন ।[৩২২]

৪.১.৫ উদার সামরিক নীতি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারই দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এজন্য তাদের যুগে সেনাবাহিনীকে এ মহান উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করার সবার্ত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়। যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে সাধারন মানুষকে রক্ষা করতে তাঁরা অভিযানে প্রেরণের পূর্বে সৈনিকদের ভালোভাবে উপদেশ দিতেন। কারণ সাধারনত বিজয়ী সেনাবাহিনী বিজিত এলাকায় প্রবেশ করে জনপদকে তছনছ করে দেয়। নিরীহ জনসাধারনকে হত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। আবু বকর (রা.) মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে অমুসলিম জাতির সাথে এরুপ আচরণ থেকে বিরত থাকতে বার বার স্মরন করিয়ে দিতেন। তাদেরকে কোন অভিযানে রওনা করার সময় তিনি তাদের সাথে অনেক দূর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতেন এবং বাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে বিদায় দিতেন । সিরিয়ায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণের পূর্বে তিনি সেনাপতিকে নিম্নরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন:

“তুমি একটা দলের সাক্ষাত লাভ করবে। তারা নিজের জীবন আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে রেখেছে। এ দলটিকে ছেড়ে দেবে। তাছাড়া আমার ক্রমান্বয়ে বর্নিত উপদেশ গুলো মেনে চলবে,

১। স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করবে না।

২। ফলবান গাছ কেটে ফেলবে না।

৩। আবাদ জায়গা বরবাদ করবে না ।

৪। খাবার প্রয়োজন ব্যতীত উট বকরী জবেহ করবে না।

---

[৩২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৫। খেজুরের বাগান ধ্বংস করবে না ।

৬। গনিমতের সম্পদ বন্টনে কোন প্রকার কারচুপি করবে না এবং

৭। কখনও ভীরুতা প্রদর্শন করবে না।”[৩২৩]

উপরোক্ত উপদেশ থেকে আবু বকর (রা.) এর সামরিক নীতির উদারতা প্রতীয়মাণ হয়। তাঁর অভিযান প্রেরণে ভিন্ন জাতির ও মতের মানুষদের ক্ষতি ও ধ্বংস করার অভিপ্রায় ছিল না।

৪.১.৬ ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির প্রয়াস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন গোত্র সদলবলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। এ সমস্ত মুসলমানরা স্বল্প সময়ে ইসলামের মৌলিক বিধানাবলীকে আত্মস্ত করতে পারেনি। তাই আবু বকর (রা.) সৈনিকদের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নিজেই সামরিক কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনে যেতেন। অভিযান প্রেরণের পূর্বে সৈনিকদের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি অনৈক্য দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তার সংশোধন করে দিতেন। একবার এক অভিযান উপলক্ষ্যে ‘জরফ’ নামক স্থানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করা হয়। আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তা পরিদর্শন করতে গেলেন। এখানে তিনি বিভিন্ন গোত্র হতে আগত সৈন্যদের মধ্যে পারস্পরিক আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের গৌরববোধ লক্ষ্য করলেন। তিনি দেখলেন সৈন্যরা এমনভাবে স্ব স্ব গোত্রের কৌলীন্য নিয়ে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করছে যাকে বৃদ্ধি হতে দিলে তাদের মধ্যে জাতিগত সংঘাত আবশ্যম্ভাবী। তিনি পারস্পরিক সম্প্রীতি তৈরীর জন্য তাদেরকে সাথে সাথে সর্তক করে দিলেন।

এছাড়া তিনি উপদেশের মাধ্যমে বংশীয় ও গোত্রীয় অভিজাত্য এবং পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ অবদমিত করে সকলের মধ্যে ইসলামী সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাবার চেষ্টা করলেন।[৩২৪]

৪.১.৭ সদাচরণ

আবু বকর (রা.) এর জীবন চরিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তিনি কখনো অমুসলিমদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ন ছিলেন না। তাঁর খেলাফত আমলে ভিন্ন আদর্শ ও মতাবলম্বীরা ইসলামের প্রতি চরম সহিংস আচরণ করলেও তিনি নিজ গুণে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাদের সাথে সর্বোচ্চ সদাচরণ করেছেন। এমনকি কোন মুসলমান যদি তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে ফেলতো তবে খলীফা হিসেবে আবু বকর (রা.) তা বরদাশ্‌ত করতেন না। তাঁর সময়ে আরবের

---

[৩২৩] মালিক বিন আনাস, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*,(বৈরুত: দারু ইহয়াউত তুরাছিল ‘আরাবী, ১৯৮৫ খ্রী.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৭
إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ. فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ. وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ. فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ». وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: «لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ. وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا، وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ وَلَا تَجْبُنْ

[৩২৪] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *খিলাফত রাশেদা*, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৪ইং), পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন স্থানে নবুয়তের মিথ্যা দাবীদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে অনেক ব্যক্তি বন্দী হয়। এমনি একটি যুদ্ধের পর ইয়েমেনের গভর্নর মুহাজির দুজন বন্দী মহিলার বিচারকাজ সম্পাদন করেন। ঘটনাটি সম্পর্কে আল্লামা সূয়ূতী বর্ণনা করেন,

"আরবের কোন কোন এলাকায় যখন ধর্মত্যাগের প্রবণতা বিস্তার লাভ করে, তখন ইয়েমেনের একজন গায়িকা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদ্রূপ করত এবং অন্য একজন গায়িকাও তাদের গানের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করত। গভর্নর মুহাজির তাদের হাত কেটে দেন এবং তাদের সামনের দাঁত উৎপাটিত করে ফেলেন। যখন খলীফা এটা জানতে পারেন তখন তিনি প্রথম জনের শাস্তি অনুমোদন করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করা আর একজন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ সমান নয় এবং সত্যি যদি আমাকে প্রথমে জানানো হতো তাহলে আমি অন্যান্যদের প্রতি সতর্কবাণী হিসাবে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় জনকে প্রদত্ত শাস্তির কঠোরভাবে বিরোধিতা করেন। কারণ যদি সে একজন মুসলমান হয়ে থাকে তবে তাকে সতর্ক করে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু যদি সে একজন যিম্মী হয়ে থাকে তবে মুসলমানদেরকে ঠাট্টা করার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ এর চেয়েও বড় পাপ হচ্ছে তার দেব-দেবীতে বিশ্বাস এবং তার ঐ পাপও উপেক্ষা করা হচ্ছে। তিনি মুহাজিরকে সতর্ক করে দেন। "এটাই তোমার প্রথম ভুল, অন্যথায় তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হতো। অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে সাবধান! এটা ভীষণ ঘৃণ্য পাপ। একে শুধু প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দেয়া হয়।"[৩২৫]

৪.১.৮ যিম্মী প্রজাদের অধিকার সংরক্ষণ

খলীফা আবু বকর (রা.) এর খেলাফতকালে ইসলামের বিজয় পতাকা ইরান, ইরাক, সিরিয়া, রোম, ইয়েমেন পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বংশীয় গোত্রীয় বৈষম্য ও পার্থক্যের দরুন এসব দেশের সাধারণ জনগণ তাদের শাসক জাতির দ্বারা চরমভাবে নিষ্পেষিত ও অধিকার বঞ্চিত হতো। আবু বকর (রা.) ঠিক এই সময়ই ইসলামের ইনসাফ ও সাম্যের পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি এ সমস্ত অঞ্চলে প্রেরিত সেনাপতিদেরকে বিজিত দেশের সমস্ত জনগণের প্রতি জাতি, ধর্ম, বংশ, বর্ণ নির্বিশেষে সাম্যের আচরণ অবলম্বন করার সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেন। এর ফলে যুলম, পীড়ন,

[৩২৫] আল্লামা জাললুদ্দীন সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, (মাকতাবাতু নাযারী মুসতাফা আল বায,২০০৪ ইং),পৃ ৮১

أن المهاجر بن أمية وكان أمير اليمامة رفع إليه امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي –صلى الله عليه وسلم– فقطع يدها، ونزع ثنيتها، وغنت الأخرى بهجاء المسلمين، فقطع يدها، ونزع ثنيتها، فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي فعلت في المرأة التي غنت بشتم النبي –صلى الله عليه وسلم– فلولا ما سبقتني فيها لأمرتك بقتلها؛ لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر، وأما التي غنت بهجاء المسلمين، فإن كانت ممن يدعي الإسلام فأدب وتعزير دون المثلة، وإن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم، ولو كنت تقدمت إليك في هذا لبلغت مكروهًا فاقبل الدعة، وإياك والمثلة في الناس، فإنها مأثم ومنفرة إلا في قصاص.

নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও সহিংসতা-নৃশংসতায় জর্জরিত জনসমষ্টি ইসলামের উদারতার আলোকচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে যিম্মী নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে লাগলো। খলীফা আবু বকর (রা.) যিম্মী নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি জিযিয়া গ্রহণের বিনিময়ে তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের সাথে তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করেন।

এছাড়া তাঁর খেলাফত আমলে যিম্মী নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ কর্তৃক ইরাকের ফোরাত নদীর তীরবর্তী হিরা নামক স্থানের অধিবাসীদের সাথে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি যা খলিফা হিসেবে আবু বকর (রা.) অনুমোদন করেছিলেন। হিরার অধিবাসীরা খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী। তাদের সাথে বার্ষিক এক লাখ নব্বই হাজার দিরহাম জিযিয়ার উপর সন্ধিচুক্তি স্থাপিত হয়। সন্ধিপত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

> "পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। এই পত্রটি খালেদ বিন ওয়ালিদ এর পক্ষ থেকে হিরাবাসীর নিকট। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের খলীফা আবু বকর সিদ্দিক আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন ইয়ামামার যুদ্ধ থেকে বিদায়ের পর ইরাকবাসী, আরব ও অনারবদের দিকে যাত্রা করি। তাদেরকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার জন্য আহবান করি। তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় দেখাই। যদি তারা মেনে নেয় তাহলে মুসলমানদের জন্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে তাদের জন্যও সে সুযোগ সুবিধা থাকবে। আর মুসলমানদের উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তাদের উপরও সে দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকবে। আমি হিরা পর্যন্ত আসলাম তখন আমার নিকট ইয়াস ইবনে কাবীসা আত্তাঈ হীরাবাসী এবং তার কিছু নেতৃস্থানীয় লোক আসল। আমি তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনার আহবান করলাম। তারা তা অস্বীকার করল। তখন আমি তাদেরকে হয় জিযিয়া দিবে অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে বললাম। তখন তারা বলল, তোমার সাথে আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। বরং আহলে কিতাবদের সাথে জিযিয়া প্রদানের ব্যাপারে যেভাবে সন্ধি কর সেভাবে আমাদের সাথে সন্ধি করবে। আমি তাদের লোক সংখ্যার দিকে তাকালাম। দেখলাম তাদের সংখ্যা হবে সাত হাজারের মত। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে গণনা থেকে বাদ দিলাম। ফলে জিযিয়া দেয়ার মত তাদের লোক সংখ্যা হল ছয় হাজার। তারা আমার সাথে ষাট হাজার মুদ্রা জিযিয়া প্রদানে সন্ধি করল। আর আমি তাদের সাথে শর্ত করলাম আল্লাহ যেভাবে আহলে কিতাবদের থেকে ওয়াদা ও চুক্তি নিয়েছিলেন যে তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করবে না সে কাফের আরব হোক বা আজমী হোক। মুসলমানদের গোপন বিষয় কাফেরদের সামনে তুলে ধরবে না। এই ব্যাপারে তোমাদের উপর আল্লাহর চুক্তি ও অঙ্গীকার প্রযোজ্য হবে, যিনি তার চেয়ে কঠিন চুক্তি অথবা অঙ্গীকার অথবা আমানত নবীদের থেকে নিয়েছেন। অতএব তারা যদি তা ভঙ্গ করে তাহলে তাদের জন্য কোন নিরাপত্তা ও যিম্মা থাকবে না। আর যদি তারা তা পালন করে সঠিকভাবে সংরক্ষণ

করে এবং মুসলমানদের নিকট পৌঁছায় তাহলে তারা চুক্তি অনুযায়ী অংশ পাবে। আমাদের উপর কর্তব্য হল তাদের উপর অনুগ্রহ করা। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কোন বিজয় দান করেন। আর যদি কোন বৃদ্ধ কাজ করতে অক্ষম হয় অথবা তার উপর কোন বিপদ আসে অথবা একসময় সে ধনী ছিল পরে নিঃস্ব হয়ে গেছে, ফলে তার ধর্মের লোকজন তাকে দান ছদকা করে তাহলে তার উপর জিজিয়া করা রহিত করা হবে এবং মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে তাকে সাহায্য করা হবে। আর তার পরিবার যারা দারুল হিজরা বা দারুল ইসলামে থাকে ,তারা যদি দারুল হিজরা বা দারুল ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় তাহলে তার পরিবারের ভরন পোষণের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর থাকবে না। আর যদি তাদের কোন দাস ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে বাজারে নিয়ে সবচেয়ে উত্তম দাম ধরা হবে এবং এই সমান অর্থ তার মালিককে দেওয়া হবে। আর তারা সব ধরনের পোষাক পরতে পারবে। তবে মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্য হয় এমন ধরনের যুদ্ধের পোষাক পরতে পারবেনা। যদি কেউ এই ধরনের পোষাক পরে এবং উপযুক্ত কারণ দেখাতে না পারে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। "[৩২৬]

উল্লিখিত চুক্তিনামায় আবু বকর (রা.) এর সময়ে ইসলামের উদারতা ও পরধর্ম সহিষ্ণুতার অনুপম চিত্র দৃশ্যমান হয়। এছাড়া সে সময় জিযিয়া ও সাধারণ করের পরিমানও ছিল অত্যন্ত কম। উপরন্তু তা আদায়ে উদারতার পরিচয় দেয়া হয়। খলীফা আবু বকর (রা.) তাঁর অমুসলিম প্রজাদের উপর জিযিয়ার বোঝা চাপিয়ে তাদেরকে নিষ্পেষণ করেননি। বরং তাদের

---

[৩২৬] আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্রাহীম, *আল খারাজ*, (আল মাকতাবাতুন আযহারিয়্যাহ লিত তুরাছ,তা.বি.) পৃ. ১৫৭-১৫৮

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لأَهْلِ الْحِيرَةِ، أَنَّ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تعاى عَنْهُ أَمَرَنِي أَنْ أَسِيرَ بَعْدَ مُنْصَرَفِي مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ بِأَنْ أَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَإِلَى رَسُوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَأُبَشِّرُهُمْ بِالْجَنَّةِ وَأُنْذِرُهُمْ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنْ أَجَابُوا فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَإِنِّي انْتَهَيْتُ إِلَى الْحِيرَةِ فَخَرَجَ إِلَيَّ إِيَاسُ بْنُ قَبِيصَةَ الطَّائِيُّ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ، وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُوا فعرضت عَلَيْهِم الجزمية أَوِ الْحَرْبَ فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِحَرْبِكَ؛ وَلَكِنْ صَالِحْنَا عَلَى مَا صَالَحْتَ عَلَيْهِ غَيْرَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي عِدَّتِهِمْ فَوَجَدْتُ عِدَّتَهُمْ سَبْعَةَ آلافِ رَجُلٍ، ثُمَّ مَيَّزْتُهُمْ فَوَجَدْتُ مَنْ كَانَتْ بِهِ زَمَانَةٌ أَلْفَ رَجُلٍ فَأَخْرَجْتُهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ؛ فَصَارَ مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ سِتَّةَ آلافٍ؛ فَصَالَحُونِي عَلَى سِتِّينَ أَلْفًا، وَشَرَطْتُ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي أَخذَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ: أَنْ لَا يُخَالِفُوا وَلا يُعِينُوا كَافِرًا عَلَى مُسْلِمٍ مِنَ الْعَرَبِ وَلا مِنَ الْعَجَمِ، وَلا يَدُلُّوهُمْ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ الَّذِي أَخَذَهُ أَشَدَّ مَا أَخَذَهُ عَلَى نَبِيٍّ مِنْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ أَوْ ذِمَّةٍ؛ فَإِنْ هُمْ خَالَفُوا فَلا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلا أَمَانَ، وَإِنْ هُمْ حَفِظُوا ذَلِكَ وَرَعَوْهُ وَأَدَّوْهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ؛ فَلَهُمْ مَا لِلْمُعَاهَدِ وَعَلَيْنَا الْمَنْعُ لَهُمْ؛ فَإِنْ فَتَحَ الله علينا فهم على ذمَّته من؛ فَلهم بذلك عهد الله أَشَدَّ مَا أَخذَ عَلَى نَبِيٍّ مِنْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ، وَعَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يُخَالَفُوا؛ فَإِنْ غُلِبُوا فَهُمْ فِي سِعَةٍ يَسَعُهُمْ مَا وَسِعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ. وَلا يَحِلُّ فِيمَا أُمِرُوا بِهِ أَنْ يُخَالِفُوا وَجَعَلْتُ لَهُمْ أَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الآفَاتِ أَوْ كَانَ غَنِيا فَافْتَقَرَ وَصَارَ أَهْلُ دِينِهِ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ طَرَحْتُ جِزْيَتَهُ وَعِيلَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَعِيَالُهُ مَا أَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ وَدَارِ الإِسْلَامِ؛ فَإِنْ خَرَجُوا إِلَى غَيْرِ دَارِ الْهِجْرَةِ وَدَارِ الإِسْلَامِ؛ فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ النَّفَقَةَ عَلَى عِيَالِهِمْ. وَأَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِمْ أَسْلَمَ أُقِيمَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَبِيعَ بِأَعْلَى مَا يُقَدَّرُ عَلَيهِمْ فِي غَيْرِ الْوَكْسِ وَلا تَعْجِيلَ وَدُفِعَ ثَمَنُهُ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَهُمْ كُلُّ مَا لَبِسُوا مِنَ الزِّيِّ إِلا زِيَّ الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي لِبَاسِهِمْ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْهُمْ وُجِدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ زِيِّ الْحَرْبِ سُئِلَ عَنْ لِبْسِهِ ذَلِكَ فَإِنْ جَاءَ مِنْهُ بِمَخْرَجٍ؛ وَإِلا عُوقِبَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ زِيِّ الْحَرْبِ. وَشَرَطْتُ عَلَيْهِمْ جبابة مَا صالحتهم عَلَيْهِ حَتَّى يؤدوه إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ عُمَّالُهُمْ مِنْهُمْ؛ فَإِنْ طَلَبُوا عَوْنًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُعِينُوا بِهِ وَمَئُونَةُ الْعَوْنِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ".

অপারগতাকেও সাদরে গ্রহণ করে তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করেছেন। হীরার সাত হাজার অধিবাসীর মধ্যে এক হাজার অধিবাসীকেই তাদের অক্ষমতার দরুন সকল প্রকার জিযিয়া হতে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছিল। আর অবশিষ্ট ব্যক্তিদের মাথাপিছু বার্ষিক জিযিয়ার পরিমান নির্ধারণ করা হয়েছিল মাত্র দশ দিরহাম। তাদের সাথে কৃত চুক্তিপত্রে এটিও উল্লেখ ছিল যে, কোন যিম্মী বৃদ্ধ, অক্ষম ও দরিদ্র হয়ে গেলে তার নিকট হতে কোন প্রকার করই গ্রহণ করা হবে না। বরং বায়তুল মাল হতে তাদের ব্যয়ভার বহন করা হবে। খলীফা আবু বকর (রা.) এর সময়ে অমুসলিমদের নিরাপদ জীবন যাপন নিশ্চিত করার বর্ণনা পাওয়া যায় মুহাম্মদ হুসাইন হায়কলের বর্ণনায়। তিনি উল্লেখ করেন,

'হিরার নিকটবর্তী শহরের বাসিন্দারা হিরাবাসীদের ইসলামী হুকুমাতের আদর্শ, ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও রেওয়াজ রীতি, ইবাদত বন্দেগীতে পূর্ণ আজাদী লাভ করে শান্তির সাথে কাজ কারবারে ব্যস্ত আছে, ওদিকে ইরানী প্রশাসনও নিশ্চুপ আছে দেখে তারাও খালিদের সাথে সন্ধি স্থাপনে ও তাঁর আনুগত্য পালনের ইচ্ছা পোষণ করলো। তারা দেখলো মুসলমানদের শাসনে গরীব চাষীরা অত্যন্ত সুখে শান্তিতে ক্ষেত খামারের কাজে ব্যস্ত আছে। মুসলমানরা এদের কোন কাজে হস্তক্ষেপ তো করছেই না বরং ইরানী জমিদারের হাতে এদের উপর যে নির্যাতন ও নিগ্রহ চলছিলো তা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি মুসলমানরা লক্ষ্য রাখছে। তাই তাদের হৃদয় তাদের অলক্ষ্যেই মুসলমানদের প্রতি ঝুঁকে গেলো।'[৩২৭]

৪.১.৯ যিম্মীদের নেতৃত্ব বহাল

আবু বকর (রা.) তাঁর সময়ে বিজিত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা ও শান্তি শৃংখলার ব্যবস্থা স্থানীয় নেতাদের হাতেই ছেড়ে দেন। এতে তারা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য খুশী হয়ে মনেপ্রাণে খলীফার আনুগত্য করতে লাগলো এবং শান্তি শৃংখলা স্থাপনে সহযোগিতা করতে থাকলো। এর দৃষ্টান্ত হল দেরে নাতিকের পাদ্রী সালুবা বিন নাস্তনার সাথে লিখিত চুক্তি। এতে লিখা ছিল,

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

> "এ সন্ধি চুক্তি খালিদ বিন ওয়ালিদের তরফ থেকে সালুবা বিন নাস্তনা এবং তার জাতির জন্য লিখা হচ্ছে। এ অঙ্গীকার পত্র অনুযায়ী তোমার নিকট হতে বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম জিযিয়া আদায় করা হবে। কিসরার 'মুতি' হবে এর অতিরিক্ত। জিযিয়ার এ অংশ সামর্থবান ও উপার্জনকারী ব্যক্তির নিকট হতে তার আয়-আমদানী অনুযায়ী বার্ষিক উসুল করা হবে। এ জিযিয়ার বিনিময়ে মুসলমানদের তরফ হতে 'বানদিয়া' 'বাসামার' হিফাজত করা হবে। তোমাকে তোমার জাতির নেতা নির্বাচন করা হচ্ছে। যা

[৩২৭] মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কল, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯০

Dhaka University Institutional Repository

> তোমার জাতি গ্রহণ করেছে। এ সন্ধি চুক্তির সাথে আমি ও আমার সাথীগণ একমত এবং তারা তা গ্রহণ করেছে। এভাবে তোমার জাতিও এ চুক্তির সঙ্গে একমত ও এটাকে তারা গ্রহণ করেছে।”[৩২৮]

এভাবে আবু বকর (রা.) এর খেলাফত আমলে অমুসলিম, কাফির, মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকগণ তাদের মৌলিক অধিকারগুলো উপভোগ করতো এবং সকল প্রকার স্বাধীণতার স্বাদ লাভ করে মুসলমানদের সাথে একত্রে মিলেমিশে শান্তি ও শৃংখলার সাথে বসবাস করতো। তাদের এই সংঘাত-সহিংসতা বিহীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলেই পরবর্তী খলিফা ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ইসলামের বিজয় পতাকা আরো বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুসংঘটিত করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

[৩২৮] জারীর আত তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৭-৩৬৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لِصَلُوبَا بْنِ نسطونَا وَقَوْمِهِ، إِنِّي عَاهَدْتُكُمْ عَلَى الْجِزْيَةِ وَالْمَنْعَةِ، عَلَى كُلِّ ذِي يَدٍ، بَانِقْيَا وبسما جَمِيعًا، عَلَى عَشَرَةِ آلافِ دِينَارٍ سِوَى الْخرزةِ، القوى على قَدْرِ قُوَّتِهِ، وَالْمُقِلُّ عَلَى قَدْرِ إِقْلالِهِ، فِي كُلِّ سَنَةٍ وَإِنَّكَ قَدْ نَقَبْتَ عَلَى قَوْمِكَ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ رَضُوا بِكَ، وَقَدْ قَبِلْتُ وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَضِيتُ وَرَضِيَ قَوْمُكَ، فَلَكَ الذِّمَّةُ وَالْمَنْعَةُ، فَإِنْ مَنَعْنَاكُمْ فَلَنَا الْجِزْيَةُ

৪.২ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় উমর (রা.) এর পদক্ষেপসমূহ

দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) এর খিলাফত কালীন সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ত হতে মিশর ও সিরিয়া পর্যন্ত ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। এই বিশাল অঞ্চলকে তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে শাসনের আওতায় আনেন। এই বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলমান ছাড়াও বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মাবলম্বী জনগণ বসবাস করতো। উমর (রা.) তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ভাবধারাকে অপসারিত করে তাদেরকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে এমন এক কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরনীয় হয়ে আছে। তাঁর শাসনকালীন সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যে অমুসলিম, জিম্মী নাগরিকদের উপর যুলম-নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উপরন্তু তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা ও মহানুভবতার ডানা প্রসারিত করেছিলেন তা অবলোকন করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হয়ে ইসলামী খিলাফতী শাসনকে কামনা করত। এজন্য দেখা যায়, উমর (রা.) কোন অঞ্চলে মুসলিম সেনাবাহিনীকে অভিযানে পাঠালে সে অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত জাতি তাদেরকে বিজয়ের ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করত। যেমন, সিরিয়া বিজয়ের ব্যাপারে স্বয়ং সিরিয়াবাসী অমুসলিম অধিবাসীরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুসলমানদের পক্ষে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করেছে। ইরাক বিজয়ের সময় তথাকার অধিবাসীরা মুসলিম সৈনিকদের প্রবেশের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পুল নির্মাণ করে এবং তাদের জন্য প্রতিপক্ষের গোপন তথ্যাদি সরবরাহ করে। মূলতঃ উমর (রা.) সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, উদারতা, সহনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা, ইত্যাদির মহৎ গুণাবলীর মাধ্যমে অমুসলিম জাতিকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। অমুসলিম জাতির প্রতি তাঁর আচরণ নিম্নে আলোচনা করা হল:

৪.২.১‘খারাজ’ এর প্রবর্তন

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস খারাজ বা ভূমির রাজস্বের প্রথম উদ্যোক্তা উমর (রা.)। তিনি বিজিত অঞ্চলের কৃষকদের তাদের ভূমির মালিকানা বহাল রাখার জন্য এর প্রবর্তন করেন। হিজরী **১৬**শ সনে ইরাক, সিরিয়া যখন চূড়ান্তভাবে মুসলমানদের অধিকারে আসল তখন সাহাবায়ে কিরাম উমর (রা.) কে বিজিত অঞ্চলের জমি সৈনিকদের মধ্যে গণীমত হিসেবে বন্টন করার তাগাদা দিচ্ছিলেন। কেননা যাদের কষ্টের বিনিময়ে এসব এলাকা মুসলমানরা জয় করেছে সেগুলোর জমির মালিকানা লাভের অধিকার শুধুমাত্র তাদেরই। কিন্তু দূরদর্শী চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তি উমর বিন খাত্তাব (রা.) যিম্মী নাগরিকদের স্বার্থ নিয়ে ভাবলেন। যদি বিজিত অঞ্চলের জমি মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়, তবে যিম্মীদের পরবর্তী প্রজন্ম সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবে। এমতাবস্থায় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন খায়বরের জমি তথাকার ইহুদীদের হাতে ন্যস্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন তদ্রূপ বিজিত এলাকার জমি স্থানীয় কৃষকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.), যুবায়ের ইব্ন আওয়াম (রা.) ও বিলাল বিন রাবাহ (রা.) সহ কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম অধিকৃত জমি সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করার পক্ষে এমনভাবে খলীফাকে বলছিলেন যে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'হে আল্লাহ তুমি বিলাল ও তাঁর সাথীদের কবল থেকে আমাকে রক্ষা কর।'[৩২৯]
অবশেষে উমর (রা.) মজলিশে শুরার সদস্য সাহাবায়ে কিরামের সাথে এ ব্যাপারে কয়েকদিন যাবত আলোচনার পর পবিত্র কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর ভিত্তি করে যিম্মীদের নিকট থেকে খারাজ আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাদের জমির মালিকানা তাদের জন্য ছেড়ে দেন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ইহা ঐ সমস্ত মুহাজির ফকিরদের জন্য, যারা বাড়িঘর এবং ধনসম্পত্তি হতে বিতাড়িত হয়েছে....এবং যারা তাদের পরে আসবে।"[৩৩০]
উমর (রা.) খারাজ আদায়ের ব্যাপারে যিম্মীদের ওপর যেন সামান্যতম যুলমও না হয় তাই অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন। তিনি তাদের প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল ছিলেন যে খারাজ এর পরিমাণ নির্ধারণকারী ওসমান ইব্ন হানীফ (রা.) কে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, "কর ধার্য করত গিয়ে কৃষকদের ওপর বেশী বোঝা চাপিয়ে দাওনি তো? ওসমান ইব্ন হানীফ বললেন, "কিছুতেই নয়; বরং ঠিক আরও এই পরিমাণ ধার্য করা যেত।"[৩৩১]
এছাড়াও খারাজের ব্যাপারে যিম্মী প্রজারা যেন কোন নির্যাতন ও নিষ্পেষণের স্বীকার না হয়, তজ্জন্য উমর (রা.) প্রত্যেক বৎসর খারাজ মদীনায় পৌঁছার পর কুফা এবং বসরা হতে দশজন করে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে তলব করে আনতেন এবং শরীয়ত অনুযায়ী চারবার শপথ করিয়ে তাদের নিকট হতে সাক্ষাত গ্রহণ করতেন যে, কর আদায়ের ব্যাপারে কোন মুসলিম বা যিম্মী প্রজার উপর এতটুকুও জুলুম করা হয়নি।[৩৩২]

৪.২.২ যিম্মীদের পরামর্শ গ্রহণ

---

[৩২৯] আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম, *আল খারাজ*, (মিসর: আল মাকতাবাতুন আযহারিয়্যাহ লিত তুরাছ, তা.বি.), পৃ. ৩৬-৩৭

إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمَاعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرَادُوا عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُقَسِّمَ الشَّامَ كَمَا قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، وَأَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الزُّبَيْرُ بن الْعَوام وبلال بن رَبَاحٍ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إِذَنْ أَتْرُكُ مَنْ بعدكم من الْمُسلمين لَا شَيْءَ لَهُمْ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِلالا وَأَصْحَابَهُ. قَالَ: فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الطَّاعُونَ الَّذِي أَصَابَهُمْ بِعَمْوَاسَ عَنْ دَعْوَةِ عُمَرَ1 قَالَ: وَتَرَكَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذِمَّةً يؤدون الْخراج لِلْمُسلمين.

[৩৩০] আল কুর'আন, সূরা হাশর : ৮-১০

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

[৩৩১] আল্লামা শিবলী নুমানী, *আল ফারুক*, (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় লিমিটেড, জুন ২০১২), পৃ. ১৩৬

[৩৩২] প্রাগুক্ত

উমর (রা.) এর শাসনামলে অমুসলিমরা মুসলমানদের সমান সুযোগ সুবিধা পেত। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর কোন প্রজাই যেন বঞ্চিত না হয় এজন্যে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি যিম্মীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন সিদ্ধান্তই তাদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত গ্রহণ করতেন না। তার এই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় বিজিত এলাকার জমি ভাগ বন্দোবস্ত করার সময়। এ সময় যিম্মী প্রজাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তাদের সমস্ত আবেদন নিবেদন পূরণ করার চেষ্টা করতেন।

ইরাকের জমি বন্দোবস্তির সময় তথাকার কর্মচারীগণকে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, প্রথমে দোভাষীসহ তথাকার দু'জন নেতাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। তদ্রূপ মিসরের বন্দোবস্তির সময় তথাকার গভর্ণরকে এ ব্যাপারে সেখানকার প্রাক্তন শাসনকর্তা মকুকাশের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতেও তৃপ্ত হতে না পেরে তিনি একজন অভিজ্ঞ কিবতী কৃষককে মদীনায় ডেকে এনে তার অভিমত গ্রহণ করেন।[৩৩৩]

এভাবে বিজাতীয় বিধর্মী মানুষকে তাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করে, তাদের অভিমত গ্রহণের মাধ্যমে উমর (রা.) একটি শান্তি ও শৃংখলাপূর্ণ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

৪.২.৩ সেনাবাহিনীতে বহু জাতির সন্নিবেশ

উমর (রা.) কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আরো একটি দৃষ্টান্ত হল তাঁর সৈন্যবিভাগ। উমর (রা.) তাঁর সৈন্য বিভাগে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সৈনিকদেরকে একত্রিত করেছিলেন। তাঁর উদার মনোভাবের ফলে অনেক বিধর্মী যোদ্ধা মুসলিম সেনাবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হয়ে মুসলমান সৈনিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলিমদের বিজয় অভিযানে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতো।

তিনি পারস্য সম্রাট ইয়াজদগীরদের একজন সুদক্ষ সেনাপতি সিয়াহকে তার বাহিনীসহ মুসলিম সেনাদলে যোগদানের অনুমতি প্রদান করতঃ তাদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। আবু জাফর তাবারী তাঁর গ্রন্থে উমর (রা.) এর এই উদারতার তথ্য উল্লেখ করেন। উমর (রা.) আবু মুসা আশ'আরী (রা.) কে সোস শহর অবরুদ্ধ করতে প্রেরণ করলে সম্রাট ইয়াজদগীরদ তাঁর গতিরোধ করার জন্য সেনাপতি সিয়াহ এর বাহিনীকে প্রেরণ করেছিলেন। মুসলমানরা সোস অধিকার করার পর সিয়াহ তার বাহিনীসহ কতিপয় শর্তাবলী দিয়ে আবু মুসা আশ'আরী এর নিকট সন্ধির আবেদন করেন। কিন্তু তিনি কোনরূপ শর্তাধীনে তাদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি সমস্ত বিষয় খলীফা উমর (রা.)কে লিখে পাঠালে প্রত্যুত্তরে তিনি তাদের সর্বপ্রকার শর্ত মেনে নেয়ার নির্দেশ দেন। তদানুযায়ী তাদেরকে বসরা শহরে পূনর্বাসন করে সবাইকে মুসলিম সেনাবাহিনীর তালিকাভূক্ত করতঃ উপযুক্ত পরিমান বৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থা করে

[৩৩৩] আল্লামা শিবলী নুমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ার আদেশ দিয়ে আবু মুসা আশ'আরীকে পত্র দেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে তাদের পদানুযায়ী পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা করতে আদেশ দেন এবং তাদের প্রত্যেকেই আরবদের নিকট থেকে সর্বোচ্চ পরিমান বরাদ্দ দেয়া হয়। যার পরিমান ছিল তাদের প্রত্যেক একশত জনের জন্য দুই হাজার করে এবং তাদের নেতৃস্থানীয় ছয়জন সিয়াহ, খসরু, মুকাল্লাস, শাহরিয়ার, শাহরুভিয এবং আফরুযিন এর জন্য আড়াই হাজার করে।[৩৩৪]

এছাড়া ইয়েমেন বিজয়ের পরও তথাকার অধিকাংশ সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকেও মুসলিম বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। উমর (রা.) এর সামরিক বাহিনীতে ভারতবর্ষের সৈনিকও ছিল। পারস্য সেনাবাহিনীর অধীভূক্ত এসব সৈনিক সোসের যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনীর তালিকাভূক্ত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক গ্রীক, রোমান সৈন্য তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এ বিজয় অভিযানে প্রায় এক হাজার ইহুদী সৈন্যও মুসলিম বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করে। উমর (রা.) স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতেও বহু জাতির লোকের সন্নিবেশ করেছিলেন। এমনকি তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে অগ্নি উপাসক ব্যক্তিও শামিল ছিল।[৩৩৫]

৪.২.৪ গুপ্তচর হিসেবে যিম্মীদের স্বতস্ফুর্ত সহযোগিতা

উমর (রা.) এর খেলাফত আমলে যিম্মী নাগরিকগণ মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তাদের সততা, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক রীতি-নীতি দেখে অভিভূত হয়। পারস্য ও রোমান সম্রাটদের দ্বারা চরম ভাবে বঞ্চনা, অবহেলা, শোষণ ও নির্যাতনের স্বীকার এসব ব্যক্তিরা মুসলিম শাসনের আওতায় এসে স্বস্তি লাভ করে। তারা একে নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করে মুসলমানদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। উমর (রা.) এর সেনাবাহিনীতে শত্রুপক্ষের গোপন খবর উদ্ধার করার জন্য এসব যিম্মীরা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। যিম্মীগণ যখন মুসলমানদের আচার ব্যবহার সততা এবং প্রজাপালন নীতি দেখতে পেল, তখন তারা মুসলমানদের শত্রুদের ভীষণ শত্রুতে পরিণত হল এবং মুসলমানদেরকে শত্রুদের মোকাবিলায় সব রকম সাহায্য করতে আরম্ভ করল ও শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ লোক পাঠিয়ে রোমীয়দের গুপ্ত খবর মুসলমানদের গোচরীভূত করতে লাগল। জর্দান এবং ফিলিস্তিনে 'ছামেরা' নামক একটি ইহুদী সম্প্রদায় বাস করত; এদেরকে বিশেষভাবে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য নিযুক্ত রাখা হয়েছিল। পুরস্কার স্বরূপ তাদের সম্পত্তিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে তাদের হাতেই তা ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।[৩৩৬] তদ্রুপ 'জারাজীমা'র একটি সম্প্রদায় এই কাজে নিযুক্ত হলে পুরস্কার স্বরূপ তাদের

---

[৩৩৪] আবু জাফর আত তাবারী, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৯১

فكتب أبو موسى إلى عمر في ذلك، فكتب إليه عمر: أن ألحقهم على قدر البلاء في أفضل العطاء وأكثر شيء أخذه أحد من العرب ففرض لمائة منهم في ألفين ألفين، ولستة منهم في الفين، وخمسمائة لسياه وخسرو– ولقبه مقلاص– وشهريار، وشهرويه، وأفروذين

[৩৩৫] আল্লামা শিবলী নোমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭৪

[৩৩৬] আল বালাযুরী, ফুতুহুল *বুলদান*, (বৈরুত: দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, ১৯৮৮ইং), পৃ. ১৫৮

ভূমি রাজস্ব মাফ করে দেয়া হয়। আল্লামা বালাযুরী জারাজিমা সম্প্রদায় সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,"তারা নিরাপত্তা ও সন্ধি আবেদন করল। অত:পর তারা মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করবে এই শর্তে তাদের সাথে সন্ধি করা হল।"[৩৩৭]

৪.২.৫ অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান

ইসলাম কোন ব্যক্তির ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা বা না করার পুরো অধিকার স্বীকার করে। উমর (রা.) তাঁর শাসনামলে মানুষের এই অধিকারটির পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি কখনো কোন ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতার প্রয়োগ করেননি। তাঁর শাসনামলে সিরিয়া, ইরাক, ইরানসহ যে সমস্ত এলাকায় ইসলামী সাম্রাজের বিস্তৃতি ঘটেছে, তিনি তথাকার যিম্মী নাগরিকগনের ধমীর্য় স্বাধীনতা সংরক্ষণের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি কোন দেশে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার সময় এ ব্যাপারে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করতেন। যেমন তিনি সেনাপতি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের নিকট এক পত্রে লিখেন "তোমার প্রতি আমার বিশেষ নির্দেশ এই যে, যাদের সাক্ষাৎ পাও যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান করো।" এভাবে উমর (রা.) এর সময় ভিন্ন জাতির সামনে ইসলামের আদর্শকে উপস্থাপন করা হতো। কাউকে তার স্বধর্ম ত্যাগে বাধ্য করা হতো না। তাঁর প্রত্যেকটি বিজয় অভিযান পরিচালিত হওয়ার আগে প্রতিপক্ষের সামনে তিনটি বিকল্প উপস্থাপন করা হত। সেগুলো হচ্ছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ; অথবা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য গ্রহণ অন্যথায় যুদ্ধের মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ।

এতদ্ব্যতীত উমর (রা.) যিম্মী প্রজাদের যে পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করতেন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হল বায়তুল মোকাদ্দেসের অধিবাসী খৃষ্টানদের সাথে তাঁর লিখিত চুক্তিপত্র। এ চুক্তিপত্রে খৃষ্টানদের ধর্মমতের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না বলে ঘোষণা দেয়া হয়। তাদের গীর্জা বা ধর্মমন্দির ধ্বংস করা হবে না বরং বায়তুল মোকাদ্দেসে অবস্থিত তাদের গীর্জা ও ধর্ম মন্দিরগুলো যথাযথভাবে হেফাজত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এমনকি খৃষ্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী যেহেতু বায়তুল মোকাদ্দেসের পবিত্র ভূমিতে ইহুদীগণ ঈসা (আ.) ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা

أن أَبَا عُبَيْدة بْن الجراح صالح السامرة بالأردن وفلسطين، وكانوا عيونا وأدلاء للمسلمين على جزية رؤوسهم وأطعمهم أرضهم فلما كان يزيد بْن معاوية وضع الخراج عَلَى أرضهم.

৩৩৭ আল বালাযুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

فلما قدم أَبُو عُبَيْدة انطاكية وفتحها لزموا مدينتهم وهموا باللحاق بالروم إذ خافوا عَلَى أنفسهم، فلم ينتبه المسلمون لهم ولم ينبههم عليهم، ثم أن أهل انطاكية نقصوا وغدروا فوجه إليهم أَبُو عُبَيْدة من فتحها ثانية وولاها بعد فتحها حبيب بْن مسلمة الفهري فغزا الجرجومة فلم يقاتله أهلها ولكنهم بدروا بطلب الأمان والصلح فصالحوه عَلَى أن يكونوا أعوانا للمسلمين، وعيونا ومسالح في جبل اللكام وأن لا يؤخذوا بالجزية وأن ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين إذا حضروا معهم حربا في مغازيهم

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল। এজন্য তাদের ধর্মীয় প্রবনতার প্রতি লক্ষ্য করে এই শর্তও মঞ্জুর করা হয়েছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দেসের মধ্যে কোন ইহুদীকে বসবাস করতে দেয়া হবে না। যিম্মীদের অধিকার সংরক্ষণ সর্ম্পকে বর্ণনার সময় এ চুক্তিপত্রটি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শুধু লিখিত সনদ নয় উমর (রা.) অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকারকে বাস্তবায়নও করেছেন। মিসর বিজয়ের পর আমর বিন আস (রা.) কয়েকটি এলাকার যিম্মী অধিবাসীদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার অপরাধে বন্দী করে দাসরূপে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। এ খবর শুনে উমর (রা.) অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, "এ সমস্ত লোককে এক একজন করে ফিরিয়ে আন এবং নিজ নিজ এলাকায় স্ব স্ব ধর্মমতসহ স্বাধীনভাবে বসবাস করতে দাও। আমর বিন আস (আ.) তার এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন।"[৩৩৮]

এর পূর্বে ফুসতাত ও ইস্কান্দারিয়া অভিযানে অমুসলিম মিসরীয় 'কিবতী' যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ফায়সালা সম্পর্কে সেনাপতি আমর বিন আস উমর (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে লিখেছিলেন:

"বন্দীদেরকে সমবেত করে তাদেরকে বুঝিয়ে দাও যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে আমরা তাদেরকে মুসলামানদের সমান অধিকার প্রদান করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তারা মুসলমান না হয়, তবে জিযিয়া দিয়ে এ দেশে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে।"

উমর (রা.) এর নির্দেশানুসারে আমর (রা.) একদিন খ্রীষ্টান নেতৃবৃন্দকে ডেকে মুসলিম ও খ্রীষ্টানদেরকে একটি সভায় সমবেত করলেন। এরপর এতে কয়েক হাজার কিবতী বন্দীকে হাজির করা হল। আমর বিন আস (রা.) এক একজন করে কিবতী বন্দীকে এনে উমর (রা.) এর নির্দেশনামা পড়ে শোনালেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব ধর্মমত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে। উমর (রা.) এর সুমহান বার্তা শুনে অনেক কিবতী মুসলমান হয়ে গেল এবং অনেকে নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করলো। যারা খৃষ্টধর্মের উপর অটল থাকল মুসলিম সেনাপতি আমর তাদেরকে খ্রীষ্টানদের নিকট ফেরত দিলেন।[৩৩৯] এভাবে কোন প্রকার

[৩৩৮] আল্লামা শিবলী নোমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

[৩৩৯] আবু জাফর আত তাবারী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১০৫-১০৬

فقرأه علينا عمرو وفيه: أما بعد، فإنه جاءني كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه، ولعمري لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلي من فيء يقسم، ثم كأنه لم يكن، فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية، على أن تخيروا من في أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه، فمن اختارمنهم الإسلام فهو مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ وعليه مَا عليهم، ومن اختار دين قومه، وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه، فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردهم، ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفي له به قال: فبعث عمرو إلى صاحب الإسكندرية يعلمه الذي كتب به أمير المؤمنين قال: فقال: قد فعلت.قال: فجمعنا ما في أيدينا من السبايا، واجتمعت النصارى، فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيدينا، ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية، فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية، قال: ثم نحوزه إلينا، وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى، ثم حازوه إليهم، ووضعنا عليه الجزية، وجزعنا من ذلك جزعا شديدا، حتى كأنه رجل خرج منا إليهم

বিবাদ-বিসম্বাদ, দাঙ্গা-সংঘাত ব্যতিত তারা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন পেল। এ সভা খ্রীষ্টানদের সাথে মুসলমানদের সম্প্রীতি সৌহার্দতার আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

এছাড়া উমর (রা.) তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও অমুসলিমের ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাবাকাতে ইব্‌ন সাদ এর বর্ণনা মতে, তাঁর এক গোলামকে বারবার ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহবান করা সত্ত্বেও যখন সে মুসলমান হল না, তখন তিনি পবিত্র কুরআনের অমোঘ বাণী لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'দীনে কোন জবরদস্তি নেই।'[৩৪০] পাঠ করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন উমর (রা.) এর এই ঘটনায় বিধর্মীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানে তাঁর উদারতা প্রতীয়মান হয়। তিনি এমনই একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ যিনি স্বীয় অধীনস্ত ভিন্নধর্মী গোলামকেও তাঁর স্বীয় ধর্ম পালনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

৪.২.৬ অমুসলিমের অধিকার সংরক্ষণ

ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান ছাড়াও উমর (রা.) তাঁর অধীনস্থ যিম্মী নাগরিকদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি তাদেরকে যতটুকু মৌলিক অধিকার দিয়েছিলেন, তদানীন্তন পরাশক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের কোন অধিপতি তাদের স্বজাতি প্রজাদেরকে ততটুকু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দেয়নি। উভয় সাম্রাজ্যেই সংখ্যালঘু নাগরিকদের অবস্থা ক্রীতদাসের চেয়ে শোচনীয় ছিল। সিরীয় খৃষ্টানগণ রোমানদের স্বজাতি হওয়া নিজেদের দখলী ভূমিতে কোন প্রকার স্বত্ত্ব পায়নি। বরং শাসকদের দৃষ্টিতে তাদের জমির সাথে সাথে তারাও তাদের সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হত। ইহুদীদের অবস্থা ছিল আরো করুণ। তারা সকল প্রকার নাগরিক সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত ছিল। এছাড়া পারস্য সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টানদের অবস্থায় ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

এমতাবস্থায় উমর (রা.) এর সৈন্যবাহিনী এসব অঞ্চল অধিকৃত হলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। যারা সবসময় বঞ্চিত হত উমর (রা.) তাদেরকে যেসব অধিকার প্রদান করলেন তাতে তারা সম্পূর্ণ বিস্মিত হল। বিজয়ী নেতা হিসেবে শোষণ নয়; বরং তিনি তাদের সমস্ত মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। তাঁর সেনাপতিবৃন্দ অধিকৃত অঞ্চলের বাসিন্দাদের সাথে মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতেন। এসব চুক্তিপত্রে যিম্মীদেরকে যেসব স্বাধীনতা দেয়া হবে তার উল্লেখ থাকতো। নিম্নে স্বয়ং উমর (রা.) এর উপস্থিতিতে বায়তুল মোকাদ্দাসের অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা বর্ণিত হল,

"এটি ঐ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, যা আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন উমরের পক্ষ হতে ঈলিয়াবাসীগণকে দেয়া হচ্ছে। এই নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি তাদের জান, মাল, গির্জা, ক্রুশ, সুস্থ, অসুস্থ নির্বিশেষে সমস্ত জাতির জন্য প্রযোজ্য হবে। তদ্রূপ তাদের গীর্জাসমূহে বাস করা হবে না

[৩৪০] আল কুরআন, সূরা বাকারা : ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

এবং তার বা তার অধীনস্থ কোন কিছুর ক্ষতি করা হবে না। তাদের ক্রুশ এবং সম্পত্তির মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতিও করা হবে না। তাদের ধর্মমতের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং তাদের ব্যক্তি বিশেষেরও কোন রকম ক্ষতি করা হবে না। ঈলিয়ায় তাদের সাথে কোন ইহুদীকে বাস করতে দেয়া হবে না। ঈলিয়াবাসীদের উপর কর্তব্য হল যে, তারা অন্যান্য শহরবাসীর ন্যায় জিযিয়া প্রদান করবে এবং রোমীয়দেরকে শহর হতে বের করে দেবে। আর রোমীয়দের মধ্যেও যারা শহর থেকে চলে যেতে চায়, তাদের জন্যও জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে। যেন তারা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারে। আর যে সব রোমীয় ঈলিয়াতে বসবাস করতে চায় তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে হবে। যে সমস্ত ঈলিয়াবাসী জান-মাল নিয়ে রোমীয়দের সাথে চলে যেতে যায়, তাদের এবং তাদের গীর্জা ও ধন সম্পত্তির জন্য নিরাপদ স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত নিরাপত্তা ঘোষণা করা হচ্ছে। এই অঙ্গীকার পত্রে যা কিছু লিখা হয়েছে তাতে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, খলীফাগণ এবং সমস্ত মুসলমানের যিম্মা থাকলো, যে পর্যন্ত তারা নিয়মিত ভাবে জিযিয়া প্রদান করতে থাকবে। এই লিপির উপর খালেদ বিন ওয়ালীদ, আমর বিন আস, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ এবং মু'আবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান সাক্ষী থাকলেন এবং এটি হিজরী পনেরো সনে লিখিত হল।"[৩৪১]

এই চুক্তিপত্রটি অমুসলিমদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ওমর (রা.) এর সচেতনতার ও সহমর্মিতার পরিচয় বহন করে। তিনি এখানে মানব জীবনের প্রধান ভিত্তি জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তা ঘোষণা করেছেন।

সর্বাবস্থায় ঈলিয়াবাসীর জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলিম শাসক ও মুসলমানদের উপর অর্পণ করেছেন। এমনকি তারা তাঁর খেলাফতের আনুগত্য না করে অন্যত্র চলে যেতে চাইলে নিরাপদ স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। তাদের ধর্মীয় অধিকারকে সংরক্ষণ করেছেন। তাদের গীর্জার ইমারতের কোন প্রকার ধ্বংস সাধন করা হবে না এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

---

[৩৪১] আবু জাফর আত তাবারী, *প্রাগুক্ত*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০৯

بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد اللّه عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيَعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد اللّه وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بْن الوليد، وعمرو بْن العاص، وعبد الرحمن بْن عوف، ومعاوية بْن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة

শুধু বায়তুল মোকাদ্দেস নয়, উমর (রা.) তাঁর সমগ্র সাম্রাজ্যের অমুসলিম যিম্মী অধিবাসীদের জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর নিযুক্ত সেনাপতিরা যখনই কোন অঞ্চলে বিজয়ী নিশান উড়াতে সক্ষম হয়েছে তখনই তিনি তাদের কাছে তথাকার অধিবাসীদের নিরাপত্তার ফরমান পাঠিয়েছেন। বিষয়ে আল্লামা শিবলী নোমানী মুসলমানদের দ্বারা ফাহল বিজয়ের পর খলীফার নির্দেশ সম্পর্কিত যে বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখেছেন, "সেনাপতি আবু উবায়দা খলীফার দরবারে বিজয় সংবাদ পাঠাইলেন এবং বিজিতদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহারও বিধান চাহিয়া পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রা.) লিখিলেন, 'দেশের অধিবাসীগণকে করদাতা যিম্মী হিসেবে স্থান দাও এবং ভূমি ভূমির মালিকদের হাতে ছাড়িয়া দাও।'এই বিজয়ের পর জর্দান প্রদেশের সমগ্র এলাকা মুসলমানদের হাতে আসিয়া পড়িল। প্রত্যেক স্থানেই সন্ধিপত্রে লিখিয়া দেওয়া হইল যে, বিজিতদের জান-মাল, জমি বাড়ি, গীর্জা ও উপসনালয় সমস্ত রক্ষিত হইবে। শুধু মসজিদ নির্মাণের জন্য স্থানে স্থানে কিছু ভূমি মুসলমানগণ গ্রহণ করিবেন।"[৩৪২]

৪.২.৭ যিম্মী হত্যার বিচার

ইসলাম একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। উমর (রা.) এর সময়ে মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখেছিল। এর কারণ হল ইসলামের সম্প্রীতির নীতি অনুসরণ। উমর (রা.) নিজেও এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি বিজিত অঞ্চলসমূহের অমুসলিম প্রজাদের সাথে তাদের অধিকার প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতেন। যিম্মী নাগরিক হিসেবে জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন। অন্যায় ভাবে কোন যিম্মী ব্যক্তিকে হত্যাকাণ্ডের স্বীকার হতে হতো না। যদি কোন ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করত, উমর (রা.) সাথে সাথে এর বিচারের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি হত্যাকারী যদি মুসলিমও হত তিনি তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। আল্লামা শিবলী নোমানী ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে এ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তা হলঃ বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি হিরা প্রদেশের একজন খ্রীষ্টানকে হত্যা করেছিল। একথা জানতে পেরে উমর (রা.) তথাকার শাসনকর্তাকে উক্ত হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়দের নিকট অর্পণ করতে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। যেন তারা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক হত্যাকারীকে তাদের কাছে অর্পন করা হলে তারা তাকে হত্যা করে হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিয়েছিল। [৩৪৩]

---

[৩৪২] আল্লামা শিবলী নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
[৩৪৩] আল্লামা শিবলী নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

এভাবে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে উমর (রা.) তাঁর সাম্রাজ্যে অমুসলিম যিম্মী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন। তাঁর বিচারের বানীকে নিভৃতে অশ্রু ফেলার সুযোগ না দিয়ে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

৪.২.৮ যিম্মীদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন

ইসলাম দেশ বিজয়ী শাসক হিসেবে উমর (রা.) কে করেছে মহিমান্বিত। তিনি তাঁর রাষ্ট্রের অমুসলিম যিম্মী নাগরিকগণ যেন কখনো কোন ভাবে বঞ্চিত, শোষিত না হয় এজন্য ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি যে সব স্থানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছেন অন্যান্য বিজিত জাতির মত তথাকার অধিবাসীগণ তাদের দখলী জমির স্বত্ত্ব হারায়নি। তাদের বাড়ী-ঘর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির কোন ক্ষতি বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর দ্বারা সংগঠিত হয়নি। বরং উমর (রা.) আইন করে বিজিত অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য তাদের ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করা নিষিদ্ধ করে দেন। যেন কোনভাবেই যিম্মীদের সম্পত্তি শাসক জাতির কুক্ষিগত না হতে পারে। শুধু তাই নয়, যিম্মীরা যেন তাদের সহায় সম্পত্তি নিয়ে ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারে এজন্যে তাদের ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করার সময় তা অত্যন্ত নিম্নহারে করেছিলেন। এমনকি এ ব্যাপারেও যেন তাদের উপর কোন যুলম-নির্যাতন বা গুরুভার না চাপানো হয় তা নিয়ে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। এজন্যে ইরাকের রাজস্ব মদীনায় আসার পর তিনি সব সময় কুফা ও বসরার দশজন করে নাগরিককে ডেকে আনতেন এবং রাজস্ব আদায় করার সময় যিম্মীদের উপর সামান্যতম যুলমও হয়নি এ মর্মে তাদের নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করতেন।[৩৪৪]

৪.২.৯ যিম্মীদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন

উমর (রা.) বিজিত অঞ্চলের যিম্মীদের সাথে যেসব প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হতেন সেগুলো যথাযথ মর্যাদার সাথে পূরণের ব্যবস্থা করতেন। তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের অঙ্গীকারসমূহ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পালন করা হত। একবার সিরিয়ার কৃষকগণ মুসলিম সৈন্যগণের পথ পারাপারের সময় তাদের শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ করলে তিনি বায়তুল মাল হতে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ করেছিলেন। [৩৪৫]

এছাড়া উমর (রা.) যিম্মীদের সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ পূরণ করতে এত বেশী গুরুত্ব দিতেন যে, যদি কোন সাধারণ মুসলিম দ্বারাও সে অঙ্গীকার করা হত, তবুও তিনি তা পূরণের তাগিদ দিতেন। যেমন, মুসলিম সেনাবাহিনী একবার জুন্দিসাবুর নামক শহর অবরোধ করেছিলেন। ক্রমাগত কয়েকদিন শহর অবরুদ্ধ থাকার পর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, শহরবাসীগণ নিজেরাই শহরের

[৩৪৪] প্রাগুক্ত
[৩৪৫] প্রাগুক্ত

তোরণ খুলে অত্যন্ত শান্তভাবে কাজ কারবার করতে শুরু করেছে। তাদের এরূপ স্বাভাবিক অবস্থা দেখে মুসলমানগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং এর কারণ অনুসন্ধান করলেন। খবর নিয়ে জানা গেল, জিযিয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে এক মুসলিম গোলাম শহরের অধিবাসীদের জীবন ও সম্পদ নিরাপত্তার কথা দিয়েছে। সেনাপতি আবু মুসা আশআরী তাৎক্ষনিক ভাবে এ বিষয়টি পত্র মারফত উমর (রা.) কে জানালেন। উমর (রা.) পত্রের উত্তরে লিখলেন,"মুসলমানদের গোলাম ও মুসলমান, সুতরাং সে যার সাথে সন্ধি করেছে, প্রকারান্তরে সমস্ত মুসলমানই তার সাথে সন্ধি করেছে।" উমর (রা.) এর চিঠি পেয়ে আবু মুসা আশআরী সন্ধির সমস্ত শর্তাবলী মেনে নিলেন।[৩৪৬]

উমর (রা.) তাঁর আমলে এভাবে যিম্মীদের সাথে অঙ্গীকারকৃত ওয়াদা সমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তাঁর সুযোগ্য সেনাপতিগণও এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন।

৪.২.১০ জিযিয়া গ্রহণের উদারনীতি

যিম্মীদের নিকট থেকে নিরাপত্তা কর হিসেবে জিযিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে উমর (রা.) যেসব নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছিলেন সেগুলো তার প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় বহন করে। তিনি শুধু উপার্জনে সক্ষম সুস্থ পুরুষদের নিকট হতেই জিযিয়া গ্রহণ করতেন এবং এর বিনিময়ে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার দায় দায়িত্ব বহন করতেন। তাঁর শাসনামলে যদি কেউ জিযিয়া প্রদানে অক্ষমতার জন্য তা মওকুফের আবেদন জানাতো, তিনি প্রশস্ত চিত্তে তাদের জিযিয়া মওকুফ করে দিতেন। যেমন বাবের শাসনকর্তা শহরবাজ মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পন করে বললেন যে, আমি ইরান সাম্রাজ্যের আশ্রিত ছিলাম। ইরান জয় হওয়ার সাথে সাথে প্রকারান্তরে আমিও আপনাদের অধীন হয়ে গিয়েছি। অতএব আমি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করছি তবে আমাকে জিযিয়া হতে মুক্তি দেয়া হোক। আমি প্রয়োজন মুহূর্তে আপনাদের সৈন্য

---

[৩৪৬] আবু জাফর আত তাবারী, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৩-৯৪

عن شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة وأبي عمرو وأبي سفيان والمهلب قالوا: لما فرغ أبو سبرة من السوس خرج في جنده حتى نزل على جندى سابور، وزر بْن عبد اللَّه بْن كليب محاصرهم، فأقاموا عليها يغادونهم ويراوحونهم القتال، فما زالوا مقيمين عليها حتى رمي إليهم بالأمان من عسكر المسلمين، وكان فتحها وفتح نهاوند في مقدار شهرين، فلم يفجا المسلمين إلا وأبوابها تفتح، ثم خرج السرح، وخرجت الاسواق، وانبث أهلها، فأرسل المسلمون: ان ما لكم؟ قالوا:رميتم إلينا بالأمان فقبلناه، وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا فقالوا:ما فعلنا، فقالوا: ما كذبنا، فسأل المسلمون فيما بينهم، فإذا عبد يدعى مكنفا كان أصله منها، هو الذي كتب لهم فقالوا: إنما هو عبد، فقالوا: إنا لا نعرف حركم من عبدكم، قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه،ولم نبدل، فإن شئتم فاغدروا فأمسكوا عنهم، وكتبوا بذلك إلى عمر، فكتب إليهم: إن الله عظم الوفاء، فلا تكونون اوفياء حتى تفوا، ما دمتم في شك أجيزوهم، وفوا لهم فوفوا لهم، وانصرفوا عنهم.

সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকব।[৩৪৭] যেহেতু জিযিয়ার সম্পদ দেশ রক্ষার কাজেই ব্যয় করা হয়, এজন্যে তার এই শর্ত মঞ্জুর করা হয়েছিল।

এছাড়া উমর (রা.) কোন যিম্মী দেশ রক্ষার কাজে সক্রিয়ভাবে যোগদান করলেই তিনি তাদের জিযিয়া মাফ করে দিতেন। হিজরী বাইশ সনে জুরজান প্রদেশ মুসলমানদের করায়ত্ত হওয়ার পর খলীফা তাদের যে ফরমান দিয়েছিলেন তা হল : "তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের উপর। তবে এর পরিবর্তে তোমাদেরকে জিযিয়া দিতে হবে, আর তোমাদের দ্বারা যদি আমরা কোন প্রকার সাহায্য পাই, তবে তার পরিবর্তে জিযিয়া মাফ হয়ে যাবে"।[৩৪৮] উমর (রা.) এ ব্যাপারে এতটাই উদার ছিলেন যে, যদি কোন যিম্মী বৎসরে একবার মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হত তবে তিনি তার সেই বৎসরের সম্পূর্ণ জিযিয়া মওকুফ করে দিতেন। যেমন আজারবাইজান জয় করার পর তথাকার অধিবাসীদেরকে লিখে দেয়া হয়েছিল, "যে সমস্ত লোক বৎসরে অন্ততঃ একবারও মুসলমান সৈন্যদের সাথে যোগদান করবে তাদেরও জিযিয়া মাফ করে দেয়া হবে।"[৩৪৯]

এতদ্ব্যতীত উমর (রা.) দুস্থ, অসহায়, বৃদ্ধ, অক্ষম যিম্মীদের জিযিয়া শুধু মওকুফই করতেন না বরং তাদের ব্যয়ভার গ্রহণের ব্যবস্থা নিতেন। এ সম্পর্কে ইতিহাসে একটি ঘটনা বিখ্যাত হয়ে আছে তা হল "একবার উমর (রা.) একজন অতি বৃদ্ধ যিম্মীকে ভিক্ষা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন , ভিক্ষা কর কেন? বৃদ্ধ লোকটি বলল যে, এখন আমার আর উপার্জন করার ক্ষমতা নেই অথচ আমার উপর জিযিয়ার কর বসানো হয়েছে। এজন্য ভিক্ষা করছি। উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ এই বৃদ্ধকে সাথে নিয়ে বাড়ীতে আসলেন এবং নিজে তাকে কিছু সাহায্য করে বায়তুল মালের প্রধান কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন যেন এই বৃদ্ধের পরিবার পরিজনের সমস্ত ব্যয়ভার বায়তুল মাল হতে বহন করা হয়। এই নির্দেশ দেবার সময় তিনি বলছিলেন এটি কিছুতেই ইনসাফ নয় যে, আমরা এসব লোকের দ্বারা যৌবন সময়ে উপকৃত হব, আর বৃদ্ধাবস্থায় তাদেরকে জীবিকার জন্য ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেব।"[৩৫০]

---

[৩৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة، لا ينسبون إلى أحساب، وليس ينبغي لذي الحسب والعقل أن يعين أمثال هؤلاء، ولا يستعين بهم على ذوي الأحساب والأصول، وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان، ولست من القبج في شيء، ولا من الأرمن، وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي، فأنا اليوم منكم ويدي مع أيديكم، وصغوي معكم، وبارك اللّه لنا ولكم، وجزيتنا إليكم النصر لكم، والقيام بما تحبون، فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم

[৩৪৮] আত তাবারী, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫২

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ سويد بْن مقرن لرزبان صول ابن رزبان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان، إن لكم الذمة، وعلينا المنعة، على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم، على كل حالم، ومن استعنا به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا من جزائه، ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم، ولا يغير شيء من ذلك هو إليهم ما أدوا وأرشدوا ابن السبيل ونصحوا وقروا المسلمين، ولم يبد منهم سل ولا غل، ومن أقام فيهم فله مثل ما لهم، ومن خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، وعلى أن من سب مسلما بلغ جهده، ومن ضربه حل دمه شهد سواد بْن قطبة، وهند بْن عمرو، وسماك بْن مخرمة، وعتيبة بْن النهاس وكتب في سنة ثمان عشره

[৩৪৯] আল্লামা শিবলী নোমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০

[৩৫০] আবু ইউসুফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

জিযিয়ার নিম্নহারে নির্ধারণ, জিযিয়া মওকুফ ছাড়াও উমর (রা.) এর সময় যিম্মীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের প্রদানকৃত জিযিয়া ফেরত দিতেও দেখা যায়। ইয়ারমুক যুদ্ধের প্রাক্কালে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু উবায়দা রাজস্ব সচিব হাবীব ইব্‌ন মাসলামাকে নির্দেশ দিলেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে হিমসবাসী খ্রীষ্টানদের নিকট হতে জিযিয়া বাবদ যা গ্রহণ করা হয়েছে তা সবটুকু ফেরত দেয়া হোক। কেননা, আমরা তাদেরকে শক্রর আক্রমণ হতে রক্ষা করব বলেই তা গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এখন আমরা তা করতে সক্ষম হচ্ছিনা। সুতরাং তাদের জিযিয়া রাখার কোন অধিকার আমাদের নেই। তাদের একথাও বলে দাও যে, আমাদের সাথে তোমাদের যে সম্পর্ক ছিল, এখনও তা বজায় আছে। তবে তোমাদের পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে পারবো না বলেই তোমাদের প্রদত্ত জিযিয়া ফেরত দিচ্ছি। মুসলমানদের এরূপ ইনসাফ স্থানীয় ইহুদী ও খ্রীষ্টান অধিবাসীদের অন্তর তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় সিক্ত হল। তারা মুসলিম বাহিনীর বিদায়কালে অশ্রুসজল নয়নে বলছিল, তাওরাতের শপথ, আমরা এই শহরে কিছুতেই রোমীয়দেরকে প্রবেশ করতে দিব না। অচিরেই তোমরা ফিরে আসবে।[৩৫১] আবু উবায়দা শুধু হিম্‌সবাসীর প্রতিই এই সুবিচার করলেন না; বরং পার্শ্ববর্তী যতগুলো স্থান মুসলমানগণ দখল করেছিলেন তার প্রত্যেক শাসনকর্তার নিকট অনুরূপ ভাবে জিযিয়া ফেরত দেয়ার নির্দেশ পাঠালেন।

৪.২.১১ বিধর্মীদের প্রতি যুলম নির্যাতনের পথ রুদ্ধকরণ

উমর (রা.) এর খেলাফতকালে কোন অমুসলিম যিম্মী নাগরিক শাসক শ্রেণীর অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়নি। তিনি অমুসলিম যিম্মীদের প্রতি অত্যাচার নিপীড়ন ও নিস্পেষণের সকল দ্বার রুদ্ধ করে দেন। তৎকালীন সাম্রাজবাদী শক্তি পারস্য, রোম এর দ্বারা নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত জনতা মুসলমানদের মাধ্যমে তাদের অঞ্চল অধিকৃত হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। উমর (রা.) এর খেলাফতের অধীনে এসে তারা আনন্দ চিত্তে আনুগত্যের সাথে বসবাস করতে লাগলো। উমর (রা.) তাদের ন্যায্য অধিকারসমূহ নিশ্চিত করেছিলেন। তাদের প্রতি যেন কোন প্রকার অত্যাচার নির্যাতন না করা হয় সে জন্য মুসলিম কর্মচারীগণকে তিনি বার বার সতর্ক করে দিতেন। একবার উমর (রা.) সিরিয়া হতে ফেরার সময় দেখতে পেলেন, একদল লোককে রোদে দাঁড় করিয়ে তাদের মাথায় তেল ঢেলে দেয়া হচ্ছে। তিনি এদের এরূপ শাস্তির কারণ জানতে চাইলে কর্মচারীগণ উত্তর দিলেন, এরা জিযিয়া পরিশোধ করেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এদের

وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَن أبي بكرَة قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِبَابِ قَوْمٍ وَعَلَيْهِ سَائِلٌ يَسْأَلُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَضَرَبَ عَضُدَهُ مِنْ خَلْفِهِ، وَقَالَ: مِنْ أَيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْتَ؟ فَقَالَ: يَهُودِيٌّ. قَالَ: فَمَا أَلْجَأَكَ إِلَى مَا أَرَى؟ قَالَ: أَسْأَلُ الْجِزْيَةَ وَالْحَاجَةَ وَالسِّنَّ. قَالَ: فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ، وَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَرَضَخَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَنْزِلِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَازِنِ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ: انْظُرْ هَذَا وَضُرَبَاءَهُ؛ فَوَاللَّهِ مَا أَنْصَفْنَاهُ أَن أكلنَا شبيته ثُمَّ نَخْذُلُهُ عِنْدَ الْهَرَمِ

[৩৫১] আল্লামা শিবলী নোমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

না দেয়ার কারণ কি? লোকেরা জানালেন, এরা জিযিয়া প্রদানে অক্ষম। তখন উমর (রা.) বললেন, এদের ছেড়ে দাও। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'মানুষকে শাস্তি দিওনা। দুনিয়ার মানুষকে অহেতুক শাস্তি দিলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের জন্য শাস্তি বিধান করবেন।'[৩৫২]

এছাড়া উমর (রা.) বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত মুসলিম সেনাপতিদেরকেও যিম্মীদের প্রতি যেন যুলম না করা হয় এ মর্মে নির্দেশ পাঠাতেন। এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য এসব চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এটি আলাদা করে উল্লেখ করতেন। সিরিয়া বিজয়ের পর সেনাপতি আবু উবায়দা (রা.) এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে লিখিত ছিল, "আমি মুসলমানদেরকে যিম্মীদের যুলম করতে, তাদের অনিষ্ট করতে এবং ন্যায় পন্থা ব্যতীত তাদের সম্পত্তি ভোগ করতে নিষেধ করছি। তোমরা তাদের সাথে যেসব অঙ্গীকার করেছ, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করো।"[৩৫৩]

যিম্মীদের প্রতি জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধে উমর (রা.) সরকারী কর্মচারীদের উপর অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করতেন যেন অহংকার বশত তারা কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন না করে। সাধারণত সরকারী কর্মচারী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনরা ক্ষমতার দাপটে জনসাধারণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং অত্যাচারী হয়ে উঠে। উমর (রা.) এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর শাসনাধীনে এসব অপরাধকে কঠোর হস্তে দমন করেন। একবার মিসরের গর্ভণর আমর বিন আস (রা.) এর ছেলে একজন খ্রীষ্টান যিম্মী নাগরিককে অন্যায় ভাবে চপেটাঘাত করেছিল। সে ব্যক্তি উমর (রা.) এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি সাথে সাথে আমর বিন আস (রা.) ও তার ছেলেকে ডেকে পাঠান। যিম্মী ব্যক্তিকে তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং আমর বিন আস (রা.) কে তিরষ্কার করে বলেন, কবে থেকে লোকদেরকে গোলাম বানাতে শুরু করেছ? অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন রূপে প্রসব করেছে।[৩৫৪]

---

[৩৫২] আবু ইউসুফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِطَرِيقِ الشَّامِ وَهُوَ رَاجِعٌ فِي مَسِيرِهِ مِنَ الشَّامِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ يُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتَ فَقَالَ: مَا بَالُ هَؤُلاءِ؟ فَقَالُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ لَمْ يُؤَدُّوهَا؛ فَهُمْ يُعَذَّبُونَ حَتَّى يُؤَدُّوهَا؛ فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا يَقُولُونَ هُمْ وَمَا يَعْتَذِرُونَ بِهِ فِي الْجِزْيَةِ؟ قَالُوا: يَقُولُونَ لَا نَجِدُ، قَالَ: فَدَعُوهُمْ، لَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يَطِيقُونَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تُعَذِّبُوا النَّاسَ فَإِنَّ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بهم فخلى سبيلهم.

[৩৫৩] আল্লামা শিবলী নোমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

[৩৫৪] আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ আল মিসরী, ফুতুহুল *মিসর ওয়াল মাগরিব*, (মাকতাবাতুছ ছাকাফাতুদ দিয়নিয়্যাহ, ১৪১৫ হি),পৃ. ১৯৫

فأتى رجل من أهل مصر كما حدّثنا عن أبى عبدة، عن ثابت البنانىّ وحميد، عن أنس إلى عمر بن الخطّاب فقال: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم، قال: عذت معاذا، قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربنى بالسّوط، ويقول: أنا ابن الأكرمين، فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه، فقدم، فقال عمر: أين المصرىّ؟ خذ السوط فاضرب، فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الألأمين، قال أنس: فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحبّ ضربه فما أقلع عنه حتى تمنّينا أنه يرفع عنه، ثم قال عمر للمصرىّ: ضع على ضلعة عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربنى وقد اشتفيت منه، فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا؟

৪.২.১২ সাম্য প্রতিষ্ঠা

উমর (রা.) এর শাসন প্রণালীর দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে, তিনি নাগরিকদের অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলমান ও যিম্মীদের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্যের প্রশ্রয় দিতেন না কোন মুসলমান কোন যিম্মী নাগরিককে হত্যা করলে তিনি নির্দ্বিধায় সে মুসলমান ব্যক্তিকে কিসাস হিসেবে প্রাণদণ্ড দিতেন। কোন যিম্মী মুসলমান কর্তৃক তিরস্কৃত হলে তিনি এর সমুচিত শাস্তি বিধান করতেন। যিম্মীদের নিকট হতে জিযিয়া ও বাণিজ্য শুল্ক ছাড়া আর কোন কর গ্রহণ করা হত না। অপরদিকে মুসলমানদের নিকট হতে যাকাত আদায় করা হত। যার পরিমাণ ছিল উল্লেখিত দু'প্রকার করের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া মুসলামানরা ব্যণিজ্য শুল্কও দিত। বায়তুলমাল হতে নাগরিকদেরকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য যে ভাতা প্রদান করা হত তাতে মুসলমান ও যিম্মীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না।

জীবিকার্জনে অক্ষম যিম্মী ও মুসলমান নাগরিকদের বৃত্তি প্রদানেও বৈষম্য করা হত না, বরং যিম্মীদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের চেয়েও উদার হস্ত ছিলেন।[৩৫৫]

এছাড়া যিম্মীদের মান-সম্মান ও সামাজিক মর্যাদাও মুসলমানদের অনুরূপ রক্ষা করা হতো। এমনকি তাদের প্রতি কোন অপমান বা ঘৃণাসূচক কথা বলাও ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। শাসন কর্তৃপক্ষ এরূপ কাজ হতে বিরত থাকতে সচেষ্ট ছিলেন। আল্লামা নোমানী তাঁর গ্রন্থে এরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তা হল: উমাইর ইব্ন সাদ হিমসের শাসনকর্তা ছিলেন। খেলাফত যুগে সমস্ত কর্মচারীর মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী নম্র, ভদ্র ও খোদাভীরু বলে গণ্য ছিলেন; একবার তিনি হঠাৎ বিরক্ত হয়ে এক যিম্মী নাগরিককে 'হতভাগা আল্লাহ তোমাকে অপদস্ত করুন' একথা বলেছিলেন। পরে একথার জন্য তিনি এত অনুতপ্ত হলেন যে, মদীনায় এসে শাসনকর্তার পদ হতে পদত্যাগ করে বললেন এই পদের জন্যই আমার মুখ হতে এই অশোভন উক্তি নিঃসৃত হয়েছে।[৩৫৬]

৪.২.১৩ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সদ্ব্যবহার

উমর (রা.) অমুসলিম যিম্মীদের প্রতি খলীফা হিসেবে অত্যন্ত সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। নিরাপত্তার চুক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর শাসনামলে যেসব যিম্মীরা ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে লিপ্ত ছিল তিনি তাদের সাথে এমন সহিষ্ণু আচরণ করেছেন যা তাঁর সহৃদয়তার পরিচয়ক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যিম্মীদের এসব কাজে তিনি কখনো প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বরং এমন পরিস্থিতিতে তাদের সাথে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লামা নোমানী এ সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তা হল: সিরিয়ার শেষ

---

[৩৫৫] আল্লামা শিবলী নোমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২-২০৩

[৩৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪

Dhaka University Institutional Repository

সীমান্তে আরবেসূস নামক একটি শহর রোমীয় সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত ছিল। সিরিয়া জয়ের সাথে এ শহরটিও মুসলমানদের অধিকারে আসে। অতঃপর শহরবাসীদের সাথে মুসলমানদের তরফ হতে একটি নিরাপত্তামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা সব সময়ই গোপনে রোমীয়দের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হত এবং মুসলমানদের সর্বপ্রকার গোপন খবর শত্রুদের জানিয়ে দিত। তথাকার শাসনকর্তা উমাইর ইব্‌ন সাদ এ বিষয়টি খলীফাকে অবহিত করেন। উমর (রা.) এসব রাষ্ট্রদ্রোহিতামুলক কাজের প্রতিকারার্থে তাঁকে লিখে পাঠালেন যে, ‘তাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করে তার দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে তাদের কোথাও চলে যেতে বল। অন্যথায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দাও যে, তাদেরকে আরও এক বৎসর সময় দেয়া হচ্ছে, ইতোমধ্যে যদি তারা এসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ হতে বিরত না হয়, তবে তাদেরকে নির্বাসিত করা হবে। শেষ পর্যন্ত যখন কিছুতেই এরা এরূপ রাষ্ট্রদ্রোহিতা ত্যাগ করল না, তখন পরবর্তী বৎসর বাধ্য হয়ে তাদের নির্বাসিত করা হয়।”[৩৫৭]

নাজরানের খ্রীষ্টানরা ইয়েমেন এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করত। তারা গোপনে বিদ্রোহের প্রস্তুতি আরম্ভ করে ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে ফেলে। উমর (রা.) এই আসন্ন বিদ্রোহ দমনের জন্য তাদেরকে ইয়েমেন ত্যাগ করে ইরাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময় তিনি তাদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করে অত্যন্ত সহৃদয়তার পরিচয় দেন। তাদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি লিখে দেয়া হয় এবং তার মধ্যে উল্লেখ করা হয় যে, এসব লোক ইরাক অথবা সিরিয়া প্রদেশের যে কোন এলাকায় যাবে তথাকার শাসনকর্তা তাদের পূনর্বাসন এবং কৃষিকাজের জন্য ভূমি ব্যবস্থা করে দেবেন এবং দীর্ঘ দুই বৎসর পর্যন্ত তাদের নিকট হতে জিযিয়া আদায় করা হবে না। তারা মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হলে মুসলমানগণ সর্বপ্রকার সাহায্য দানে বাধ্য থাকবেন। এই আদেশের বিশেষ গুরুত্বের জন্য এর মধ্যে বিশিষ্ট সাহাবীগণ পর্যন্ত দস্তখত করেন।[৩৫৮]

এছাড়া উমর (রা.) ফেদাকের ইহুদীদেরকে বহিস্কার করার সময় তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব নিকাশ একজন বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে গ্রহণ করেন এবং বায়তুল মাল হতে তার উপযুক্ত মূল্য প্রদান করে তাদের প্রতি ইনসাফ করেন।

---

[৩৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

[৩৫৮] ইমাম আবু ইউসুফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا مَا كَتَبَ بِهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لأَهْلِ نَجْرَانَ مَنْ سَارَ مِنْهُمْ آمِنٌ بِأَمَانِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفَاءً لَهُمْ بِمَا كَتَبَ لَهُمْ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

"أَمَّا بَعْدُ": فَمن مروا بِهِ من أرماء الشَّام وأمراء الْعرَاق فليسقوهم من حرث الأَرْض، فَمَا اعتملوا مِنْ ذَلِكَ فَهُو لَهُمْ صَدَقَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ وَعَقْبَةٌ لَهُمْ مَكَانَ أَرْضِهِمْ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ لأَحَدٍ وَلا مَغْرَمَ.

"أَمَّا بَعْدُ"؛ فَمَنْ حَضَرَهُمْ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَلْيَنْصُرْهُمْ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمْ فَإِنَّهُمْ أقواهم لَهُم الذِّمَّة وجريتهم عَنْهُمْ مَتْرُوكَةٌ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ شَهْرًا بَعْدَ أَنْ يَقْدِمُوا وَلا يُكَلَّفُوا إِلا مِنْ صُنْعِهِمُ الْبِرَّ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلا مُعْتَدَى عَلَيْهِمْ. شَهِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ وَمُعَيْقِيبٌ، وَكَتَبَ

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.১৪ সমস্যা সমাধান সমতা

এই কথা সর্বজন জ্ঞাত যে, উমর (রা.) শাসক হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবাৎসল। তিনি জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য থাকতেন সদা তৎপর। এ ক্ষেত্রেও তিনি কখনো মুসলিম ও অমুসলিম যিম্মী নাগরিকগণের প্রতি কখনো কোন বৈষম্য করেননি। বরং তাদের অভাব অভিযোগকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শুনতেন এবং তাৎক্ষণিক ভাবে তা সমাধার আদেশ দিতেন। একবার ইরাকের বাণিজ্য শুল্ক আদায়কারী যিয়াদ ইব্‌ন হুদাইর এক খ্রীষ্টান ঘোড়ার ব্যবসায়ীর নিকট হতে বাণিজ্য শুল্ক আদায় করলেন এবং সে ব্যক্তি তার দেশে ফেরার পথে আবার তার কাছে শুল্ক দাবী করা হল। কিন্তু সে পুনরায় শুল্ক প্রদান না করে সরাসরি উমর (রা.) এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করল। তিনি সবকিছু শুনে এতটুকু বললেন যে, তুমি যেতে পার এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হবে। লোকটি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যেতে যেতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে দ্বিতীয়বার শুল্ক দিয়েই সে ফিরে যাবে। কিন্তু ফেরার পথে শুল্ক অফিসে পৌঁছে দেখল, তার পূর্বেই সেখানে খলীফার আদেশ পৌঁছে গিয়েছে যে, একই দ্রব্যের উপর দু'বার করে শুল্ক আদায় করা যাবে না।

অনুরূপ আর একজন খ্রীষ্টান ব্যক্তির মালামাল আটকা পড়লে সেও খলীফার কাছে উপস্থিত হল। সে সময় তিনি হারাম শরীফে খুৎবা পাঠ করছিলেন। লোকটি সে অবস্থাতেই এসে তাঁর নিকট অভিযোগ করল। তিনিও বলে দিলেন, 'কিছুতেই নয়, এক পণ্যের উপর দু'বার করে শুল্ক আদায় হতে পারে না। 'তারপর লোকটি কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করে অন্য একদিন তাঁর নিকট এসে বিনয়ের সাথে বলল, মহোদয় আপনার আমার কথা স্মরণ আছে কি? আমি সেই খ্রীষ্টান যে আপনার কাছে শুল্ক সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল। প্রত্যুত্তরে উমর (রা.) বললেন, 'অবশ্যই মনে আছে, আমিও ঐ মুসলমান যে অভিযোগ শোনা মাত্রই তোমার কাজ করে দিয়েছি।'[৩৫৯] অত:পর লোকটি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে, সঙ্গে সঙ্গেই শুল্ক আদায়কারী যিয়াদ ইব্‌ন হুদাইর এর নিকট উক্ত হুকুম পৌঁছে গিয়েছিল।

৪.২.১৫ যুদ্ধবন্দীদের দাসত্বের শৃংঙ্খল থেকে মুক্তিদান

উমর (রা.) এর খেলাফতকালে মুসলমানগণ প্রায় অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিল। এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যুদ্ধবন্দী অমুসলিম নাগরিকদের দাসত্বের শৃংঙ্খলে আবদ্ধ না করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনি দাস প্রথা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আজীবন। এমনকি অমুসলিম নিরুপায়

---

[৩৫৯] আবু ইউসুফ, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ১৫০

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ مَرَرْتُ عَلَى زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ فَأَخَذَ مِنِّي، ثُمَّ انْطَلَقْتُ فَبِعْتُ سِلْعَتِي، ثمَّ أَرَادَ أَن يَأْخُذ من قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ فِي السَّنَةِ إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِيَّ، وَمَكَثْتُ أَيَّامًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي كَلَّمْتُكَ فِي زِيَادٍ. فَقَالَ: وَأَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفِيُّ قَدْ قَضَيْتُ حَاجَتَكَ.

যুদ্ধবন্দীদেরকেও দাস দাসীতে পরিণত না করার পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। খলীফা হিসেবে তিনি বিভিন্ন স্থান জয়ের পর সেনাপতিদের এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে ফরমান পাঠাতেন। ফারেস, খোযিস্থান, কেরমান, জাযিরা প্রভৃতি জয় করার সময় ফরমান নামায় স্পষ্টভাবে লিখে দেয়া হয়েছিল যে, এসব স্থানের অধিবাসীগণের জানমালের উপর মুসলমানগণ কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। সামেগান, জুন্দেসাবুর, শিরাজ প্রভৃতির অধিবাসীগণকে আরও পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছিল যে, অধিবাসীদেরকে ধরে এনে দাস দাসীতে পরিণত করা হবে না।

মানাযের নামক স্থানের একদল যুদ্ধবন্দীকে সৈন্যগণ কর্তৃক দাস বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু উমর (রা.) তা জানতে পেরে কঠোর নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, এদেরকে ছেড়ে দাও এবং এদের উপর ভূমি রাজস্ব ও জিযিয়া ধার্য করে দাও। আবু মুসা আশআরী (রা.)কে অন্য এক ফরমানে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, 'কোন অবস্থাতেই যেন কোন কৃষক বা শ্রমিককে দাসে পরিণত না করা হয়।'[৩৬০]

এছাড়া একবার মিসর বিজয়ী সেনাপতি আমর বিন আস (রা.) কয়েকটি এলাকার অধিবাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে বন্দী করে দাসরূপে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। এ খবর শুনে উমর (রা) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং কড়াভাবে নির্দেশ পাঠালেন যে, এ সমস্ত লোককে একজন একজন করে ফিরিয়ে আন এবং নিজ নিজ এলাকায় স্ব স্ব ধর্মমত সহ স্বাধীনভাবে বসবাস করতে দাও।[৩৬১]

এভাবে উমর (রা.) বিধর্মী ব্যক্তিদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে তাদেরকে মানুষ হিসেবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে বুকে আগলে নিতেন। তাদের মান মর্যাদা রক্ষা করতেন। তাবারী তাঁর গ্রন্থে এরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, 'আমর বিন আস (রা.) মিসর জয় করার সময় সর্বপ্রথম বালীস নামক এক স্থান আক্রমণ করেন; ভীষণ যুদ্ধের পর মুসলমানগণ জয়ী হলেন, তাঁদের হাতে প্রায় তিন হাজার সৈন্য বন্দী হল। এদের সাথে মিসর রাজ মকুকাশের মানুছা নামক এক কন্যাও বন্দী হন। কিন্তু আমর বিন আস (রা.) তাঁকে দাসীতে পরিণত করার পরিবর্তে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তার পিতা মকুকাশের কাছে পাঠিয়ে দেন। বিশেষ সাবধানতার জন্য কায়স ইব্‌ন আবুল আস নামক একজন বিশিষ্ট সরদারকেও তাঁর সাথে প্রেরণ করা হয়েছিল।[৩৬২]

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীই প্রমাণ করে উমর (রা.) প্রতিপক্ষ জাতির প্রতি কতটা উদার ও সহনশীল ছিলেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে তার প্রশাসনিক কর্মতর্কারাও বিধর্মী জাতির সাথে সদ্ব্যবহার, ইনসাফ, সাম্য ও সৌহার্দ বজায় রেখেছিল।

৪.২.১৫ বিজিত জাতির প্রতি নীতি

[৩৬০] আল্লামা শিবলী নোমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২
[৩৬১] আল্লামা শিবলী নোমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫
[৩৬২] আল্লামা শিবলী নোমানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩

ইতিহাস বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী নেতা আলেকাজান্ডার, হালাকু খান প্রমূখ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন দেশ জয় করে সেসব স্থানে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। সেসব স্থানে চালানো হয়েছিল নির্মম ধ্বংসজজ্ঞ তথাকার অধিবাসীদের সাথে করা হয়েছিল নির্মম নৃশংস আচরণ। কিন্তু উমর (রা.) প্রায় অর্ধেক পৃথিবী জয় করেও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছেন। তিনি বিজিত জাতির জীবনের জন্য হুমকি না হয়ে তাদের প্রাণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের সম্পদ লুটতরাজের পরিবর্তে তা তাদের দখলে রেখে উন্নয়নের ধারা বজায় রেখেছেন। বহিঃশত্রুর হাত থেকে তাদের রক্ষা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের নির্মম অত্যাচার শোষনের কবল থেকে তাদেরকে বাঁচাতে মুক্তির দূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর শাসনামলে বিজাতীয়দের প্রতি ইসলামের ইনসাফ, সাম্য ও ন্যায়ের নীতিমালাগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি মদীনা থেকে বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে তার সুস্পষ্ট নীতিমালা সেনাপতিদের কাছে প্রেরণ করতেন। যেমন ইস্কান্দারিয়া বিজয়ী সেনাপতি আমর বিন আস (রা.) এর প্রতি তাঁর প্রেরিত চিঠি, "সালামুন আলাইকা, তোমার পত্র পেলাম। জানতে পারলাম ইস্কান্দারিয়ার গভর্নর নিরাপত্তা কর দিতে প্রস্তুত। তবে সে একটি শর্ত আরোপ করেছে। তা হল, এলাকা থেকে যেসব লোক বন্দী হয়েছে তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। শপথ করে বলছি, সম্পদের চেয়ে নিরাপত্তা কর আমার পছন্দনীয়। যা দেশরক্ষা বিভাগের সৈনিকদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারায় শেষ হয়ে যায়। তুমি ইস্কান্দারিয়ার গভর্নরের শর্ত মেনে নাও। বন্দীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা দাও। তারা ইচ্ছা করলে ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা খ্রীষ্টধর্মেই থেকে যাবে। যারা মুসলিমদের দলভুক্ত হবে তাদেরকে অন্যান্য মুসলিমের মতোই অধিকার ও দায়িত্ব দেবে। যারা স্বগোত্রে স্বধর্মে বহাল থাকবে তারা নিরাপত্তা কর দেবে। অথবা দেশরক্ষা বিভাগে যোগ দেবে। আমরা এরূপ অঙ্গীকার করতে পারবো না; যা পূরণ করতে অক্ষম। কারণ, যেসব বন্দী এতোদিনে মক্কা, মদীনা ও ইয়েমেনে চলে গেছে, তাদের এখন ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।"[৩৬৩]

৪.২.১৬ অন্তিম মুহূর্তে যিম্মীদের নিরাপত্তার জন্য ওসীয়ত

বিজাতীয় মানুষের প্রতি উমর (রা.) এতটাই উদার এবং সচেতন ছিলেন যে, তাদের অধিকারের কথা তিনি তার অন্তিম মুহূর্তেও ভূলতে পারেননি। তিনি তখনও পরবর্তী খলিফার জন্য তাদের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে অসীয়ত করে যান। আমর বিন মাহমুন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে ওসীয়ত করছি তিনি যেন আল্লাহ এবং তার রাসূলের যিম্মার দিকে বিশেষ

---

[৩৬৩] আত তাবারী, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৫-১০৬

أما بعد، فإنه جاءني كتابك تذكر أن صاحب الإسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه، ولعمري لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحب إلي من فيء يقسم، ثم كأنه لم يكن، فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية، على أن تخيروا من في أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه، فمن اختار منهم الإسلام فهو مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَهُ مَا لَهُمْ وعليه مَا عليهم، ومن اختار دين قومه، وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه، فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردهم، ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفي له

নজর রাখেন। অর্থাৎ তাদের সাথে যে সব অঙ্গীকার করা হয় তা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। তাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা হয় এবং তাদের উপর সাধ্যতীত কোন কর না চাপানো হয়।'[৩৬৪] উমর (রা.) এর হৃদয়ের প্রশস্ততার নিদর্শন হল মৃত্যুর পূর্বে করা অসীয়ত। কেননা তাঁকে যে আততায়ী ছুরিকাঘাত করেছে, রক্তে রঞ্জিত করেছে তাঁর শরীর, যার জন্য তিনি এখন মৃত্যু পথযাত্রী, সে আবু লু'লু' হল একজন অগ্নিপূজক। সে ছিল মুগীরা ইব্‌ন শু'বা এর গোলাম । দুই পাশে ধারাল খঞ্জর দ্বারা সে অত্যন্ত নির্মমভাবে উমর (রা.) কে আঘাত করে। আর এই আঘাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ইব্‌ন কাসীর। তিনি বলেছেন,"রোম নিবাসী অগ্নিপূজক বংশোদ্ভুত আবু লুলু ফীরোয নামক একটি গোলাম তাকে দুইদিকে ধারাল খঞ্জর দ্বারা হঠাৎ আঘাত করে। তিনি তখন মসজিদের মিহরাবে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। দিনটি ছিল বুধবার। বছরের যুলহাজ্জাহ্ মাসের বাকি ছিল চারদিন। তাকে সে তিনটি আঘাত করেছিল। কেউ কেউ বলেন, 'ছয়টি আঘাত করেছিল', তন্মধ্যে একটি ছিল নাভীর নিচে। তাতে উদরের আবরক ঝিল্লি কেটে যায় ও তিনি দণ্ডায়মান অবস্থা থেকে নিচে ঢলে পড়লেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ইমামতির জন্যে তাঁর স্থলে দাঁড়ালেন। কাফিরটি তার খঞ্জরসহ প্রত্যাবর্তন করল ও যাকে সামনে পেল তাকেই আঘাত করল। এভাবে সে ১৩ জনকে আঘাত করল। তন্মধ্যে ৬ জন মারা গেল। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আউফ (রা.) তার উপর বুর্নুস (আরব ও মুরদের পরিধেয় মস্তকাবরণ যুক্ত ঢিলেঢালা পরিচ্ছেদ) নিক্ষেপ করেন, তাতে সে আটকা পরে যায় এবং সে নিজেকে হত্যা করে। উমর (রা.) কে তাঁর বাড়িতে নেওয়া হয়। তাঁর জখমী থেকে রক্ত ঝরছিল। আর এ ঘটনাটি সুর্যোদয়ের পূর্বের। একবার তিনি চেতনা পান আবার অচেতন হয়ে যান।

উপস্থিত লোকেরা তাকে সালাতের কথা স্মরণ করিয়েছেন তখন তিনি চেতনা ফিরে পান এবং বলেন, হ্যাঁ, যে এ সালাতকে ছেড়ে দেবে তার ইসলামে কোন অংশ নেই। তারপর সময়ের মধ্যে তিনি সালাত আদায় করেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কে তাকে হত্যা করেছে? উপস্থিত জনতা বললেন, সে ছিল আবু লুলু, মুগীরা ইব্‌ন শুবাহ (রা.) এর গোলাম। একথা শুনে তিনি বলেন, আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমার মৃত্যু এমন লোকের মাধ্যমে করাননি যে ঈমানের দাবী করে অথচ আল্লাহর দরবারে একটি সিজদাহও করে না। তারপর তিনি বলেন, "আল্লাহ তাকে কুৎসিত করুন। আমরা তাকে সৎকাজের পরামর্শ দিয়েছিলাম। মুগীরা (রা.) তার উপর প্রত্যহ দুই দিরহাম কর ধার্য করেছিলেন। তারপর তিনি উমর (রা.) এর কাছে আবেদন করেছিলেন যেন, তিনি তার উপর অর্পিত কর বৃদ্ধি করে দেন। কেননা, সে ছিল কাঠ মিস্ত্রি, খোদাইকার ও কামার"।

---

[৩৬৪] জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন হাসান, *মাহাদ্দুস সাওয়াব ফি ফাদায়িলী আমিরীল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাব*, (মদীনা : ইমাদাতুল বাহাছ আল ইলমি বিল জামিআতুল ইসলামিয়্যা, সনঃ ২০০০ইং), ৩য় খন্ড, পৃ. ৮৩০

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِأَهْلِ الذِّمَّةِ خَيْرًا , أَنْ يُوفِيَ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ , وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ , وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ.

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই হযরত উমর (রা.) প্রতি মাসে ১০০ দিরহাম পর্যন্ত তার প্রতি আরোপিত কর বৃদ্ধি করলেন। তিনি তাকে আরো বলেন, "আমি জানতে পেরেছি তুমি নাকি এমন চাকা তৈরি করতে পারো যা বায়ু দ্বারা চলে"। আবু লুলু বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তোমার জন্য এমন এক চাকা তৈরি করব যা নিয়ে লোকজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে আলোচনা মুখর থাকবে"। তখন সময় ছিল মঙ্গলবার বিকাল বেলা। আর সে তাঁকে আঘাত করছিল বুধবার ভোরে, যুলহাজ্জাহ্ মাসের ২৬ তারিখ।"[৩৬৫]

৪.৩ উসমান (রা.) এর শাসনামলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

উসমান বিন আফফান (রা.) ছিলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন একজন ব্যক্তি। খুলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলীফা। যিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম। ভদ্রতা, বিনয়, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, মহানুভবতা, দানশীলতা ইত্যাদি বহু গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করেছেন। তিনি তাঁর মজলিসে শুরার সদসদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর খেলাফত কালেও তিনি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের শাসনামলেও তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শাসন পরিচালনা করেছেন। ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষের প্রতিও তিনি তাঁর তিন অগ্রনায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

এজন্যই তাঁর খেলাফতকালের প্রথম ছয় বছর তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে মানুষের মাঝে সম্প্রীতিময় পরিবেশ বজায় ছিল। এ সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি আফ্রিকা, ভারত ও সাইপ্রাস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়। কোমল হৃদয়ের অধিকারী খলীফা উসমান (রা.) তাঁর খেলাফতের যিম্মী নাগরিকদের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে সমাজে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো।

---

[৩৬৫] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন কাছীর, *আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াহ*, দারু ইহয়াউত তুরাছ আল 'আরাবী, ১৯৮৮ ইং, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৭

فَاتَّفَقَ لَهُ أَنْ ضَرَبَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ فَيْرُوزُ الْمَجُوسِيُّ الْأَصْلِ، الرُّومِيُّ الدَّارِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ بِخِنْجَرٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ، فَضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ. وَقِيلَ سِتَّ ضَرَبَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ تحت سرته قطعت السفاق فَخَرَّ مِنْ قَامَتِهِ، وَاسْتَخْلَفَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَرَجَعَ الْعِلْجُ بِخِنْجَرِهِ لَا يَمُرُّ بِأَحَدٍ إِلَّا ضَرَبَهُ، حَتَّى ضَرَبَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ، فَأَلْقَى عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْفٍ بُرْنُسًا فَانْتَحَرَ نَفْسَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ، وَحُمِلَ عُمَرُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَالدَّمُ يَسِيلُ مَنْ جُرْحِهِ– وَذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ– فَجَعَلَ يُفِيقُ ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُذَكِّرُونَهُ بِالصَّلَاةِ فَيُفِيقُ وَيَقُولُ: نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَهَا. ثُمَّ صَلَّى فِي الْوَقْتِ، ثُمَّ سَأَلَ عمن قتله من هو؟ فقالوا له: هو أَبُو لُؤْلُؤَةَ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَدَّعِي الْإِيمَانَ وَلَمْ يَسْجُدْ لِلَّهِ سَجْدَةً. ثُمَّ قَالَ: قَبَّحَهُ اللَّهُ، لَقَدْ كُنَّا أَمَرْنَا بِهِ مَعْرُوفًا– وَكَانَ الْمُغِيرَةُ قَدْ ضَرَبَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ مِنْ عُمَرَ أَنْ يَزِيدَ فِي خَرَاجِهِ فَإِنَّهُ نَجَّارٌ نَقَّاشٌ حَدَّادٌ فَزَادَ فِي خَرَاجِهِ إِلَى مِائَةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ– وَقَالَ لَهُ: لَقَدْ بلغني أنك تحسن أن تعمل رحى تَدُورُ بِالْهَوَاءِ فَقَالَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ: أَمَا وَاللَّهِ لأعملن لك رحى يتحدث عنها النَّاسُ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ– وَكَانَ هَذَا يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ عَشِيَّةً– وَطَعَنَهُ صَبِيحَةَ الْأَرْبِعَاءِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.১ যিম্মী হত্যার বিচার

উসমান (রা.) খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেই অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হন। আর সেটি হচ্ছে তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা উমর (রা.) এর হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত সন্দেহে নিহত তিনজন অমুসলিম নাগরিকের হত্যাকাণ্ডের বিচার। কেননা, এর সাথে জড়িত হল সদ্য শাহাদাত প্রাপ্ত খলীফা উমর (রা.) এর ছেলে এর উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.)। ইব্‌ন কাসীর (রহ.) এর বর্ণনায়, "উসমান (রা.) এর খিলাফতের প্রথম মামলাটি হল উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) এর মামলা। যে মামলার রায় দিলেন আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা.)। উমর (রা.) এর আহত হবার পরদিন সকালে উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.), উমর (রা.) এর হত্যাকারী আবু লুলুর কন্যার কাছে যান এবং তাকে হত্যা করেন। জুফাইনাহ নামক একজন খ্রীষ্টানকে তিনি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেন এবং এভাবে তাকে হত্যা করেন। তাসতুরের শাসক আল-হুরমুজানকে তিনি আঘাত করেন ও তাকে হত্যা করেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা এ দু'জন উমর (রা.) কে হত্যার ব্যাপারে আবু লুলুকে সাহায্য করেছিল।"[৩৬৬]

এ তিনজন ব্যক্তিই ছিল অমুসলিম। আবু লুলুর কন্যা অগ্নিপুজক, হীরার অধিবাসী জুফাইনা ছিল খ্রীষ্টান। সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রা.) তাকে মদীনায় এনেছিলেন মানুষকে লেখা শিখানোর জন্য। আর হুরমুজান ছিল নওমুসলিম। আহত উমর (রা.) তাদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রকে বন্দী করার হুকুম দিয়েছিলেন। যেন পরবর্তী খলিফা এর সুষ্ঠু বিচার করতে পারেন। এমনই ছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ, যাদের খেলাফত কালে অমুসলিমদের জীবনকেও সম্মান দেয়া হত, পবিত্র জ্ঞান করা হত। উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন উমর এই হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত করেছিলেন এমন অবস্থায় যখন তাঁর পিতা তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে আবু লুলুর দ্বারা ছুরিকাঘাতে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে লড়ছেন। তাঁর এ হত্যাকাণ্ডের কারণ ছিল প্রতিশোধ গ্রহণ করা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী খলীফাগণ এ মর্মে কোন আপোষ করেননি। সর্বাবস্থায় তারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ছিলেন বদ্ধ পরিকর। তাই উসমান (রা.) খলীফা হয়েই এ ব্যাপারে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা দেয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শ কামনা করেন। আলী (রা.) বলেন, 'আমার মত হল তাঁকে হত্যা করা'। কিছু সংখ্যক মুহাজির বলেন, 'গতকাল উমর (রা.) শহীদ হয়েছেন। আর আজ তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হবে?' তখন উসমান (রা.) খলিফা হিসেবে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দেখলেন, নিহত ব্যক্তিগণের কোন উত্তরাধিকারী নেই। আর ইসলামের নিয়মানুযায়ী যার উত্তরাধিকারী নেই ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারই তার উত্তরাধিকারী হয়। তাই উসমান (রা.) নিজেই তাদের

---

[৩৬৬] আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন কাছীর, *আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াহ*, (দারু ইহয়াউত তুরাছ আল 'আরাবী, ১৯৮৮ ইং), ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭

وَأَمَّا أول حكومة حكم فيا فَقَضِيَّةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ غَدَا عَلَى ابْنَةِ أَبِي لُؤْلُؤَةَ قَاتِلِ عُمَرَ فَقَتَلَهَا، وَضَرَبَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا يُقَالُ لَهُ جُفَيْنَةُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، وَضَرَبَ الْهُرْمُزَانَ الَّذِي كَانَ صَاحِبَ تستر فقتله، وكان قد قيل إنهما مالآ أَبَا لُؤْلُؤَةَ عَلَى قَتْلِ عُمَرَ

উত্তরাধিকারী। আর হত্যাকাণ্ডের বিচার সংগঠিত হয় নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের দাবী অনুসারে কিসাস অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করা অথবা অর্থদণ্ড দেয়া। উসমান (রা.) বললেন, "আমি তাদের অভিভাবক। আমি দিয়াত (অর্থদণ্ড) নির্ধারণ করলাম এবং আমি আমার সম্পদ থেকেই তা আদায় করব।"[৩৬৭]

এভাবে উসমান (রা.) অমুসলিম ব্যক্তিদের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোন প্রকার ছাড় না দিয়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করলেন।

৪.৩.২ শাসনকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের প্রতি উসমান (রা.) এর প্রথম পত্র

খুলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলীফা উসমান (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে শাসনকর্তা, সেনাপতি, রাজস্ব কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক পত্র জারী করেন। সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক উসমান (রা.) এসব ফরমান তাঁর দ্বারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রমাণ বহন করে। এগুলোতে তিনি মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে শাসন কর্তৃপক্ষকে সচেতন করেন। মুসলমানদের নিকট যিম্মী নাগরিকদের প্রতিশ্রুতির মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেন। যেমন, শাসনকর্তাদের প্রতি প্রেরিত প্রথম পত্রে তিনি তাদেরকে অমুসলিম যিম্মী নাগরিকদের ব্যাপারে যেন কোন প্রকার অবহেলা না করা হয়, সবসময় যেন তাদের সুবিধা অসুবিধাসমূহ তদারক করা হয় এবং তারা রাষ্ট্রের কাছে যে সব সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার সমূহ পাবে, সেসব ন্যায্য অধিকারসমূহ যেন তাদেরকে যথাযথভাবে অর্পণ করা হয়, তিনি এ চিঠিতে লিখেছিলেন,"সাবধান! নিশ্চয় সর্বাধিক ন্যায়ানুগ কর্মপদ্ধতি হল এই যে, তোমরা মুসলিমের ব্যাপারে মনোযোগী হবে, তাদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করবে এবং রাষ্ট্রের প্রাপ্য তাদের কাছ থেকে আদায় করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যিম্মীদের ব্যাপারে মনোযোগী হবে, তাদের প্রাপ্য তাদেরকে প্রদান করবে আর রাষ্ট্রের পাওনা তাদের কাছ থেকে আদায় করবে। অতঃপর আমি শত্রুদের ব্যাপারে বলছি যাদের ওপর তোমরা আঘাত হেনে থাক, তাদের ভূমি তোমরা উন্মোচন করবে বিশ্বস্ততার সাথে।" [৩৬৮]

এছাড়া যেসব অমুসলিম মুসলমানদের শত্রু, যাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে তাদের সাথে কোন প্রকার কুট-কৌশল, বিশ্বাস ঘাতকতা করা যাবেনা। বরং বিশ্বস্ততার সাথে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাদের বৈরীতার মুকাবিলা করতে হবে।

---

[৩৬৭] মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত তাবারী, *তারিখুর রসুল ওয়াল মুলূক*, (বৈরুত: দারুত তুরাছ, ১৩৮৭ হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯
قَالَ عُثْمَانُ: أَنَا وَلِيُّهُمْ، وَقَدْ جَعَلْتُهَا دِيَةً، وَاحْتَمَلْتُهَا فِي مَالِي

[৩৬৮] আত তাবারী, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৫
أَلا وَإِنَّ أَعْدَلَ السِّيرَةِ أَنْتَنْظُرُوا فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا عَلَيْهِمْ فَتُعْطُوهُمْ مَا لَهُمْ، وَتَأْخُذُوهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ تُثْنُوا بِالذِّمَّةِ، فَتُعْطُوهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَتَأْخُذُوهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِمْ.

উপরোক্ত চিঠি ব্যতীত রাজস্ব কর্মকর্তাদের প্রতি উসমান (রা.) যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতেও অমুসলিমদের অধিকারের প্রতি তাঁর সচেতনতার প্রতিস্ফুরণ দেখা যায়। এতে তিনি চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকদের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে রাজস্ব আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যেন রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলম না করা হয়। এব্যাপারে তিনি চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের ব্যাপারটি রাজস্ব কর্মকর্তাদেরকে বিশেষভাবে স্মরন করিয়ে দিয়ে লিখেন,"(হামদ ও সালাতের পর) নিশ্চয় আল্লাহ সত্য সহকারে সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনি সত্য ব্যতীত অন্য কিছুই কবুল করবেন না। সত্যকে আঁকড়ে ধর আর সত্যের ভিত্তিতে হক প্রদান কর। আর আমানত, আমানত সংরক্ষণে যত্নবান হও এবং আমানতের প্রথম হরণকারী হয়ো না। তবে তোমাদের অর্জনে পরবর্তীদেরকে অংশীদার বানাবে। বিশ্বস্ততা, বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে কাজ কর। ইয়াতিম ও চুক্তিবদ্ধের ওপর যুলম করো না। কারণ তাদের ওপর যারা যুলম করবে আল্লাহই তাদের প্রতিপক্ষ হবেন।"[৩৬৯]

এভাবে উসমান (রা.) খলীফা হয়েই তার রাষ্ট্রের অধীভুক্ত অমুসলিম প্রজাদের অধিকার রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের আবহ সৃষ্টি করেন। যিম্মীদের ব্যাপারে তার নির্দেশ ছিল যে তাদের ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপানো যাবে না, উপার্জনবিহীন বৃদ্ধ যিম্মীর জিযিয়া মওকুফ করতে হবে এবং কোন যিম্মী মুসলিম হলে তার ওপর জিযিয়া আরোপ করা যাবে না। যেসব যিম্মী খারাজী জমি চাষ করত তাদের কাছ থেকে খারাজ আদায় করা হত। খারাজ আদায়ের ব্যাপারে উসমান (রা.) এমন নির্দেশনা দেন যেন সরকার ও চাষী কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, (১) জমি উর্বর না অনুর্বর তা যাচাই করা; দু'ধরনের জমিতে সমান খারাজ আরোপ করা যাবে না (২) জমিতে কোন ধরনের ফসল হয় তা বিবেচনায় রাখা (৩) সেচের প্রয়োজন হয় কিনা। বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির খারাজ ও সেচের মাধ্যমে আবাদকৃত জমির খারাজ সমান হবে না।

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া অন্য কোন শর্ত যদি নির্ধারিত থাকে তবে তাও মেনে চলতে হবে এবং খারাজ আদায়ের ক্ষেত্রে তা বিবেচনায় রাখতে হবে।[৩৭০]

৪.৩.৩ উদারতা

উসমান ইব্‌ন আফফান (রা.) একজন উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মানুষের বিপদে আপদে তাঁর মন প্রাণ আন্দোলিত হত। শত্রুপক্ষও যদি বিপদে পড়ে তার দ্বারস্থ হত তিনি তাদেরকে আপতিত বিপদ থেকে উদ্ধারের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তার এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ পাওয়া যায়

---

৩৬৯ প্রাগুক্ত

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ بِالْحَقِّ، فَلا يَقْبَلُ إِلا الْحَقَّ، خُذُوا الْحَقَّ وَأَعْطُوا الْحَقَّ بِهِ وَالأَمَانَةَ الأَمَانَةَ، قُومُوا عَلَيْهَا، وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُهَا، فَتَكُونُوا شُرَكَاءَ مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَى مَا اكْتَسَبْتُمْ وَالْوَفَاءَ الْوَفَاءَ، لا تَظْلِمُوا الْيَتِيمَ وَلا الْمُعَاهَدَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَصْمٌ لِمَنْ ظَلَمَهُمْ

৩৭০ ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, *আমিরুল মুমিনীন 'উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর ২০১৩ ইং) , পৃ ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত লাভের পূর্বেই। মক্কা বিজয়ের ক্ষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক মুরতাদ ব্যক্তি তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কোমল প্রাণ উসমান (রা.) তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকে আশ্রয় দেন এবং পরবর্তীতে নিজে তাকে নিরাপত্তা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান (রা.) এর সম্মানে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মুরতাদ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন। এই ব্যক্তির নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবি সারাহ। এ ঘটনা সম্পর্কে ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন, " আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবি সারাহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কাতিবে ওহী (ওহী লিখক) এর মর্যাদাও লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মুশরিক হয়ে মক্কায় ফিরে যান। এ কারণে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। ভীতসন্ত্রস্ত আবদুল্লাহ তার দুধ ভাই উসমান (রা.) এর কাছে আত্মগোপন করলেন। উসমান (রা.) তাঁর জন্য সুপারিশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ক্ষমা করে দেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন আবি সারাহ পরবর্তীতে একনিষ্ঠ মুসলিমে পরিণত হয়েছিলেন। উমার ও উসমান (রা.) তাঁকে নানা রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।"[৩৭১] এ ঘটনাতে প্রতীয়মান হয় যে, উসমান (রা.) ভিন্ন মতের ব্যাক্তিদের বিপদেও সহায় ছিলেন।

৪.৩.৪ সুশৃংখল সমর ব্যবস্থাপনা

খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে সেনাবাহিনীকে সুশৃংঙ্খলভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা.)। এ ব্যবস্থা উসমান (রা.) এর খেলাফত কালেও অব্যাহত ছিল। এ সময় ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে দূর সীমান্তে গিয়ে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব প্রদান করা খলীফাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তাঁরা প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে ঐ প্রদেশের বাহিনী প্রধানের দায়িত্বে নিয়োগ দিতেন, যারা সরাসরি খলীফার তত্ত্বাবধানের আওতায় ছিলেন। যেমন, উসমান (রা.) এর সময়ে মিসরের গভর্ণর আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাদের নেতৃত্বে আফ্রিকা বিজিত হয়। খুরাসান বিজিত হয় বসরার গভর্ণর আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমীরের সেনাপতিত্বে। সেনাপতিগণ খলিফাগণের নির্দেশে বিজাতীয় জাতির সাথে রূঢ় ও খারাপ আচরণ থেকে বিরত থাকতেন। মুসলিম সেনাবাহিনী কর্তৃক বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীরা যেন কোন অত্যাচার, নিপীড়ন-

---

[৩৭১] ইব্‌ন হিশাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ

لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ، فَارْتَدَّ مُشْرِكًا رَاجِعًا إِلَى قُرَيْشٍ، فَفَرَّ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَكَانَ أَخَاهُ لِلرَّضَاعَةِ، فَغَيَّبَهُ حَتَّى أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ اطْمَأَنَّ النَّاسُ وَأَهْلُ مَكَّةَ، فَاسْتَأْمَنَ لَهُ: فَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَمَتَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُ عُثْمَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ: لَقَدْ صَمَتُّ لِيَقُومَ إِلَيْهِ بَعْضُكُمْ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَهَلَّا أَوْمَأْتُ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ لَا يَقْتُلُ بِالْإِشَارَةِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ، فَوَلَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْضَ أَعْمَالِهِ، ثُمَّ وَلَّاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بَعْدَ عُمَرَ.

নির্যাতনের স্বীকার না হয় এ বিষয়ে তারা অত্যন্ত সচেতন ভূমিকা পালন করতেন। তারা সব সময় মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসতেন। ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হকের বর্ণনায় এসেছে,"সেনাপতিরা সৈনিকদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতেন। বিজিত ভূখণ্ডের জনসাধারণের সাথে দুর্ব্যবহার করা হলে বা তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হত। মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ায় বিজয়োন্মত্ত সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। পরিবার-বিচ্ছিন্ন সৈনিকরা চারমাসের বেশি এক নাগাড়ে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন না।"[৩৭২]

এভাবে উসমান (রা.) মুসলিম ও বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করণের প্রয়াস পান। এমনকি তার নিযুক্ত সেনাপতিগণও ছিলেন এ কর্মনীতির অনুসারী। এমনই একজন সেনানায়ক ও শাসক ছিলেন আবদুর রহমান ইব্ন রাবী'আহ। যুদ্ধ, সন্ধি ও শান্তির সময়ে তাঁর অত্যন্ত উন্নত মন-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সবসময় দয়ার্দ্র ও মানবিক আচরণ করতেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের সাথে ধোঁকা-প্রতারণা, শঠতা করতেন না এবং পেছন দিক থেকে হামলা করতেন না। পরাজিতদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত কোমল ও মানবিক যা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের সম্প্রসারণে সহায়ক ছিল।

মূলতঃ মুসলিম সেনাপতিগণ কুরআন ও হাদীসের আলোয় আলোকিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের খলিফাগনের আদেশের আজ্ঞাবহ ছিলেন। এ কারণেই সুশৃংখলভাবে অভিযানসমূহ পরিচালনা করতেন এবং তাদের জন্য যেন কোন অমুসলিম ব্যক্তি অথবা প্রতিপক্ষ সৈনিক কোন নিপীড়নের শিকার না হয় তাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

৪.৩.৫ রক্তপাতহীন বিজয়

উসমান বিন আফফান (রা.) এর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বিজিত এসব অঞ্চলের বহু এলাকা রক্তপাতহীন ভাবে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানাভুক্ত হয়। এর মধ্যে নিশাপুর, হারাত, বাযাগীশ, বূশান্‌জ, মার্ভ, সাইপ্রাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উসমান (রা.) এর নিয়োগকৃত তাকওয়াবান সাহসী সেনাপতিগণ যুদ্ধ ব্যতীতই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ফলে তারা কোন প্রকার বাধা প্রয়োগ ছাড়াই জিযিয়ার বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে নেয়। তাঁর শাসনামলে শুধু সাহসিকতার জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করা হত না; বরং বীরত্বের সাথে সাথে তাকওয়া, নীতি-নৈতিকতা ও ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভও অপরিহার্য গুণ হিসেবে বিবেচিত হত। এর প্রমান পাওয়া যায় আল-ওয়ালীদ ইব্‌নু 'উকবাকে উদ্দেশ্য করে প্রেরিত খলিফার একখানা পত্রে। এতে তিনি নির্দেশ দেন,"তোমার কাছে আমার

[৩৭২] ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

পত্র পৌঁছলে তুমি এমন একজন সেনাপতি বাছাই করবে যার সাহসিকতা ও ধার্মিকতার ব্যাপারে তুমি সন্তুষ্ট।"

যা হোক উসমান (রা.) এর নিয়োগকৃত সেনাপতি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমিরের সাথে নিশাপুরের প্রধান শাসক বার্ষিক দশ লক্ষ দিরহাম কর প্রদানের শর্তে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত করেন। মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে হিরাত শাসক স্বেচ্ছায় মুসলমানদের সাথে চুক্তি করলেন। আল্লামা বালাযুরী ফুতুহুল বুলদান গ্রন্থে চুক্তির ভাষ্যটি উল্লেখ করেন। তা হল,

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- এটি হিরাত, বূশান্‌জ ও বাযাগীস এর শাসকের প্রতি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমিরের নির্দেশনামা- তিনি হারাতের শাসককে আল্লাহভীতি, মুসলিমদের কল্যাণ কামনা ও তার আওতাধীন ভূমি সংস্কারের নির্দেশ দিচ্ছেন। হারাতের সমভূমি ও পাহাড়ী এলাকার জন্য এই চুক্তি প্রযোজ্য হবে এই শর্তে যে, চুক্তি মুতাবিক জিযিয়া প্রদান করতে হবে এবং তা ন্যায্যতার ভিত্তিতে বন্টন করতে হবে। কেউ যদি তার ওপর আরোপিত কর আদায়ে অসম্মত হয় তবে তার জন্য কোন নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি নেই।"[৩৭৩]

আরেক সেনাপতি আল-আহনাফ ইব্‌ন কায়েস মার্ভরূয অভিমুখে প্রেরিত হয়ে আরো উদারতার পরিচয় দিয়ে স্থানীয় গভর্নর ও অধিবাসীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখেন এবং তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দরজা খোলা রাখেন। মার্ভরূয এর গভর্ণর কতিপয় শর্ত দিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাথে সন্ধি প্রস্তাব করেন। আল-আহনাফ এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করে তাদের সকল দাবী মেনে নিয়ে প্রতিউত্তর করেন। এ চিঠিতে উসমান (রা.) এর শাসনকালে মুসলমানদের উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার চিত্র ফুটে উঠেছে। এতে সেনাপতি সাখর বিন কায়স এর পক্ষ থেকে মার্ভরূয অধিবাসীদের সকল দাবী দাওয়া মেনে চুক্তি করা হয় এই শর্তে যে, মার্ভ থেকে বার্ষিক ষাট হাজার দিরহাম কর প্রদান করতে হবে, পারস্য সম্রাট কিসরা কর্তৃক দখলকৃত জমিতে গভর্ণরের অধিকার মেনে নিতে হবে, গভর্ণর ও তার পরিবারের উপর করারোপ করা যাবেনা এবং মার্ভের নেতৃত্ব তার পরিবারের হাতেই বহাল থাকবে।[৩৭৪]

---

[৩৭৩] আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, (বৈরুত: দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, ১৯৮৮ইং), ১ম খণ্ড, পৃ.৩৯২

بسم اللَّه الرَّحْمَنِ الرحيم: هَذَا ما أمر به عَبْد اللَّهِ بْن عَامِر عظيم هراة وبوشنج وبادغيس، أمره بتقوى اللَّه، ومناصحة المسلمين، وإصلاح ما تحت يديه منَ الأرضين، وصالحه عن هراة سهلها وجبلها على أن يؤدى من الجزية ما صالحه عَلَيْهِ، وأن يقسم ذلك عَلَى الأرضين عدلا بينهم، فمن منع ما عَلَيْهِ فلا عهد له ولا ذمة، وكتب ربيع بْن نهشل وختم ابن عَامِر

[৩৭৪] আত তাবারী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১০-৩১১

فكتب إِلَيْهِ الأحنف: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، من صخر بن قيس امير الجيش الى باذان مرزبان مرو روذ ومن مَعَهُ من الأساورة والأعاجم.

سلام عَلَى من اتبع الهدى، وآمن واتقى أَمَّا بَعْدُ، فإن ابن أخيك ماهك قدم علي، فنصح لك جهده، وأبلغ عنك، وَقَدْ عرضت ذَلِكَ عَلَى من معي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وأنا وهم فِيمَا عَلَيْك سواء، وَقَدْ أجبناك إِلَى مَا سألت وعرضت عَلَى أن تؤدي عن أكرتك وفلاحيك والأرضين

Dhaka University Institutional Repository

মার্ভরূয ছাড়াও বালখ, মারবাল, সিরাজতাইর, বাগরাওান্দ, বুসফুরবাজান, সাইপ্রাস ইত্যাদি এলাকা সন্ধির মাধ্যমে জয় করে নেন।

৪.৩.৬ গণীমতের সম্পদ অমুসলিমদের ফেরত দান

উমর (রা.) এর শাসনামলে মিসরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়। শহরের শাসনভার পূর্ববর্তী খ্রীষ্টান শাসক মুকাউকিসের কাছেই বহাল থাকে। জিযিয়ার বিনিময়ে এর অধিবাসীরা স্বধর্মে অটল থাকা ও স্বদেশে বসবাসের অনুমতি পায়। উসমান (রা.) এর খেলাফতে শুরুর দিকে কিছু খ্রীষ্টান বিদ্রোহ করে রোমানদেরকে তাদের হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে উস্কানী দিতে থাকে। এদের মদদে রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন সেনাপতি মানাভীলের নেতৃত্ব ৩০০ রণতরী সজ্জিত একটি বিরাট বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রেরণ করেন। এদের প্রতিরোধে খলীফা মিসর বিজয়ী সেনাপতি আমর বিন আস (রা.) কে পাঠালেন। মানাভীল তার বাহিনীসহ মিসরে পৌঁছে রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়াসহ এর বিভিন্ন শহরে ব্যাপক লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। আমর (রা.) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এসে তীব্র লড়াইয়ের মাধ্যমে এদের প্রতিরোধ করলো। এ যুদ্ধে সেনাপতি আমর (রা.) স্থানীয় খ্রীষ্টান অধিবাসীদের সাথে চরম উদারতার পরিচয় দিলেন। যুদ্ধ শেষে পলাতক কপটিক খ্রীষ্টান বিশপ বেঞ্জামিন ফিরে এসে জানালেন, শহরের খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিভঙ্গ করেনি; অতএব তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে পালনের সুযোগ দেয়া হোক। আমর (রা.) চুক্তি মেনে চলার শর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন।

এছাড়া শত্রুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গণীমতের সম্পদ হিসেবে যোদ্ধাদের মাঝে বন্টনের সময় দলে দলে মিসরীয়রা এসে সেনাপতি আমর (রা.) এর কাছে আবেদন করলো যে, রোমানরা তাদের গবাদিপশু থেকে শুরু করে সবকিছু লুট করেছে। তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ যেন ফেরত দেয়া হয়। তিনি এসব অত্যাচারিত অধিবাসীদের অনুরোধে দখলদার রোমান বাহিনীর পরিত্যক্ত সম্পদ যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন না করে প্রমাণ সাপেক্ষে প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দিলেন।[৩৭৫]

ستين ألف درهم إلي وإلى الوالي من بعدي من أمراء الْمُسْلِمِينَ، إلا مَا كَانَ من الأرضين الَّتِي ذكرت أن كسرى الظالم لنفسه أقطع جد أبيك لما كَانَ من قتله الحية الَّتِي أفسدت الأرض وقطعت السبل والأرض لِلَّهِ ولرسوله يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، وإن عَلَيْك نصرة الْمُسْلِمِينَ وقتال عدوهم بمن معك من الأساورة، إن أحب الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ وأرادوه، وإن لك عَلَى ذَلِكَ نصرة الْمُسْلِمِينَ عَلَى من يقاتل من وراءك من أهل ملتك، جار لك بِذَلِكَ مني كتاب يكون لك بعدي، وَلا خراج عَلَيْك وَلا عَلَى أحد من أهل بيتك من ذوي الأرحام، وإن أنت أسلمت واتبعت الرسول كَانَ لك مِنَ الْمُسْلِمِينَ العطاء والمنزلة والرزق وأنت أخوهم، ولك بِذَلِكَ ذمتي وذمة أبي وذمم الْمُسْلِمِينَ وذمم آبائهم شهد عَلَى مَا فِي هَذَا الكتاب جزء ابن مُعَاوِيَة– أو مُعَاوِيَة بن جزء السعدي– وحمزة بن الهرماس وحميد بن الخيار المازنيان، وعياض بن ورقاء الأسيدي وكتب كيسان مولى بني ثعلبة يوم الأحد من شهر اللَّه المحرم وختم أَمِير الجيش الأحنف بن قيس ونقش خاتم الأحنف: نعبد اللَّه.

৩৭৫ ড. যুবাইর,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩-২০৪

৪.৩.৭ জিযিয়া ব্যতীত সন্ধিচুক্তি

৩১ হিজরীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাদ নুবা নামক রাজ্যে (বর্তমান সুদান) অভিযান পরিচালনা করেন। তীব্র লড়াইয়ের পর নুবার অধিবাসীদের প্রস্তাব অনুযায়ী সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তিটি খিলাফতের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। এটিও অমুসলিমদের প্রতি মুসলমানদের পরম ঔদার্যের পরিচয় বহন করে। তৎকালে মরুময় অঞ্চল নুবাতে অত্যন্ত অল্প পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হত। ফলে মুসলমানদেরকে জিযিয়া হিসেবে নগদ অর্থ বা উৎপাদিত শস্য প্রদান তথাকার অধিবাসীদের জন্য অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তদুপরি দারিদ্র্যের কারণে অভিভাবকরা স্বেচ্ছায় নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে বিক্রি করে দিত। পরিস্থিতির বাস্তবতা অনুধাবন করে আবদুল্লাহ ইবন্ সাদ তাদের উপর কোন জিযিয়া নির্ধারণ করেননি। বরং স্থানীয় অধিবাসীদের সমস্যা লাঘবের জন্য তাদের সাথে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তিতে শর্ত আরোপ করেন যে, প্রতি বছর নুবাবাসী ৩০০ (বা ৪০০) দাস প্রদান করবে, বিনিময়ে মুসলিমরা (সমমূল্যের) গম ও যবসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করবে। এছাড়া এ চুক্তিতে নুবার অধিবাসীদের স্বাধীনতা মেনে নেয়া হয় এবং সেখানে মুসলমানদের অবাধ যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ স্বীকার করা হয়। এ চুক্তির ফলে অমুসলিমরা মুসলমানদের সাহচর্যে আসে। এরপর মুসলমানদের আচার-আচরণে মুগ্ধ হয়ে বহু সংখ্যক নুবাবাসী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৩৭৬]

৪.৩.৮ সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে যিম্মীদের অংশগ্রহণ

উসমান (রা.) ও তাঁর অধীনস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ যিম্মী নাগরিকগণকে রাষ্ট্রে সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করতেন। তাদেরকে মুসলমানদের সমান নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য তাদেরকে সমাজের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করতেন। এতে যিম্মীরা সম্মানের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অধিকার লাভ করত। যেমন, আলকজান্দ্রিয়ায় দ্বিতীয় অভিযানের পূর্বে ইখনার খৃষ্টান শাসক তালমা আমর বিন আস (রা.) এর কাছে এসে বলল, আমাদের একেক জনের ওপর আরোপিত জিযিয়ার পরিমাণ কত? আমর (রা.) গীর্জার এক কোনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "তোমরা আমাদের ভাণ্ডার সদৃশ, যদি আমাদের খরচ বেড়ে যায় তবে আমরা তোমাদের জিযিয়ার হার বাড়িয়ে দেব, আর যদি খরচ কমে যায় তবে জিযিয়ার হার কমিয়ে দেব।"[৩৭৭]

---

[৩৭৬] ড. যুবাইর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৩৭৭] ড. যুবাইর,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

এ কথার মাধ্যমে আমর (রা.) যিম্মীদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজস্ব আয়ের অন্যতম যোগানদাতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তাদের সম্মানিত করেন এবং রাষ্ট্রের সামষ্টিক নাগরিকদের কল্যাণে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনের সুযোগ দেন।

৪.৩.৯ মুরতাদদের তওবার সুযোগ প্রদান

উসমান (রা.) এর শাসনামলে কিছু মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়। এরা মুসাইলামা আল কাযযাবের বাতিল দাওয়াত পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালালে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) তাদেরকে গ্রেফতার করেন। এদের শাস্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাতে তিনি খলীফাকে অবহিত করলে খলীফা উসমান (রা.) লিখলেন, "সত্য দীন তাদের সামনে উপস্থাপন করুন, তাদেরকে বলুন কালিমার স্বীকৃতি প্রদান করতে, যারা এই আহবানে সাড়া দেবে তাদেরকে হত্যা করবেন না। আর যারা বাতিল ধর্মে অটল থাকবে তাদেরকে হত্যা করুন।"

'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) খলীফার নির্দেশানুসারে তাদের সামনে সত্য দ্বীন উপস্থাপন করলে কয়েকজন তওবা করে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করল। ইব্ন মাসউদ (রা.) তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। বাকীরা তওবা করতে অস্বীকার করলে তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[৩৭৮]

৪.৩.১০ অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন

ইসলামে অমুসলমানদেরকে দেয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা, ওয়াদা পালন করা ও চুক্তির বাস্তবায়নের উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন এ ব্যাপারে বেশ তৎপর ছিলেন। তৃতীয় খলীফা উসমান (রা.) এর শাসনামলেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনিও এ ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরীদের মত অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর অধীনস্থ শাসকগণকেও অমুসলিম যিম্মীদের অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তাগিদ প্রদান করতেন। যেমন, নাজরানের খ্রীষ্টানদের সাথে খলীফা উসমান (রা.) এর সদ্ব্যবহার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তাঁর শাসনামলে ইরাকী নাজরানের খৃষ্টানদের একদল প্রতিনিধি মদীনায় এসে কিছু দাবী-দাওয়া নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে। তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার পর তিনি নাজরান এর গভর্ণর আল-ওয়ালীদকে নিম্নরূপ পত্র লিখেন:

> "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, 'আবদুল্লাহ উসমান (রা.) হতে আল-ওয়ালীদ ইব্ন উকবা-এর প্রতি। তোমার ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতঃপর ইরাকী নাজরানের বিশপ, 'আকিব ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি দল আমার কাছে কিছু অভিযোগ নিয়ে এসেছিল। উমর (রা.) এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রটি তারা আমাকে দেখিয়েছে। মুসলিমদের নিকট থেকে তারা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে সে সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি। তাদের

---

[৩৭৮] ড. যুবাইর, পৃ. ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

> জিযিয়া হতে আল্লাহ তা'আলার খাতিরে আমি ত্রিশ পোশাক কমিয়ে দিয়েছি। ইয়েমেনের ভূমির বিনিময়ে উমর (রা.) তাদেরকে ইরাকে যে পরিমাণ ভূমি দিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণটুকু তাদেরকে প্রদানের ওয়াদা আমি করেছি। সুতরাং তুমি তাদের মঙ্গল কামনা কর, কারণ এদের যিম্মা তোমার উপর। তদুপরি এরা আমার পূর্ব পরিচিত। তাদের কাছে উমর (রা.) প্রদত্ত যে চুক্তিপত্র আছে সেটি দেখো, ওটির সকল শর্ত পূরণ কর। আর পত্রটি পড়ার পর তাদের কাছে ফেরত দেবে।"[৩৭৯]

উপরোক্ত চিঠিতে উসমান (রা.) তাঁর অধীনস্থ শাসককে নাজরানের খ্রীষ্টান অধিবাসীদের সাথে উমর (রা.) যে চুক্তি করেছিলেন তা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া তিনি নিজেও তাদের উপর ধার্যকৃত জিযিয়ার পরিমাণ হ্রাস করে উদারতার পরিচয় দেন। তদুপরি এ পত্রটির প্রতিটি কথা অমুসলিম যিম্মী নাগরিকদের প্রতি উসমান (রা.) এর সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও মহানুভবতার পরিচয় বহন করে।

৪.৪ আলী (রা.) এর শাসনকালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

তৃতীয় খলিফা উসমান বিন আফ্ফান (রা.) এর শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী বিন আবু তালিব (রা.) এর উপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। খলীফা হয়েই তিনি নানাবিধ সংকটের মুখোমুখি হন। শত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও তিনি উমর (রা.) কে অনুসরণ করে কঠোর হস্তে প্রায় ছয় বছর প্রশাসন পরিচালনা করেন। এ সময় তিনি মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। দেশের অমুসলিম নাগরিকদের সাথে তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ অবলম্বন করতেন। এমনকি শত্রুভাবাপন্ন বিদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপও অতীব ধৈর্য সহকারে সহ্য করে খেলাফতের অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালান। ঐতিহাসিকগণ আলী (রা.) এর জীবনচরিত রচনা করতে গিয়ে তাঁর খেলাফতকালীন সময়ের যুদ্ধ বিগ্রহ, বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বর্ণনায় বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তথাপি তাঁর শাসন সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে আলী (রা.) এর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিস্ফুটিত হয়।

---

[৩৭৯] আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম, *আল খারাজ*, (কায়রো: আল মাকতাবাতুল আজহারিয়্যাহ লিততুরাছ, তা.বি.), পৃ ৮৬-৮৭

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، سَلامُ اللَّهِ عَلَيْكَ؛ فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الأَسْقُفَ وَالْعَاقِبَ وَسُرَاةَ أَهْلِ نَجْرَانَ الَّذِينَ بِالْعِرَاقِ، أَتَوْنِي فَشَكَوْا إِلَيَّ وَأَرَوْنِي شَرْطَ عُمَرَ لَهُمْ، وَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَصَابَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنِّي قَدْ خَفَّفْتُ عَنْهُمْ ثَلاثِينَ حُلَّةً مِنْ جِزْيَتِهِمْ تَرَكْتُهَا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَإِنِّي وَفَّيْتُ لَهُمْ بِكُلِّ أَرْضِهِمُ الَّتِي تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ عُقْبَى مَكَانِ أَرْضِهِمْ بِالْيَمَنِ فَاسْتَوْصِ بِهِمْ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُمْ أَقْوَامٌ لَهُمْ ذِمَّةٌ، وَكَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَعْرِفَةٌ. وَانْظُرْ صَحِيفَةً كَانَ عُمَرُ كَتَبَهَا لَهُمْ فَأَوْفِهِمْ مَا فِيهَا، وَإِذَا قَرَأْتَ صَحِيفَتَهُمْ فَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَالسَّلامُ. كَتَبَ حُمْرَانُ بْنُ أَبَانٍ، لِلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ"

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর জীবন চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, জিযিয়া কর ও খারাজ আদায়ে উদারতা, সহনশীলতা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের অপূর্ব সমাহার। নিম্নে তার কিঞ্চিৎ বিবরণ পেশ করা হল।

৪.৪.১ ন্যায়পরায়ণতা

ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী বিন আবু তালিব (রা.) ছিলেন ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে ন্যায় বিচার করার অসাধারণ গুণে গুণান্বিত করেছেন। তাঁর এই ন্যায়পরায়ণতা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান ছিল। এমনকি ন্যায়ের জন্য খলীফা হয়েও তিনি কাযীর বিচারের সম্মুখীন হতে কুণ্ঠিত হতেন না। যেমন সিফফিনের যুদ্ধে তাঁর হারিয়ে যাওয়া বর্ম একজন যিম্মী নাগরিকের কাছে পাওয়া যায়। তিনি খলীফা হওয়া সত্ত্বেও তার কাছ থেকে বর্মটি জোরপূর্বক আদায় না করে সঠিক সুরাহার জন্য তাকে নিয়ে কাজীর দরবারে যান। এ ঘটনাতে যিম্মীদের প্রতি তার সহনশীলতা ও ন্যায়নিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। জামাল আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল মিসরী ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, "আলী বিন আবু তালিব (রা.) তার বর্মটি একবার একজন খ্রীষ্টানের কাছে পেলেন। তিনি এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য তাকে নিয়ে কাযী শুরাইহ এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, 'এই বর্মটি আমার বর্ম, আমি এটি কখনো বিক্রয় করিনি এবং উপহারও দেইনি।' অত:পর শুরাইহ খ্রীষ্টান ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমীরুল মু'মিনীন যা বলেছেন এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?' খ্রীষ্টান ব্যক্তিটি তদুত্তরে বলল; এই বর্মটি ব্যতিত আমার কোন বর্ম নেই। আমীরুল মু'মিনীন আমার কাছে মিথ্যাবাদী।' শুরাইহ আলী (রা.) এর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনার নিকট কোন প্রমাণ আছে কি?' আলী (রা.) হেসে দিলেন এবং বললেন, আরবী

অতঃপর শুরাইহ খ্রীষ্টান ব্যক্তির পক্ষে রায় দিলেন। সে বর্মটি নিয়ে নিল। কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে আসল এবং বলল, 'নিশ্চয়ই আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি এটি নবীদের বিধান। আমীরুল মু'মিনীন আমাকে মীমাংসার জন্য কাযীর কাছে নিয়ে এসেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দাহ এবং রাসূল। আল্লাহর কসম, হে আমীরুল মু'মিনীন এই বর্মটি আপনার ।'[৩৮০]

---

[৩৮০] জামিল আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল মিসরী, *ইনতিশারুল ইসলামিল ফুতুহাতিল ইসলামিয়্যাহ যামানুর রাশিদীন*, (মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ: আল জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ, সৌদী আরব, ১৪০৯ হি), পৃ. ১০২

"وجد علي بن أبي طالب درعه عند رجل نصراني، فأقبل به إلى شريح قاضيه، وقال له:"الدرع درعي، ولم أبع، ولم هب".فقال شريح للنصراني: "ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين"؟.فقال النصراني: "ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب"فالتفت شريح إلى علي. فقال:"يا أمير المؤمنين هل من بينة " فضحك علي.وقال: "أصاب شريح مالي بينة".فقضى شريح للنصراني. فأخذ النصراني الدرع، ومشى خطوات، ثم رجع وقال:"أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يدنيني إلى قاضيه يقضي عليه. أشهد أن لا اله إلا

Dhaka University Institutional Repository

আলী (রা.) বর্মটি তাকে উপহার দিয়ে দিলেন। এ ঘটনাটি অন্যান্য বর্ণনায় খ্রীষ্টান ব্যক্তির পরিবর্তে একজন ইহুদী ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত ঘটনাটি ছাড়াও অমুসলিমদের প্রতি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অপর একটি বর্ণনায়। তা হল এক সময়ে একজন মুসলমান কোন বিধর্মীকে হত্যা করল। সাক্ষ্য প্রমাণে অভিযুক্ত মুসলিম ব্যক্তি হত্যাকারী সাব্যস্ত হলে আলী (রা.) তাঁকে মুত্যুদণ্ড প্রদান করলেন। রায় শুনে নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বলল, 'আমিরুল মু'মিনীন! হত্যাকারীকে মাফ করে দেয়া হোক , আমি আমার ভাই হত্যার বিনিময়ে হত্যাকারী হতে অর্থ গ্রহণ করে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' আলী (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য তোমাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি তো?' সে বলল, 'না, আমাকে কোন প্রকার চাপ দেয়া হয় নি। আমি স্বেচ্ছায়ই অর্থ গ্রহণ করে মাফ করে দিয়েছি।' অতঃপর আলী (রা.) হত্যাকারীকে মুক্তি দিলেন। বললেন,'যারা আমাদের যিম্মায় রয়েছে তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের ও আমাদের রক্তে কোন তফাৎ নেই।'[৩৮১]

এ সব ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, আলী বিন আবি তালিব (রা.) এর শাসনকালে যে ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের জন্যও তাতে কোন শিথিলতা আসেনি। মুসলিম অমুসলিম সবার জন্য তিনি ছিলেন একজন ন্যায় পরায়ণ শাসক।

৪.৪.২ যিম্মীদের অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা

যিম্মী নাগরিকগণ তাদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রকে জিযিয়া প্রদান করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিম নাগরিকগণের ন্যায় তাদের মৌলিক অধিকারগুলোও সংরক্ষণ করে। আলী বিন আবি তালিব (রা.)ও তাঁর শাসনকালে যিম্মী নাগরিকগণের জান-মাল ইজ্জত আব্রু ইত্যাদি হেফাজতের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর খিলাফতকালে বিদ্রোহী খারেজী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এরা সর্বত্র বিশৃংঙ্খলা হানাহানি শুরু করে। আলী (রা.) ইব্‌ন আব্বাস (রা.)কে তাদের সাথে সমঝোতা করতে পাঠালেন। আব্বাস (রা.) এর উপদেশের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে প্রায় চারহাজার লোক তওবা করে ফিরে আসে। আলী (রা.) অবশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে জানান যে, তোমরা আমাদের ও অন্যদের কর্মনীতি দেখেছ, কাজেই তোমরা যেথায় ইচ্ছা অবস্থান কর। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। আর তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত থাকলো যে, তোমরা অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত ঘটাবে না। ডাকাতি, রাহাজানি করবে না এবং যিম্মীদের উপর অত্যাচার চালাবে না। যদি এর কোনটিতে লিপ্ত হয়ে

الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين".فقال: "أما إذا أسلمت فهي لك" وحمله على فرسه–وهكذا كان القضاء عامل جذب كبير الإسلام.

[৩৮১] নুরুর রহমান, *হযরত আলী ইব্‌নে আবি তালিব (রা.)* (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা. লি, ২০০৪ ইং), পৃ. ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

পড় তবে তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে পছন্দ করেন না।[৩৮২]

আয়েশা (রা.) আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদকে এ ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ইব্ন শাদ্দাদ এর পরই কি আলী (রা.) তাদেরকে হত্যা করেছিলেন? জওয়াবে ইব্ন শাদ্দাদ বললেন, আল্লাহর কসম! ওদের বিরুদ্ধে তখনই অভিযান পাঠানো হয়েছে, যখন ওরা ডাকাতি, রাহাজানি শুরু করেছে, খুন-খারাবি ছড়িয়ে দিয়েছে এবং যিম্মীদের উপর অত্যাচার করে তাদের সবকিছু নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়েছে।"[৩৮৩] যিম্মী ব্যক্তিদের মৌলিক অধিকার সমূহ যেন কোন অবস্থাতেই ক্ষুন্ন না হয় এজন্য আলী বিন আবি তালিব (রা.) ছিলেন সদা তৎপর। একবার এক প্রদেশের অধিবাসীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি তথাকার গভর্ণর আমর ইব্ন সালামাকে লিখিলেন, 'তোমার শহরের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ী ব্যক্তি আমার কাছে এসে অভিযোগ করলেন, তুমি তাদের সাথে নির্দয় এবং অপমানজনক আচরণ করে থাক। আমি তাদের অভিযোগ সম্মন্ধে চিন্তা করে দেখলাম, তারা মুশরিক হওয়ার কারণে অপমান ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার উপযোগী নন। আর প্রতিজ্ঞাপত্র ও চুক্তিপত্র অনুযায়ী তাদেরকে দেশ হতে বের করে দেয়া যায় না এবং বিরক্তও করা যায় না। অতএব, তাদের সাথে এমন নম্র ব্যবহার করো যার সাথে কঠোরতারও কিছু মিশ্রণ থাকে। কিন্তু এরূপ ব্যবহার করবে যেন তা জুলমের সীমায় না পৌঁছায়। তাদের সাথে যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে তার বিপরীত কোন কাজ করো না। অবশ্য তাদের নিকট হতে কর আদায় করো এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ কর। কিন্তু সেজন্যে তাদের নিকট হতে তাদের সাধ্যের বাইরে কিছু গ্রহণ করো না।"[৩৮৪]

এভাবে আলী (রা.) অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুনতার সাথে অমুসলিম নাগরিকদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে ইতিহাস স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৪.৪.৩ জিযিয়া ও খারাজ আদায়ের ক্ষেত্রে উদারতা

আলী বিন আবি তালিব (রা.) অমুসলিম নাগরিকদের নিকট হতে জিযিয়া ও খারাজ আদায়কালে অত্যন্ত সহৃদয় ছিলেন। তিনি তাদেরকে এসব কর আদায় করার সময় তাদের কষ্ট লাঘবে সব রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছেন যা তার মহানুভব ও উদার মানসিকতার পরিচয় বহন করে। তিনি তার শাসনকালে তাঁর অধীনস্থ জিযিয়া ও খারাজ আদায়কারী কর্মচারীদেরকে এ ব্যাপারে নিয়োগের সময়ই সতর্ক ও সাবধান করে দিতেন যেন তারা অমুসলিম যিম্মী নাগরিকগণের উপর

---

[৩৮২] আল কুর'আন,সূরা আনফাল : ৫৮

[৩৮৩] আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, (বৈরুত: দারু ইহয়াউত তুরাছ আল 'আরাবী,১৯৮৮ইং), ৭মখণ্ড, পৃ. ৩১১

فقالت له عائشة: يا بن شداد فقتلهم فقالوا والله ما بعثت إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ وَاسْتَحَلُّوا أهل الذمة

[৩৮৪] নুরুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

যুলম না করেন। কর আদায়ের সময় কঠোরতার পরিবর্তে তাদের প্রতি নম্র ও কোমল ব্যবহার করার আদেশ দিতেন। তারা বহন করতে পারবে না এমন করের বোঝা তাদের উপর না চাপিয়ে সাধ্যানুযায়ী কর আরোপের নির্দেশ দিতেন । মারওয়ান ইব্ন মুয়াবিয়া আল ফাযারী এর বর্ণনায়ে এসেছে যে, "আলী বিন আবি তালিব (রা.) উকবুরাতে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলেন। তাঁকে উপস্থিত লোকদের সামনে উপদেশ দিয়ে বললেন, খারাজ বাবদ তাদের গাধা, গরু, শীত, গ্রীষ্মের কাপড় বিক্রয় করবে না। তাদের সাথে কোমল ব্যবহার করবে, তাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করবে এবং তাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করবে।"[৩৮৫]

অন্য এক বর্ণনায় ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, "ছাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছিল: আলী বিন আবি তালিব আমাকে 'উকবুরাতে কাজে নিযুক্ত করে অনেক ব্যক্তির উপস্থিতিতে বলেছিলেন, তুমি লক্ষ্য রাখবে, যেন তুমি পুরো খারাজ আদায় করতে পার। এ ব্যাপারে তাদেরকে কোন ছাড় দেবে না এবং কোন দুর্বলতা প্রকাশ করো না। এরপর আলী (রা.) আমাকে যোহরের সময় আসতে বললেন, আমি উপস্থিত হলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে ইতিপূর্বে লোকের সামনে যে ওসীয়ত করেছি তার কারণে তারা হল ধোকাঁবাজ জাতি। তুমি লক্ষ্য রাখবে যখন তুমি তাদের কাছে থাকবে তখন তাদের শীত গ্রীষ্মের কাপড়, খাবারের উপকরণ ও কৃষি কাজের পশু খারাজ আদায়ের জন্য বিক্রি করবে না, প্রহার করবে না, দাড়িয়ে রেখে শাস্তি দেবে না এবং খারাজ এর পরিবর্তে কোন বস্তু নিলামে চড়াবে না। কেননা আমরা তাদের শাসক হয়েছি বলে নরম ব্যবহারের মাধ্যমে আদায় করাই আমাদের কাজ। তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে আল্লাহ আমার পরিবর্তে তোমাকে পাকড়াও করবেন। আর আমি যদি জানতে পারি যে, তুমি আমার আদেশের বিপরীত কাজ করছো তবে তোমাকে পদচ্যুত করবো।"[৩৮৬]

---

[৩৮৫] আবু 'উবায়েদ আল কাসেম ইব্ন আসসালাম আল বাগদাদী, *কিতাবুল আমওয়াল*,(বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ خَلَفٍ مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَجُلًا عَلَى عُكْبُرَى، فَقَالَ لَهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ: «لَا تَدَعَنَّ لَهُمْ دِرْهَمًا مِنَ الْخَرَاجِ» ، قَالَ: وَشَدَّدَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «الْقَنِي عِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ» ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: " إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَمَرْتُكَ بِأَمْرٍ، وَإِنِّي أَتَقَدَّمُ إِلَيْكَ الْآنَ، فَإِنْ عَصَيْتَنِي نَزَعْتُكَ: لَا تَبِيعَنَّ لَهُمْ فِي خَرَاجٍ حِمَارًا وَلَا بَقَرَةً، وَلَا كِسْوَةَ شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ، وَارْفُقْ بِهِمْ، وَافْعَلْ بِهِمْ، وَافْعَلْ بِهِمْ "

[৩৮৬] ইমাম আবু ইউসুফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

اسْتَعْمَلَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عُكْبُرَاءَ فَقَالَ لِي: -وَأَهْلُ الأَرْضِ معي يسمعُونَ- انْظُرْ أَنْ تَسْتَوْفِيَ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ. وَإِيَّاكَ أَنْ تُرَخِّصَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ وَإِيَّاكَ أَنْ يَرَوْا مِنْكَ ضَعْفًا، ثُمَّ قَالَ: رُحْ إِلَيَّ عِنْدَ الظُّهْرِ، فَرُحْتُ إِلَيْهِ عِنْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ لِي: إِنَّمَا أَوْصَيْتُكَ بِالَّذِي أَوْصَيْتُكَ بِهِ قُدَّامَ أَهْلِ عَمَلِكَ لأَنَّهُمْ قَوْمُ خِدَعٍ، انْظُرْ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِمْ فَلا تَبِيعَنَّ لَهُمْ كِسْوَةَ شِتَاءٍ وَلا صيفا، وَلا رِزْقًا يَأْكُلُونَهُ، وَلا دَابَّةً يَعْمَلُونَ عَلَيْهَا، وَلا تَضْرِبَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ سَوْطًا وَاحِدًا فِي دِرْهَمٍ، وَلا تُقِمْهُ عَلَى رِجْلِهِ فِي طَلَبِ دِرْهَمٍ، وَلا تَبِعْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ عَرَضًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَرَاجِ؛ فَإِنَّا إِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ2. فَإِنْ أَنْتَ خَالَفْتَ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ يَأْخُذُكَ اللَّهُ بِهِ دُونِي وَإِنْ بَلَغَنِي عَنْكَ خِلافَ ذَلِكَ عَزَلْتُكَ. قَالَ قُلْتُ إِذَنْ أَرْجِعُ إِلَيْكَ كَمَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ. قَالَ: وَإِنْ رَجَعْتَ كَمَا خَرَجْتَ. قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَعَمِلْتُ بِالَّذِي أَمَرَنِي بِهِ، فَرَجَعْتُ وَلم أنتقص من الْخراج شَيْئا.

Dhaka University Institutional Repository

অমুসলিমদের নিরাপত্তার বিনিময়ে জিযিয়া গ্রহণকালেও আলী (রা.) তাদের কষ্ট লাঘবের উপর গুরুত্ব দিতেন। আয যাহাবী আনতারা থেকে বর্ণনা করেন, “আলী (রা.) প্রত্যেক পেশার ব্যক্তির থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতেন। যে ব্যক্তি সুঁচ তৈরী করতো তোর কাছ থেকে সুঁচ, যে মাসান বানাতো তার কাছ থেকে মাসান, যে রশি তৈরী করতো তার নিকট থেকে রশি নেয়া হতো। জিযিয়া বন্টনে পারদর্শীদের ডেকে স্বর্ন ও রৌপ্য দিয়ে ভাগ-বাটোয়ারা করত বলা হত এবং তারা বন্টন করে দিত। এরপর আলী (রা.) তাদেরকে অন্যান্য জিনিসগুলো বন্টন করে দেয়ার জন্য দিতেন। প্রতিউত্তরে তারা বলতঃ এগুলো বন্টন করার প্রয়োজন নেই। তিনি বলতেন, তোমরা জিযিয়ার উত্তমগুলো বন্টন করে আমার জন্য নিকৃষ্টগুলো রেখেছ। অবশ্যই তোমাদেরকে এগুলো বন্টন করতে হবে। আবু উবাইদ বলেছেন, আলী (রা.) থেকে এটা জানা যায় যে, তিনি জিযিয়া গ্রহণ কালে তাদেরকে দ্রব্য বিক্রি করে অর্থ প্রদান করাকে বাধ্যতা মুলক না করে দ্রব্যই গ্রহণ করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের জন্য সহজ করে দেয়া। যেমন মুআজ (রা.) ইয়েমেন বাসীদের বলেছেন, যে, তোমরা জিযিয়ার পরিবর্তে এক পঞ্চমাংশ দাও, অথবা কাপড় দাও এটা তোমাদের জন্য যেমন সহজসাধ্য তেমনি মদীনার মুহাজিরদের জন্য উপকারী।”[৩৮৭]

এভাবে আলী বিন আবি তালিব (রা.) তাঁর খেলাফত কালে অমুসলিম নাগরিকদের উপর, অত্যাচারের চাবুক না চালিয়ে তাদের উপর কোন প্রকার বল প্রয়োগ ব্যতীত অত্যন্ত কোমলতার সাথে খারাজ ও জিযিয়া আদায় করতেন।

৪.৪.৪ জনৈক পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ

আলী (রা.) ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের প্রতি সহৃদয় ছিলেন। শাসক হিসেবে তিনি তাদের কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। আলী (রা.) যখন মুয়াবিয়া (রা.) এর সাথে যুদ্ধের জন্য সিফফিন অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছেন, তখন পথিমেধ্যে একজন খ্রীষ্টান পাদ্রী তাঁর সাথে এসে দেখা করেন। তিনি আলী (রা.)কে তাদের কিতাবে বর্ণিত একজন পূণ্যবান ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাঁর কাছে ঈসা (আ.) এর সাহাবীগণ দ্বারা লিখিত একটি পত্র প্রদান করেন। ইব্‌ন কাসীর তাঁর গ্রন্থে পত্রটি তুলে ধরেছেন,

---

[৩৮৭] আবু ‘উবায়েদ আল কাসেম ইব্‌ন আসসালাম আল বাগদাদী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫

عَنْ عَنْتَرَةَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي صُنْعٍ: مِنْ صَاحِبِ الْإِبَرِ إِبَرًا، وَمِنْ صَاحِبِ الْمَسَانِّ مَسَانَّ، وَمِنْ صَاحِبِ الْحِبَالِ حِبَالًا، ثُمَّ يَدْعُو الْعُرَفَاءَ فَيُعْطِيهِمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَيَقْتَسِمُونَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «خُذُوا هَذَا فَاقْتَسِمُوهُ» ، فَيَقُولُونَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، فَيَقُولُ: «أَخَذْتُمْ خِيَارَهُ، وَتَرَكْتُمْ عَلَيَّ شَرَارَهُ، لَتَحْمِلُنَّهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا يُوجَدُ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ هَذِهِ الْأَمْتِعَةَ بِقِيمَتِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْهِمْ مِنْ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَلَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى بَيْعِهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، إِرَادَةَ الرِّفْقِ بِهِمْ وَالتَّخْفِيفِ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ مُعَاذٍ، حِينَ قَالَ بِالْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ كَانَ يَأْخُذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزْيَةِ

Dhaka University Institutional Repository

"রহমান রহীম আল্লাহর নামে যিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পত্রে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তার লিখনীতে লিখেছেন এবং তাঁর ফরমানপত্র লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তিনি উম্মতের মধ্যে তাদেরই মধ্য হতে এক রাসূল পাঠাবেন যিনি তাদের কিতাব ও হিকমতের তালীম দিবেন। তাদের পরিশুদ্ধ করবেন এবং আল্লাহর পথের দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। তিনি কর্কশভাষী হবেন না। রূঢ় স্বভাবী হবেন না। হাটে বাজারে হৈ চৈ কারী হবেন না এবং মন্দের প্রতিদান মন্দ দিয়ে দিবেন না। বরং ক্ষমা করবেন। মার্জনা করবেন। তাঁর উম্মত হবে অধিক হামদ প্রশংসাকারী, তারা প্রতিটি চড়াই-উৎরাইয়ে এবং উদাহরণ ও নিম্নগমনে আল্লাহর প্রশংসা করবে। তাদের জিহ্বা অবনমিত থাকবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার ধ্বনি'তে। যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে তার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ তাঁকে ওফাত দিলে তাঁর উম্মাত মতবিরোধে লিপ্ত হবে। পরে তারা একতাবদ্ধ হয়ে যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা সে অবস্থায় থাকবে। পরে আবার তারা মতবিরোধে লিপ্ত হবে। পরে তাঁর উম্মতের একজন লোক এ ফোরাত নদীর তীর দিয়ে পথ অতিক্রম করবেন, যিনি ন্যায়ের আদেশ করবেন এবং অন্যায়ের নিষেধ করবেন, সত্য-ন্যায়ের ফায়সালা দিবেন, বিধানকে অধঃপতিত-অবদমিত করবেন না। দুনিয়া তাঁর কাছে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ায় দিনের ছাইয়ের চেয়ে অথবা বর্ণনান্তরে মাটির চেয়ে তুচ্ছ হবে। মৃত্যু তাঁর কাছে পানি পান করার চেয়ে সহজতর হবে। তিনি গোপনে আল্লাহকে ভয় করবেন, প্রকাশ্যে কল্যাণ-কামনা করবেন, আল্লাহর ব্যাপারে কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনাকে ভয় করবেন না। জনপদসমূহের বাসিন্দাদের যে কেউ সে নবীকে পেয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে তাঁর সওয়াব হবে আমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত। আর যে ব্যক্তি কোন পূণ্যবান বান্দাকে পাবে সে যেন তাঁকে সাহায্যে করে। কেননা, তাঁর সাথে নিহত হওয়া হবে শাহাদাতের মর্যাদা।' অতঃপর রাহিব আলী (রা.) কে বললেন, 'কাজেই আমি আপনার সঙ্গেই থাকব এবং কখনো বিচ্ছিন্ন হব না যেন আপনার যে পরিণতি হবে আমারও সে পরিণতি হয়।"[৩৮৮]

এভাবে একজন খ্রীষ্টান পাদ্রী তাঁর সাহচার্য পাবার আকাংখা প্রকাশ করে এবং আলী (রা.) এর প্রতি তাঁর আসক্তি ও ভালবাসা তাঁর হেদায়েতের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং এ ব্যক্তি ইসলাম

[৩৮৮] আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي قَضَى فِيمَا قَضَى وَسَطَّرَ فِيمَا سَطَّرَ، وَكَتَبَ فِيمَا كَتَبَ أَنَّهُ بَاعِثٌ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَدُلُّهُمْ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ، لَا فظٌّ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا صَخَّابٌ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي بالسَّيئة السَّيئة، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، أُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، وَفِي كُلِّ صُعُودٍ وَهُبُوطٍ، تذلُّ أَلْسِنَتُهُمْ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، وَيَنْصُرُهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ نَاوَأَهُ فَإِذَا توَفَّاهُ اللَّهُ اخْتَلَفَتْ أُمَّتُهُ ثُمَّ اجْتَمَعَتْ فَلَبِثَتْ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ ثُمَّ يَمُرُّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِهِ بِشَاطِئِ هَذَا الْفُرَاتِ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقْضِي بِالْحَقِّ وَلَا يُنَكِّسُ الْحُكْمُ، الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّمَادِ أَوْ قَالَ التُّرَابِ – فِي يَوْمٍ عَصَفَتْ فِيهِ الرِّيحُ – وَالْمَوْتُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ، يَخَافُ اللَّهَ فِي السِّرِّ، وَيَنْصَحُ فِي الْعَلَانِيَةِ، وَلَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنْ أَهْلِ الْبِلَادِ فَآمَنَ بِهِ كَانَ ثَوَابُهُ رِضْوَانِي وَالْجَنَّةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ فَلْيَنْصُرْهُ فَإِنَّ الْقَتْلَ مَعَهُ شَهَادَةٌ

গ্রহণ করে আলী (রা.) এর পক্ষে সিফফিনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে ধন্য হয়।

৪.৪.৫ সংযমী চরিত্র

অমুসলিম কাফের ও যিম্মীদের প্রতি তিনি চরম সংযম অবলম্বন করতেন। তিনি ব্যক্তিগত কারণে কখনো তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন না। বরং আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ জড়াতে বাধ্য হতেন তবে সেক্ষেত্রেও তার চরম ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের প্রতি তার সংযমী ও মহানুভব আচরণ ও ব্যবহার তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। এর একটি দৃষ্টান্ত হল, "কোন এক যুদ্ধক্ষেত্রে আলী (রা.) জনৈক কাফির ব্যক্তিকে পরাস্ত করে তরবারি হাতে তার বুকে চেপে বসলেন তাকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে। কাফির যোদ্ধাটি গত্যন্তর না দেখে তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ আলী বিন আবি তালিব (রা.) তাকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এই অভাবনীয় ব্যবহার সৈন্যটি অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, আমাকে এমন কাবুতে পেয়েও হত্যা করলেন না কেন? আমি তো আপনাকে এমন বাগে পেলে হত্যা না করে ছাড়তাম না। আলী (রা.) উত্তরে বললেন, তুমি আমার প্রতি থুথু নিক্ষেপের সাথে সাথে তোমার প্রতি আমার যে ক্রোধ জন্মেছিল তখন তোমাকে হত্যা করলে সেই ক্রোধকেই প্রশমিত করা হত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হত না। অথচ আমাদের এই প্রাণ নিয়ে খেলা এবং মরণপণ জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর দীনকে সমুন্নত করা। এ কারণেই আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি।"[৩৮৯]

৪.৪.৬ নাজরান বাসীর প্রতি আলী (রা.)

নাজরানবাসী খ্রীষ্টান নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করতে আলী (রা.) তাঁর পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি খেলাফত লাভ করলে ইরাকের নাজরান থেকে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে সাক্ষাত করে । তারা তাদের জন্মভূমি ইয়েমেনের নাজরানে ফিরে যেতে খলীফার লিখিত অনুমোদন এবং মৌখিক সুপারিশ দাবী করে। আলী (রা.) তাদের দাবীর সাথে দ্বিমত পোষণ করেও তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে উমর (রা.) তাদেরকে তাদের ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র সহ দেশ থেকে বহিষ্কার করে ইরাকের নাজরানে পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

[৩৮৯] নুরুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১-২

Dhaka University Institutional Repository

তাই তাদের দাবী তার নিকট অযৌক্তিক মনে হলেও তার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তাদের অধিকারের প্রতি। তিনি তাদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন যাতে লিখিত ছিল,

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, 'আমিরুল মু'মিনীন 'আবদুল্লাহ আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) হতে নাজরানের অধিবাসীদের প্রতি। তোমরা আমার কাছে তোমাদের জান ও মাল সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদানকৃত একটি পত্র এনেছ। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর (রা.) তোমাদেরকে যে অধিকার প্রদান করেছেন তা বহাল থাকল।" [৩৯০]

মোদ্দাকথা আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) এবং আলী (রা.) এর খেলাফতকালে তারা শাসক হিসেবে এবং তাদের অধীনস্থ মুসলিম নাগরিকগণ অমুসলিম নাগরিকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখে বসবাস করতেন। মানুষ হিসেবে তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে তাদের মর্যাদা ও অধিকার ভূলুণ্ঠিত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। তাদের বিস্তৃত বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যে বসবাসকারী যিম্মী নাগরিকগণ তাদের স্বজাতি ইহুদী খ্রীষ্টান শাসকদের শাসনের চেয়ে মুসলিম শাসকদের শাসনকে নিজেদের জন্য বেশী কল্যাণকর মনে করতো। পূর্ববর্তী স্বজাতীয় শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, সুবিধা বঞ্চিত, নিপীড়িত এসব মানুষ মুসলিম শাসনকে স্বাগতম জানিয়ে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত। এমনকি নিজ জাতির বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে মুসলমানদেরকে সাহায্য করত। তাদের জন্য গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতেও তাদের দ্বিধাবোধ ছিল না। এ অবস্থার কারণ ছিল, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং মুসলমানগণ তাদেরকে প্রতিপক্ষ ভাবতেন না। বরং তারা বিশ্বাস করতেন আদম (আ.) এর সন্তান হিসেবে মুসলিম অমুসলিম সবাই এক পরিবার ভুক্ত। তাই ধর্মমতের ভিন্নতার কারণে শত্রুতা, ধ্বংস, বিশৃঙ্খলা, হানাহানির পথ পরিত্যাগ করে বন্ধুভাবাপন্ন, সহযোগিতা, সহনশীলতা ও সহমর্মিতামূলক আচরণই ইসলামের কাম্য। ইসলামের এই উদার ও সহিষ্ণু আদর্শের কারণেই খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ।

[৩৯০] ইমাম আবু ইউসুফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

مَا كتبه عَليّ لأهل نَجْرَانَ:

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لأَهْلِ النَّجْرَانِيَّةِ، إِنَّكُمْ أَتَيْتُمُونِي بِكِتَابٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَرْطٌ لَكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَإِنِّي وَفَّيْتُ لَكُمْ بِمَا كَتَبَ لَكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؛ فَمَنْ أَتَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَفِ لَهُمْ وَلا يُضَامُوا وَلا يُظْلَمُوا وَلا يُنْتَقَصُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِمْ.

وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ، مُنْذُ وَلَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِينَة".

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ প্রাচীন বাংলায় ধর্মসমূহের প্রসার ও সাম্প্রদায়িকতা

বাংলাদেশ নানা ধর্মাবলম্বী জাতি অধ্যুষিত একটি দেশ। এসব ধর্ম গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতিময় সম্পর্ক বিরাজমান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে সাম্প্রদায়িক আছে কি নেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইতিহাসের গভীরে ডুব দেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে যে ভূখণ্ড বাংলাদেশ নামে পরিচিত, আদিতে এর রাষ্ট্রীয় রূপ ও সীমানা ছিল ভিন্ন। এ অঞ্চলটি প্রাচীন বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, সমতট, সুক্ষ্ম, হরিকেল, বরেন্দ্র ইত্যাদি জনপদসমূহের সমন্বিত রূপ। এসব অঞ্চলের প্রাচীনতম ইতিহাস অস্পষ্ট। ঐতরেয় ব্রাক্ষণ, আচারঙ্গ, ভাগবত পুরাণ, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এ অঞ্চলের জনপদসমূহ সম্পর্কে যৎসামান্য তথ্য পাওয়া যায়। সে গুলোও কতটুকু নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে লিখা হয়েছে তা প্রশ্নবিদ্ধ। কেননা, এসব গ্রন্থের রচয়িতাগণ কেউই এ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন না। তাদের গ্রন্থে এ অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা কোমবদ্ধ অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতো বলে জানা যায়। ভাষা দুর্বোধ্য হওয়ায় তারা এসব কোমগুলোকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেননি। এদের আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, বসন-ব্যসনও তাদের কাছে রুচিকর ছিল না। তাই দেখা যায় প্রাচীন এসব গ্রন্থসমূহে এ অঞ্চলের আদি অধিবাসীদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা ভরে দস্যু, ম্লেচ্ছ, পাপ, অসুর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, ঐতরেয় ব্রাক্ষণের বর্ণনাসূত্রে অনেকগুলো 'দস্যু' কোমের নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে পুন্ড্রকোম একটি। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও বগধ (মগধ) জনদের ভাষা পাখির ভাষার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মহাভারতে সমুদ্রতীরবাসী বাংলার লোকদের বলা হয়েছে 'ম্লেচ্ছ'। ভাগবত পুরাণে সুক্ষ্মদের বলা হয়েছে 'পাপ' কোম। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে গৌড়, পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল জনপদের লোকদের ভাষাকে বলা হয়েছে অসুর ভাষা। এসব আদিম জনগোষ্ঠীর উপর আর্য ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির বাহকেরা ক্রমশ পূর্ব দিকে বিস্তার লাভ করেন। এর কারণ হল প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মের তাড়নায় উর্বর শস্যক্ষেত্রের সন্ধানে আদিমতর কোমবৃন্দের উপর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব কায়েম।[৩৯১] এভাবে ইতিহাসের অনেক চড়াই উৎরাই মাড়িয়ে বর্তমানে এ অঞ্চলটি বাংলাদেশ নামে অভিহিত।

এ দেশের প্রাচীন ভূখণ্ডে সময়ের পরিক্রমার সাথে সাথে নানা জাতি ও নানা ধর্মের আগমণ ঘটেছে। এসব জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ধর্মসমূহ এ অঞ্চলের আদি অরণ্যবাসী জনপদসমূহে বিস্তৃত করেছে। অথবা তাদের ধর্মাচারণ এ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে প্রভাবান্বিত করেছে। ফলে প্রাচীন জনপদসমূহ যে ধর্ম বিশ্বাস লালন করত তার সাথে আগন্তুক জাতিসমূহের ধর্ম বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে। এই সমন্বয় কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অথবা কখনো

[৩৯১] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, অগ্রহায়ণ ১৪২০), পৃ. ৩৫১

সংঘাতের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মসমূহ বিস্তারের সময় এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেমন বিদ্যমান ছিল তেমনি বলপ্রয়োগের সময় সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, সংঘাতও ছিল অনিবার্য। এসব ইতিহাস অনেক বিস্তৃত। নিম্নে শুধুমাত্র অভিসন্দর্ভের প্রসঙ্গানুসারে এদেশে বিভিন্ন ধর্মের প্রসার ও ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের আন্ত:সম্পর্ক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হল:

খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-৩৫০ অব্দের ইতিহাস পুরাণ কথায় সমাচ্ছন্ন। ইতিহাসের সেই তমসাচ্ছন্ন সময়ে ধর্ম বলতে প্রাচীন কোমবদ্ধ মানুষের লালিত আচার বিশ্বাসকেই বোঝায়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এ সম্পর্কে বলেছেন, "বস্তুত, বাঙালীর ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুন্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাঙলার আদিবাসীদেরই পূজা, আচার অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস।" [৩৯২]

এসময় বাংলার আদিম অধিবাসীরা অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের মত বিশেষ বৃক্ষ, পাহাড়, পাথর, ফুল, ফল পশু-পাখী, প্রজনন শক্তি, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদিকে অলীক শক্তি কল্পনা করে পূজা অর্চনা করত। এছাড়া মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদি, টোটেমের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং মানুষের ব্যাধি ও দুর্ঘটনাসমূহ দুষ্ট শক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বারা সংগঠিত হয় বলে বিশ্বাস দ্বারা তাদের ধর্ম গঠিত ছিল। আদিবাসী অনার্য এই ধর্মবিশ্বাসের সাথে আর্য ধর্মের সংমিশ্রণ সম্পর্কে অধ্যাপক গোলাম মুরশিদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> "খৃষ্টপূর্ব আমলের সংস্কৃত শাস্ত্র এবং সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, বঙ্গদেশকে তখন বলা হতো অপবিত্র এবং ব্রাত্যদের দেশ। ব্রাত্যদের দেশ বলা হতো এই জন্যে যে, এ দেশের লোকেরা বৈদিক পূজা পার্বণ পালন না করে স্থানীয় ব্রতাদি পালন করতেন। শাস্ত্রকাররা সে কারণে 'সে দেশে যেয়ো না' বলে বিধান দিয়েছিলেন। তবু ভারতের একেবারে একপ্রান্তে অবস্থিত এই দেশে আর্যরা এসেছিলেন খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগেই। তাদের সঙ্গে এসেছিলো আর্য-সংস্কৃতি। এঁদের সঙ্গে আদান-প্রদানের ফলে ধীরে ধীরে স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষি এবং সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির ওপর তাঁদের সভ্যতার বিরাট প্রভাব পড়েছিলো।"[৩৯৩]

প্রাচীন এসব লোকায়ত আচার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই আর্যধর্ম এদেশের মানুষের ধর্ম-মানসে স্থান করে নিয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় অনেক আচার অনুষ্ঠান আর্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে আর্য ধর্মের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে এর অধিভুক্ত হয়েছে। যেমন, 'গ্রাম দেবতা' বাংলার পাড়াগাঁয়ে গ্রামের বসতিসমূহের সীমানার বাইরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে, কোথাও উন্মুক্ত আকাশের নীচে বা গাছের

[৩৯২] নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮

[৩৯৩] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, জুলাই ২০১৪), পৃ. ৫১

ছায়ায় মূর্তিরূপী কোন দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন, কোথাও আবার থাকেন না। কিন্তু গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার মানত, পশু-পাখী বলি তিনিই গ্রহণ করেন। কালী, ভৈরব বা ভৈরবী, চন্ডী বা বনদুর্গা বিভিন্ন নামে স্থান কাল পাত্র ভেদে তিনিই আদিম জনগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা। আর্য ব্রাহ্মণ্য মানস সমাজ এসব গ্রাম্য দেবতার প্রতি ভক্তিমূলক ছিলনা। এমনকি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে তারা এসব পূজারীদের পতিত বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এরপরও এসব গ্রাম্য দেবতারা সময়ের পথ পরিক্রমায় ক্রমশ আর্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করেছেন।[৩৯৪] এরূপ প্রাচীন ধর্মকর্মানুষ্ঠানের অন্যতম হল ধ্বজা পূজা, যা আর্য ব্রাহ্মণ্য সমাজ কর্তৃক এমনভাবে সমন্বিত হয়েছে যা পৃথক করা অসম্ভব। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় এসম্পর্কে লিখেছেন,

> "এক এক কোম বা গোষ্ঠীর এক এক পশু বা পক্ষীলাঞ্ছিত ধ্বজা, সেই ধ্বজার পূজাই বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কোমগত পূজা এবং তাহাই তাঁহাদের পরিচয়; সেই কোমের যিনি নায়ক বিশেষ বিশেষ লাঞ্ছন অনুযায়ী তাঁহার নাম তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ বা হংসধ্বজ। এই ধরনের পশু বা পক্ষী লাঞ্ছিত পতাকার পূজা আদিম পশুপক্ষী হইতেই উদ্ভূত; বহু পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবদেবীর রূপকল্পনায় তা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। প্রমাণ, আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন, দেবীর বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, বিষ্ণুর বাহন গরু, শিবের বাহন নন্দী, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচক, সরস্বতীর বাহন হংস, ব্রহ্মার বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কূর্ম, সমস্থই সেই আদিম পশুপক্ষী পূজার অবশেষ।"[৩৯৫]

এভাবে আদি কোমবদ্ধ জনগোষ্ঠীয় গাছপূজা, ধর্মঠাকুর পূজা, হোলী উৎসব, চড়কপূজা, মনসা পূজা, জাঙ্গুলী, ষষ্ঠীপূজা, রথযাত্রা, বিভিন্ন ব্রতোৎসব ধীরে ধীরে আর্য ব্রাহ্মণ্য ও আর্য বৈদিক ধর্মে মিশ্রিত হয়ে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠানের এই সংমিশ্রণে যে বহু বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তার প্রমাণ ঋদ্বেগ হতে আরম্ভ করে হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, ধর্মসূত্র কোথাও কোনও প্রচলিত ব্রতের কোনও উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যে এই ধর্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করতো না এ তথ্য সুস্পষ্ট। সম্রাট অশোক স্পষ্টই বলেছেন যে, গ্রাম্য লোকায়ত ধর্মের আচার অনুষ্ঠান তিনি পছন্দ করতেন না। বিশেষত নারীদের মধ্যে প্রচলিত নানা ধরনের মঙ্গলানুষ্ঠান প্রভৃতি তাঁর নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল। [৩৯৬]

এসব তথ্য থেকে বলা যায় প্রাক আর্য ও আর্যোত্তর সময়ে বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সহিংসতা সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকলেও সে সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্প্রীতি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল।

---

[৩৯৪] নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮১

[৩৯৫] প্রাগুক্ত

[৩৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮

উত্তর ও মধ্যভারত থেকে যেসব রাজবংশ, বণিক ও ব্যবসায়ী যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিস্তার ও ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে প্রাচীন বাংলায় এসেছেন তাদের সাথেই আর্য ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি এদেশে প্রসার লাভ করেছে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে এদেশবাসীর প্রথম আর্যধর্ম পরিচয়। তারপর গুপ্ত আমলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলায় বিস্তৃত হয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ - তৃতীয় শতকেই পুন্ড্রবর্ধন, অঙ্গ, বঙ্গ এবং রাঢ় অঞ্চলে জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু প্রাক আর্য কোমবদ্ধ আদিবাসীদের কাছে অতি সহজেই এ ধর্ম গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তাদের সাথে আর্য সমাজের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের তথ্য পাওয়া যায়। যেমন আচারঙ্গ সূত্রে জানা যায়, এ ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ধর্মপ্রচারে এদেশ অবস্থানকালে বহু দুঃখ, দুর্গতি ও লাঞ্ছনার মুখোমুখি হয়েছেন। এমনকি স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁর ও তার সঙ্গীদের পিছনে কুকুর পর্যন্ত লেলিয়ে দিত। এরূপ সহিংস আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায় দিব্যবধানের একটি গল্পে। তা হল, মৌর্য সম্রাট অশোক একবার পুন্ড্রবর্ধনের নির্গ্রন্থদের (জৈনদের) অপরাধে (ভুল করে) পাটলীপুত্রের ১৮,০০০/- আজীবিকদের হত্যা করেছিলেন। এসময় আজীবিক ধর্মও এ অঞ্চলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। আজীবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মখলিপুত্র গোসাল ও মহাবীর ছিলেন সমসাময়িক ও পরমবন্ধু। ভগবতী গ্রন্থমতে, তারা দুজন এক সঙ্গে ছয় বছর কাটিয়েছিলেন বজ্রভূমির অন্তর্গত পণিত ভূমিতে। তাছাড়া দিব্যবধান রচনাকালে পুন্ড্রবর্ধনে নিগ্রন্থ জৈনদের এবং আজীবিকদের বহুদিন একসঙ্গে বসবাসের ফলে তাদের ধর্মমত, আচার-অনুষ্ঠান, বসন-ভূষণ প্রায় একই রকম ছিল।[৩৯৭] তাই সে সময় জৈন এবং আজীবিক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল একথা বলা যায়।

জৈন ও আজীবিকদের সমসাময়িক কালে বৌদ্ধধর্মও প্রাচীন বাংলায় বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা গ্রন্থের ভাষ্যমতে, বৌদ্ধধর্মের প্রচারক গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পুন্ড্রবর্ধনে এসে একবার ছয় মাস বাস করেছিলেন। এছাড়া চীনা পরিব্রাজক য়ুয়াং চোয়াঙও বলছেন, বুদ্ধদেব পুন্ড্রবর্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে এসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুন্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল মহাস্থান শিলাখণ্ড লিপিতে তো তার প্রমাণ বিদ্যমান। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন,

> "বাংলাদেশে (এ ক্ষেত্রে বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গে) বৌদ্ধধর্ম প্রসারের আরও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইতেছি, খ্রীষ্টত্তোর তৃতীয় শতকের নাগার্জুনীকোন্ডর একটি শিলালিপিতে। সিংহলী থেরবাদী বৌদ্ধদের চেষ্টা ও উৎসাহে ভারতবর্ষের অনেক জনপদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। এই সব দেশের একটি দীর্ঘ তালিকা এই লিপিতে দেওয়া হইয়াছে এবং তালিকাটিতে বঙ্গের উল্লেখ আছে। মহাযান সাহিত্যের মতে বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোড়শ মহাস্থবিরের মধ্যে অন্তত একজন ছিলেন বাঙালী। তিনি তাম্রলিপ্তিবাসী

[৩৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯৩- ৪৯৪

স্থবির কালিক। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা কঠিন। মনে হয় তিনি প্রাক গুপ্তপর্বের লোক।”[৩৯৮]

বর্তমান বাংলাদেশে প্রাকগুপ্তযুগে জৈন আজীবিক বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করলে ও আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসারের নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এসময় স্থানীয় ধর্মের সাথে আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কিছু কিছু সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থসমূহে। যেমন, হরিবংশ গ্রন্থে যাদব-কৃষ্ণের সাথে পুন্ড্র-বাসুদেবের এক সংঘর্ষের কাহিনী উল্লেখিত হয়েছে। শঙ্খ-চক্র, গদা-পদ্মধারী পৌন্ড্রক বাসুদেব কৃষ্ণের বাসুদেবত্বের দাবিতে অবিশ্বাসী ছিলেন। এই যুদ্ধে পৌন্ড্র পরাজিত ও নিহত হন। এছাড়া মহাভারতে ভীমের পূর্বাভিযান প্রসঙ্গে এক পৌন্ড্রক বাসুদেবের পরাজয় কাহিনী বর্ণিত আছে।[৩৯৯] ধারণা করা হয় হয়তো বা তিনিই পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধনের অধিবাসী যার পরাজয়ের মাধ্যমে এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আগমণ শুরু হয়।

তবে বাংলাদেশের আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সার্থকভাবে প্রসার ও স্থায়ী হতে আরম্ভ করে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে ৩৫০ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাচীন শিলা লিপি ও তাম্রপটে দেখা যাচ্ছে, এ সময় বাংলাদেশের নানা স্থানে ব্রাহ্মণরা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। গ্রামবাসী কোনও গৃহস্থ ভূমি কিনে ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে ভূমি দান করে তাদের গ্রামে পুনর্বাসন করছেন। ভূতিবর্মার রাজত্বকালে শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে দুই শতেরও উপর ব্রাহ্মণ পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এরা নানা গোত্র ও গ্রন্থের অনুসারী। সপ্তম শতকে সমতটে জঙ্গল কেটে নতুন বসতির গোড়াপত্তন করা হয় যার অধিবাসীরা সকলেই চতুর্বেদবিদ ব্রাহ্মণ।[৪০০]

এভাবে বাংলার সর্বত্র আর্য বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্থায়ী আসন তৈরী করে তবে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা। গুপ্ত রাজবংশ ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী এবং তাদের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটে। তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাই তাদের রাজত্বকালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল। তারা ভিন্নধর্মের হয়েও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সারনাথ বিহার, নালন্দা মহাবিহারের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা ছিল। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু শশাঙ্ক যিনি গুপ্ত রাজাদের মহাসামন্ত ছিলেন। তিনি ৬০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন এক সময়ে গৌড়ের স্বাধীন অধিপতি ছিলেন এবং কর্ণসুবর্ণে নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় গৌড়ে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। শৈব ধর্মাবলম্বী শশাঙ্ক বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন এবং প্রভূত ক্ষতিসাধনও করেছিলেন। য়ুয়ান চোয়াঙ তার এই বৌদ্ধ বিদ্বেষ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন যে, শশাঙ্ক কুশীনগরে এক বিহারের ভিক্ষুদের বহিষ্কার করে দিয়েছিলেন, পাটলিপুত্রে বুদ্ধপদাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেছিলেন,

---

[৩৯৮] প্রাগুক্ত

[৩৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫

[৪০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭- ৪৯৮

বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কেটে তার মূল পর্যন্ত ধ্বংস করে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। একটি বুদ্ধমূর্তি সরিয়ে সেখানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং তার দ্বারা সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণ উৎঘাটনের চেষ্টা করেছেন নীহাররঞ্জন রায়। তিনি বলেছেন,

> "শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কারণ অনুমান সহজেই করা যায়। প্রথমত এই যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল বাঙলা ও আসামের সর্বত্র; কোনও কোনও রাজবংশ এই নবধর্ম ও সংস্কৃতির গোঁড়া পোষক ও ধারক হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত, যে সব উচ্চ কোটি শ্রেণি সমূহের মধ্যে এই ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিতেছিল সেই সব শ্রেণীই তো রাষ্ট্রের প্রধান ধারক ও সমার্থক; কাজেই তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও সহায়ক হইবে রাষ্ট্র, ইহা আর বিচিত্র কী? এই যুগের সকল রাজবংশই তো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী। দ্বিতীয়ত, শশাঙ্কের অন্যতম প্রধান শুত্রু হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের অতি বড় পোষক। শত্রুর আশ্রিত লালিত ধর্ম নিজের ধর্ম না হলেও তাহার প্রতি বিদ্বেষ স্বাভাবিক।"[৪০১]

নীহাররঞ্জন রায় শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষের কারণ বর্ণনা করে আরো বলেন,

> "সমসাময়িক পূর্বভারতে সর্বত্রই নবব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার এবং দেব- পূজকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। রাজবংশগুলি প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী; গৌড় ও কর্ণসুবর্ণে ব্রাহ্মণ্য রাজবংশ, কামরূপ ও মগধে তাহাই; ওড়িষ্যায় তাহাই। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ক্রমবিস্তারমান। যে পুষ্যভূতি বংশ ছিল ব্রাহ্মণ্য দেবপূজক সেই বংশের রাজা হর্ষবর্ধন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগীও পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়া ছিলেন। নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যেমন নব বলে বলীয়ান হইয়া সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তারে প্রাগ্রসর, বৌদ্ধধর্মও তেমনই যোগাচারে সমৃদ্ধ হইয়া সমান প্রাগ্রসর, এই দুই ধর্মই তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; জনসাধারণের মধ্যে সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তার উভয়েরই লক্ষ্য। কাজেই এমন অবস্থায় কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ী রাজা বা রাজবংশের পক্ষে অন্য ধর্মের উপর বিদ্বেষী হওয়া কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিদ্বেষের কারণ সক্রিয়। বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় মুখপাত্র তখন হর্ষবর্ধন, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শশাঙ্ক; রাষ্ট্রক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং উভয়েই সংগ্রামরত।"[৪০২]

তাই বলা যায়, শশাঙ্ক কর্তৃক এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সহিংসতা, অত্যাচার নির্যাতন শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। অন্য কোন কারণ সক্রিয় নয়। সেখানে পরধর্মবিদ্বেষ বা পরধর্ম অহিষ্ণুতা নেই। এ জন্যে দেখা যায় রাজ্যের উচ্চ পর্যায়ে যত বিদ্বেষই থাকুক না কেন আপামর জনসাধারণের মধ্যে তা সংক্রমিত হয়নি। য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণীতেও পাওয়া যায়, সে সময় বৌদ্ধ শ্রমণ ও গৃহস্থোপাসক এবং ব্রাহ্মণ্য দেবপূজক সকলেই একই সাথে মিলেমিশে বসবাস করতেন। আর এই সম্প্রীতিময় পরিবেশ তৈরীতে একমাত্র রাজা শশাঙ্ক ব্যতিত গুপ্ত বংশের সকল

---

[৪০১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫
[৪০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬

রাজারই অবদান রয়েছে। যেমন, পরম ভাগবত ব্রাহ্মণ শ্রীগুপ্ত গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনি চীনা শ্রমণদের জন্য চীনা মন্দির নির্মাণ এবং তার সংরক্ষণের জন্য ২৪টি গ্রাম দান করেছিলেন। বৌদ্ধ জয়নাথ পরম বৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের অন্যতম প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন, তিনি বৌদ্ধসংঘে যেমন ভূমি দান করেছেন, তেমন ব্রাহ্মণদেরকেও ভূমি দান করেছেন। পঞ্চম শতকে পাহাড়পুর অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ দম্পত্তি এক জৈন বিহারে ভূমিদান করেছিলেন। ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে সামন্ত মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধক্রমে শৈবধর্মাবলম্বী মহারাজ বৈন্যগুপ্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ বিহারের সেবা পূজা ইত্যাদির জন্য ভূমি দান করেছিলেন। গুপ্তযুগের এই চিত্র হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি সহাবস্থান করছেন আর একে অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধিত ও অনুরক্ত এবং প্রয়োজন হলে পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। কোথাও ধর্মমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কোন দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি কোনও সময় গোপালদেব পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ চারশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে বাঙালী এই বংশ প্রাচীন বাঙলায় রাজত্ব করে। এ সময় বৌদ্ধ এবং আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মই ছিল মানুষের প্রধান ধর্ম এবং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় কোন সহিংসতার তথ্য পাওয়া যায় না। বরঞ্চ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজারা তাদের স্বধর্ম প্রচারে যেমন একাগ্রচিত্তে প্রচেষ্টা করেছেন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তারে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এমনকি এ সময় বৌদ্ধধর্ম আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সকাশে এসে নতুন রূপ লাভ করে। প্রাচীন আর্য দেব-দেবী ও আচার অনুষ্ঠান বৌদ্ধ ধর্মে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুরের অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকগুলোতে। এজন্যে এই সময়টিকে বলা হয় ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর সমন্বয়ের যুগ। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

> "…. পালরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম, স্মৃতি, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক, চার্তুবর্ণের রক্ষক ও সংস্থাপক; লিপিগুলিতে তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ধর্মে ইহারা বৌদ্ধ পরম সুগত; ইহারা মহাযানী বৌদ্ধসংঘ ও সম্প্রদায়ের পরম অনুরাগী পোষক; অথচ বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মও ইহাদের আনুকূল্য ও পোষকতা লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, একাধিক পালরাজা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূজা ও যাগযজ্ঞে নিজেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, পুরোহিত-সিঞ্চিত শান্তিবারি নিজেদের মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মে ব্রাহ্মণেরা নিয়োজিত হইতেন, মন্ত্রী এবং সেনাপতিও হইতেন, আবার কৈবর্তরাও স্থান পাইতেন না এমন নয়। এই ভাবে পাল বংশকেও কেন্দ্র ও আশ্রয় করিয়া বাঙলাদেশে প্রথম সামাজিক সমন্বয় সম্ভব হইয়াছিল; একদিনে নয়, চারিশত বৎসর ধরিয়াই তাহা চলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর স্মৃতি ও আচার, আর্য ও আর্যেতর সংস্কার ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, পূজা, শিক্ষা ও আদর্শ দেবদেবী সমস্তই পালবংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করিয়া পরস্পরে আদান প্রদান করিয়াছে এবং এক মিলন সমন্বয় সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি বৃহৎ সামাজিক সমন্বয় গড়িয়া তুলিয়াছে।"[৪০৩]

---

[৪০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালরাজাদের অন্তপূরেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবল পরাক্রমের সাথে স্থান দখল করে নিয়েছিল। পাল নরপতিরা অনেকেই ব্রাহ্মণ্য রাজবংশীয়া রাজকুমারীদেরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যেমন রাজা কান্তিদেবের পিতা রাজা ধনদত্ত রামায়ন-মহাভারত-পুরাণে পারঙ্গম এক শৈব রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। এছাড়া পাল রাজাগণ নিজেদের পুণ্যের ভাণ্ডারকে বৃদ্ধি করতে ব্রাহ্মণদেরকে ভূমিদান করতেন। যেমন রাজা ন্যায়পাল এক পণ্য নবমী তিথিতে স্নান করে তার বৌদ্ধ পিতামাতার ও নিজের পূণ্য ও যশোবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেছিলেন। রাজা ধর্মপাল তার মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত নারায়ন মন্দিরের জন্য ভূমিদান করেছিলেন। রাজা রামপাল রামাবতী নগরীতে শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ রুদ্রের একটি দেউল এবং সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪০৪]

এসব ঘটনাবলী পালযুগে প্রাচীন বাংলায় সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান ও সম্প্রীতির প্রমাণ বহন করে তবে এর পরবর্তী সেন রাজবংশের রাজত্বকালে এরূপ সম্প্রীতি খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। বরঞ্চ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজারা স্থানীয় বৌদ্ধ এবং আগন্তুক মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত বিরাগভাজন ছিলেন এবং তাদের দ্বারা বৌদ্ধ প্রজাদের নিগ্রহের তথ্য পাওয়া যায়।

এগারো শতাব্দীর শেষাংশে ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী হেমন্ত সেন রাঢ়ভূমি দখল করেন। তাঁর পুত্র ভজসেন গৌড়ের কিংয়দংশ ও বঙ্গভূমি দখল করেন। ক্রমান্বয়ে কামরূপ ও কলিঙ্গও নিজের আয়ত্বে আনেন। এরপর রাজা বল্লালসেন পূর্ববঙ্গ থেকে বিহার পর্যন্ত রাজত্ব বিস্তৃত করেন। এ সময় বাংলায় ইসলাম প্রচারক বাবা আদমের সাথে তার সংঘর্ষের কথা জানা যায়। ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তদ্বীয় পুত্র লক্ষণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করে লক্ষণাবতী তথা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি তার পিতার মত স্বীয় হিন্দু সভাসদ ও কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে তার রাজ্যে ইসলাম প্রচারকদের নিষেধাজ্ঞা ছিল। [৪০৫]

এছাড়া সেন আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর চরম অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়। এর কারণ হল শাসন ক্ষমতার পালাবদল। ব্রাহ্মণ সেন রাজাদের কাছে ক্ষমতা হারানো বৌদ্ধ পালরাজ বংশের উত্তরসূরীরা শাসন কর্তৃপক্ষকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। আবার সেন রাজাদেরও তাদের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ হেতু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী অবিশ্বাস, বিরোধ, হিংসা, বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল। এর রেষ ধরে সেন রাজাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাদের প্রিয় জীবন, মান-সম্মান, ধর্ম-সংস্কৃতি, সাহিত্য-ঐতিহ্য রক্ষা করতে নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিদেশে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করেন।[৪০৬]

---

[৪০৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২

[৪০৫] ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *বাংলাদেশে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব চর্চার স্বরূপ ও বিকাশধারা*, (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, সেপ্টেম্বর ২০১৪), পৃ. ৮২

[৪০৬] মুহাম্মদ আবদুল খালেক, *অন্ধকার যুগ ও মধ্যযুগে সাহিত্যচর্চা*, (ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০৪), পৃ. ২৬

তবে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর গ্রন্থে সে যুগে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পাশাপাশি সহাবস্থানের তথ্যও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

> "বৌদ্ধ ও ব্রাক্ষণ্য ধর্মে একটা সংঘর্ষ যেমন বহু যুগ হইতে চলিতেছিল। তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নানাস্তরে নানা ক্ষেত্রে নানা উপায়ে একটা এ সমন্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। ইহাই বস্তুর স্বভাব। বৌদ্ধ ও ব্রাক্ষণ্য ধর্মের ইতিহাসেও তাহার বাত্যয় হয় নাই। কিন্তু প্রাচীনতর কালের কিংবা সর্বভারতের কথা এখানে বলিয়া লাভ নাই; বাঙলাদেশের অষ্টম-নবম হইতে দ্বাদশ-এয়োদশ এই চার পাঁচশত বৎসরের কথাই বলি। পাল-চন্দ্র পর্বে রাষ্ট্রের আনুকুল্যের ফলে এবং ননা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে মহাযানী-বজ্রযানী-সহজযানী-কালচক্রযানী বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখা গিয়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাক্ষণ্যধর্মাশ্রয়ী লোকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী এবং সেই ধর্মের দেবদেবীর প্রভাব প্রতিপত্তিও কিছু কম ছিল না। দুই ধর্মের লোকদের সাধারণ লোকায়ত স্তরে ধর্ম লইয়া দ্বন্দ কোলাহল খুব যে ছিল মনে হয় না। কিন্তু উপরের স্তরে ধর্ম ও সংস্কৃতির নায়কদের মধ্যে একদিকে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ যেমন ছিল তেমনই অন্য দিকে একটা সমন্বয়ের সচেতন চেষ্টাও ছিল।"[৪০৭]

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের মাধ্যমে সেন রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটে।

সেন রাজবংশের পতনের সাথে সাথে বাংলার প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে। এ সময় বাংলার ইতিহাসে স্থানীয় জনপদসমূহের লোকায়ত ধর্মের সাথে সাথে আর্য ধর্মসমূহের প্রসার ঘটেছে। আর ধর্মসমূহের প্রসারের পথ কখনোই মসৃণ ছিল না। একেকটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে তার পূর্ববর্তী ধর্মীয় অনুসারীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। আবার কখনো স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা স্বেচ্ছায় বিস্তৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করেছে। পারস্পরিক আদান প্রদান সম্পন্ন করেছে। সাম্প্রদায়িক সংঘাত যা সংঘঠিত হয়েছে তা রাজ্যের উচ্চ পর্যায়ে; যেখানে সক্রিয় ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ।

৫.২ মুসলিম শাসনাধীনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে মুসলিম শাসনের সূচনার অনেক আগে থেকেই এ দেশে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল। ফলে বাংলায় বিরাজমান বহু ধর্মের সমাবেশে ইসলামও সংযুক্ত হল। অনুমান করা হয় আরব ব্যবসায়ী এবং ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে এদেশের মানুষ ইসলামের সাথে পরিচিত হয়ে মুসলমান হতে শুরু করে। অবশ্য তা শুধুমাত্র চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, হাতিয়া, সন্দীপসহ উপকূলবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে সীমিত ছিল। পরবর্তী সময় ইসলামের ধর্মপ্রচারকগণ ঢাকা, বগুড়া, সিলেট এবং নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতক

---

[৪০৭] নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩

পর্যন্ত তা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয় এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের সাথে সাথে এর সমাপ্তি ঘটে। এই সাড়ে পাঁচশত বৎসর রাষ্ট্রের কর্তারূপে মুসলাম জাতি নানা ধর্মের মানুষকে শাসন করে। এই সুদীর্ঘ সময়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তারা কিরূপ ব্যবহার করেছেন, সে সময় নানা ধর্মাবলম্বী মানুষের পরস্পরের মেলামেশা, আচার-আচরণ কেমন ছিল তা জানলেই জানা যাবে সে সময়কার সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বরূপ। আর যদি কোন সংঘাত, সহিংসতা হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি ছিল? এ প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজতেই ইতিহাসের পরিক্রমায় পথ চলা।

৫.২.১ মুসলিম শাসনের সূচনা

বাংলার সমাজ যখন সেন রাজবংশের অত্যাচারে জর্জরিত, বৌদ্ধ ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর নির্যাতনে নিষ্পেসিত তখনই ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে প্রথমে নদীয়া এবং পরে প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে এদেশে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। এর ফলে নানা দেশ থেকে দলে দলে মুসলমানরা ভাগ্যান্বেষণে এদেশে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং এ আগমনের ধারা অব্যাহতভাবে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে। মুসলিম শাসনামলে একশত একজন অথবা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসন পরিচালনা করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহন করে দিল্লীর সম্রাটের অনুমোদন নিয়ে নেয়। আবার কেউ কেউ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এদেশ শাসন করে। আর অবশিষ্ট শাসকগণ দিল্লীর দরবার থেকে গভর্ণর অথবা নাজিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলার মুসলিম শাসনকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

১২০৩-১২২৭ খৃ: খিলজীদের অধীনে

১২২৭-১৩৪২ খৃ: দিল্লীর সুলতানের অধীনে

১৩৪২-১৪১৩ খৃ: ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে

১৪১৪-১৪৪১ খৃ: গণেশ জালাল উদ্দীনের অধীনে

১৪৪২-১৪৮৭ খৃ: ইলিয়াস শাহী বংশের অধীনে (২য় বার)

১৪৮৭-১৪৯৩ খৃ: হাবশী শাসনাধীনে

১৪৯৩-১৫৩৮ খৃ: হুসেন শাহী বংশের অধীনে

১৫৩৮-১৫৬৪ খৃ: পাঠানদের অধীনে

১৫৬৫-১৫৭৫ খৃ: করবাণী বংশের অধীনে

১৫৭৬-১৭৫৭ খৃ: মোগল শাসনাধীনে [৪০৮]

[৪০৮] আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগষ্ট ২০০৬), পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে পাঁচশত চুয়ান্ন বছর বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এদেশের জনগণ মুসলিম শাসনকে তাদের সমাজ ও সভ্যতায় যে অশুভ কালো ছায়া পড়ছিল তা থেকে মুক্তির আশায় সাদরে সম্ভাষণ জানিয়েছিল। কারণ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা নানা পাপ পঙ্কিলতায় এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যেখানে তাদের মুক্তির কোন পথ ছিল না। নীহাররঞ্জন রায় মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়,

> "একদিকে উত্তর ভারতের অধিকাংশ যখন মুসলমানদের করতলগত, উত্তর গাঙ্গেয় ভারতে, অর্থাৎ বর্তমান যুক্তপ্রদেশ (উত্তর প্রদেশ) ও বিহারে যখন রাষ্ট্রীয় অবস্থা প্রায় নৈরাজ্য বলিলেই চলে, তখন বাঙলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় বিভক্ত; রাজসভা চরিত্র ও আত্মশক্তিহীন; ধর্ম ও সমাজ বিলাস লালসায় ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত; শিল্প ও সাহিত্য বস্তু সম্বন্ধবিচ্যুত ভাব কল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলংকারিক আতিশয্য এবং গেহশত লীলাবিলাসে ভারগ্রস্ত ও মদির; জন সাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য-ডাকিনী-যোগিনীদের অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড তুকতাকে পঙ্গু; উচ্চতর বর্ণসমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধোগতির চিত্র সম্পূর্ণ; উভয় চরিত্রে ও আত্মশক্তিতে দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত। এই দুর্বল ও দৈন্যপীড়িত রাষ্ট্র ও সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সমাজ-প্রকৃতির নিয়মে পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া দেশ তাহার মূল্য দিয়া যাইবে, ইহা বিচিত্র নয়! বখ্‌ত্‌-ইয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাঙলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধোগতির অনিবার্য পরিণাম মুসলমান অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্বের ভারতীয় বুদ্ধি ও সংস্কৃতির অবস্থার কথা বলিতে গিয়া প্রসিদ্ধ উর্দূভাষী মুসলমান কবি হালি বলিয়াছেন;
>
> ইধর্ হিন্দ্ মেঁ হরতরক অন্ধেরা।
> কি থা গিয়ান গুণকা লড়াইয়াঁসে ডরা ॥
> বাস্তবিকই হিন্দুস্থানে তখন চারদিকে অন্ধকার!!"[৪০৯]

সমাজের এই তমসাচ্ছন্ন যুগে মুসলিম শাসন যেন স্থানীয় সাধারণ মানুষের জন্য মুক্তির বাণী নিয়ে এল। রামাই পন্ডিত তার গ্রন্থে এই অবস্থাকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন,

> "বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম
> মায়ারূপে হইল খনকার।
> ধর্ম হইলা জবনরূপী মাথায়েতে কালটুপি হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
> চাপি আ উত্তম হএ ত্রিভুবনে লাগে ভএ
> খোদাএ বলিআ এক নাম।।

---

[৪০৯] নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

ব্রহ্মা হইলা মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ব হৈলা শূলপানি।
গণেশ হইল গাজী কার্তিক হইয়া কাজী
ফকির হইলা জথ মুনি।
তেজি আ আপন ভেক, নারদ হইলা শেক
পুরন্দর হইলা মলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সেধে
সভে মিলে বাজাএ বাজনা।।
আপনি চন্ডিকা দেবী তিহ হইলা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈলা বিবি নূর।
জথেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
প্রবেশ করিল জাজপুর।"[৪১০]

অর্থাৎ সমাজের আকাশে বাতাসে যখন দূর্যোগের ঘনঘটা, যখন দেশের সাধারণ জনগণ, শাসক শ্রেণীর কবল হতে পরিত্রাণ চাচ্ছিল তখনই ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর লক্ষণাবতী ও গৌড় বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে মুসলিম শাসনের আগমণ ঘটে এবং একশ বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলায় মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। আর মুসলিম শাসনের আওতায় এসে এদেশের মানুষ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। তারা নিজেদের মত করে মুসলমানদেরকে আপন করে নেয়।

৫.২.২ মুসলিম শাসনামলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আচরণ

মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে এদেশে আগমন করে ক্রমান্বয়ে নিজেদের স্থান মজবুত করে নিয়েছিলেন। এদেশ ও জাতিকে ভালবেসে এখানেই স্থায়ীভাবে আবাস গড়ে তুলে এখানকার অমুসলিম অধিবাসীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তুলেছিলেন। শাসক হিসেবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি সমূহের প্রতি কোন অন্যায় অত্যাচার করেননি। ফলে জনসাধারণও তাদের শাসন মেনে নিয়েছিল। এই পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্প্রীতির জন্য মুসলিম শাসকগণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে ড. আবদুল করিম এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> "তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বনের উপর নির্ভর করে বাংলার মুসলমান সমাজ বিকাশ লাভ করেছিল। এগুলো হচ্ছে মুসলমান শাসক শ্রেনী, মুসলমান পন্ডিত ও মুসলমান সুফিবৃন্দ। ... শাসক শ্রেণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই যে, তারা রাজনৈতিক শক্তির বিস্তার ঘটিয়ে ছিল, যার ফলে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর ক্ষুদ্র লখনৌতি এলাকা এর প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় শতাব্দীর মধ্যে বাংলার

---

[৪১০] উদ্ধৃত, ড. পঞ্চানন সাহা, *হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা*, (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, জুলাই ২০১১), পৃ. ২৬-২৭

> একটি শক্তিশালী মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। শীর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া মুসলমান সমাজ জন্মের পর তার চারপাশের অসংখ্য শত্রুভাবাপন্ন অমুসলিম স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর টিকে থাকতে পারত না। বাংলায় দিল্লীর রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে মুক্ত একটি সমজাতীয় মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব শাসক শ্রেণীর, বিশেষ করে স্বাধীন সুলতানদের প্রাপ্য।”[৪১১]

এজন্যে দেখা যায় মুসলমানগণ কোন স্থান বিজয়ের পর তথাকার অভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা আগে প্রতিষ্ঠা করতেন। এরপর দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের জন্য মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং অমুসলমানদের প্রতিও অত্যন্ত উদার নীতি অবলম্বন করতেন। যেমন, বখতিয়ার খিলজী রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেছেন কিন্তু পলাতক রাজার পশ্চাদানুসরণ করে তাকে সমূলে উৎখাতের চেষ্টা করেননি। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর ‘বাংলার ইতিহাস’ গ্রন্থে বলেন, “.... কিন্তু তিনি রক্তপিপাসু ছিলেন না। নরহত্যা ও প্রজাপীড়ণ তিনি পছন্দ করতেন না। দেশে এক ধরনের জায়গীর প্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক সরকার কায়েমের দ্বারা অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও সামরিক প্রধানদের সন্তুষ্টি সাধন করতেন।”[৪১২] মুসলিম শাসনামলে বাংলায় কোন বড় ধরনের ধর্মীয় সংঘর্ষের গ্রহণযোগ্য তথ্য অপ্রতুল। এ সময় মুসলমান শাসকগণ স্বধর্মকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য দিলেও কেবল ধর্মবোধে তাড়িত হয়ে হিন্দুর মন্দির আক্রমণ বা ধ্বংস সাধন করেননি। যতক্ষন না তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি না হচ্ছে, এই শাসক শ্রেণী অন্যদের স্ব স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতাও দিয়েছেন।[৪১৩] আবার কেউ কেউ এর উল্টো চিত্রও তুলে ধরেছেন। যেমন, আবদুল খালেক বর্ণনা করেন,

> “বিজেতা বখতিয়ার খিলজি এক হাতে কোরান অন্য হাত অসি নিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিল। ধর্মীয় উন্মাদনার নেশায় মত্ত হয়ে মুসলমানরা গোড়া থেকেই হিন্দু ও বৌদ্ধদের মঠ মন্দির মূর্তি ভাঙ্গা ও ধর্মান্তকরণের অভিযান চালিয়েছিল।... বহু হিন্দুকে তারা ধর্মান্তরিত করেছিল এবং তারই উপাদান দিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা খানকা ইত্যাদি নির্মাণ করেছিল।... নিরীহ দরিদ্র লোকদের ওপর তাদের অত্যাচার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল।”[৪১৪]

তৎকালে দলে দলে হিন্দুদের স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ এবং হিন্দুদের মুসলিম শাসকদের দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা এ চিত্রের বিশ্বাস যোগ্যতার প্রতি সন্দেহের তীর বিদ্ধ করে। তাই নিরপেক্ষভাবে বলা যায়, সম্ভবত মুসলিম শাসনামলে অমুসলিমদের প্রতি উদার, সহনশীল ও মহানুভব আচরণ করা হত। যার ফলে অমুসলিম সংখ্যাগুরুদের দেশে মুসলিম শাসকগণ প্রতিপত্তির সাথে সাড়ে পাঁচশত বৎসর রাজত্ব করেছেন।

---

[৪১১] ড. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৩), পৃ. ৩০৪

[৪১২] উদ্ধৃত, আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত. পৃ. ২৫

[৪১৩] নূহ-উল-আলম লেনিন, *বাঙালী সমাজ ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ২০১৫), পৃ. ১২৩

[৪১৪] মুহাম্মদ খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

৫.২.৩ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ

তরবারীর জোড়ে নয়, মধ্যযুগে মুসলিম শাসনাধীনে বাংলায় আপামর জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনার্য ও আর্য ধর্মে অনুশাসিত এদেশের জনগণের কাছে ইসলাম নতুন বার্তা নিয়ে আসে। তা হল উদারতা, সমতা ও শান্তির বাণী। নুহ-উল-আলম লেনিন এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন,

> "ধর্মান্তকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন আরব, ইয়েমেন, মিশর, ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত সুফি সাধক, পির ও দরবেশগণ। এই সুফি, পির ও দরবেশদের সাধাসিধে জীবন যাপন, তাদের সততা, মানবিক সেবার আদর্শ, বিনয়, বদান্য প্রভৃতি চরিত্র মাহাত্ম্য ব্রহ্মাণ্যবাদের হাতে নিগ্রহের শিকার বৌদ্ধ এবং বর্ণশ্রম প্রথার কঠোর অনুশাসন ও বৈষম্যপীড়িত অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। ইসলাম ধর্মের কতকগুলো রীতিপ্রথা, সাম্য ও সুফিবাদের উদার মানবিকতা এবং বাংলার লোক সংস্কৃতির সঙ্গে তার মিথস্ক্রিয়া নিপীড়িত-নির্যাতিত- অবহেলিত এই ব্রাত্যজনকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক উৎপীড়ন এড়াতে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ইসলাম ধর্মকে স্বাগত জানান।"[৪১৫]

ব্রাহ্মণ রাজন্যগোষ্ঠীর অত্যাচারে অতিষ্ট বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায় প্রাণ ধারণের অনিবার্য তাগিদে সামাজিক পদমর্যাদা ও সম্মান লাভের আশায় ইসলামের সমতা ও উদারতার বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কারণ নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা তাদের স্বধর্মী ব্রাহ্মণ শ্রেণির হাতে চরমভাবে অবহেলিত ও বৈষম্যের স্বীকার হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে বলেছেন,

"বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণির মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ হিন্দু ভদ্রসমাজ এই শ্রেণীয়দিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।"[৪১৬]

তবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও ইসলাম গ্রহণ করত এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। যেমন হরিদাস বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলে মুলুকপতির কাছে তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তাতে স্বেচ্ছায় অনেক ব্রাহ্মণের ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ আছে। যেমন,

" হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম ॥[৪১৭]

রাষ্ট্রীয় প্রভাব ছাড়াও এয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত মুসলমান পীর দরবেশ, সুফী সাধকদের সততা ত্যাগ, উদারতা ও কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে এদেশের মানুষ বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের হিন্দু ও তান্ত্রিকরা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করে। এভাবে নানা কারণে এদেশের মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করতে থাকে।

---

[৪১৫] নুহ-উল-আলম লেনিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
[৪১৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর*, (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারী ২০১০), পৃ. ৩৮
[৪১৭] উদ্ধৃত, ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫.২.৪ সুফি মতবাদ ও বৈষ্ণব ধর্মের মেল বন্ধন

মুসলিম শাসন আমলে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে সুফি মতবাদ ও নতুন উদ্ভুত বৈষ্ণব ধর্ম। এসময় সুফি সাধকদের মধ্যে একটি দল ইসলামের মৌলিক বিষয় হতে সরে স্থানীয় আচার অনুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হন এবং ইসলামের চিন্তাধারার সাথে এগুলোকে সংযুক্ত করে মানুষের মাঝে প্রসারিত করেন। ফলে নতুন ধর্মান্তরিত নওমুসলিমগণের মধ্যে এক নতুন ইসলামের জন্ম হয়। মুহাম্মদ এনামুল হক এরূপ ইসলামের নাম দিয়েছেন লৌকিক ইসলাম। তিনি বলেন, "বাঙ্গালার এই লৌকিক ইস্লামের রূপ অতি চমৎকার ও কৌতুকাবহ। ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম স্থান পাইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্ম জায়গা করিয়া লইয়াছে এবং আর্য্য, অনার্য্য ও বৈষ্ণব-বিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে।"[৪১৮]

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠী এবং সুফি সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্মীয় বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করে। সুফী মতবাদে আত্মা হল পরমাত্মার অংশ। বৈষ্ণব মতানুসারেও জীবাত্মা পরমাত্মারই খণ্ডাংশ। পরম পুরুষ কৃষ্ণ নিজ অংশ থেকে নারী স্বরূপাকে সৃষ্টি করে যুগল হন। সুফিবাদের ফানাবিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ তত্ত্ব বৈষ্ণবীয় যুগলরূপ এবং অভেদরূপের সঙ্গে তুলনীয়। ফলে সুফি মতাদর্শে অনুপ্রাণিত মুসলমানগণ বৈষ্ণবীয় আর্দশের প্রতিও অনুরক্ত হয়ে পড়েন। শ্রী চৈতন্যদেব যখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার শুরু করেন তখন মানুষ হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি পরিচয় ভুলে নতুন ভক্তিবাদের প্রতি আসক্ত হয়ে এর দলে শামিল হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্র ছাড়া ব্যাপক। তাহাতে মানুষের মুক্তি পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল।' তিনি অন্যত্র লিখেছেন, 'দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না।'[৪১৯]

হিন্দু মুসলমান তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বেড়াজালের আবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে সমান ভাবে এই নতুন ধর্মে অংশগ্রহণ করেছিল। এই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও প্রসারে হিন্দু ও মুসলমানদের সমভাবে অংশগ্রহণ মধ্যযুগের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই বৈষ্ণব আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে হরিদাস নামক এক মুসলমান। যার জন্ম শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মের ৩৬ বছর পূর্বে। সে ১৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তখনকার দিনে একজন মুসলমান ব্যক্তির বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ এবং একজন ব্রাহ্মণ ব্যক্তির জন্য মুসলমান ব্যক্তিকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করা ছিল স্রোতের প্রতিকূলে পথ চলা। তারা উভয়েই বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য স্ব স্ব ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হন। তাদেরকে সমাজ থেকে বহিস্কৃত করার হুমকি দেয়া হয়েছিল এ অবস্থায় হরিদাস ভীত হলে তার গুরু অদ্বৈত তাকে

---

[৪১৮] মুহাম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে লৌকিক ইসলাম'-এর উদ্ভব, রায়হান রাইন, *বাংলার ধর্ম ও দর্শন*, (ঢাকা: সংবেদ প্রকাশনা ২০, ফেব্রুয়ারী ২০০৯), পৃ. ১৫৯

[৪১৯] উদ্ধৃত, ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

যে অভয় দিয়েছিলেন তাতে মুসলমানের প্রতি তার সদয় মনোভাবের পরিচয় মেলে। তিনি বলেছিলেন,

"আচার্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়।।
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন।।"[৪২০]

ড. পঞ্চানন সাহা সে সময় হরিদাস মুসলমান সম্প্রদায়কে যে কথা বলেছিল তার উল্লেখ করেন,

"শুন বাপ, সভারই একই ঈশ্বর ॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখন্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়॥"[৪২১]

হরিদাসের এই উক্তি তৎকালে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বজনীন উদার অসাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ বহন করে। আর এই অসাম্প্রদায়িকতা গড়ে ওঠার পেঁছনে বৈষ্ণব ধর্ম ও সুফিবাদের সমন্বয় ও মেলবন্ধন চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

৫.২.৫ নওমুসলিমদের মধ্যে পূর্ববর্তী ধর্মীয় রীতিনীতির অক্ষুণ্নতা

মধ্যযুগে সুফি সাধকদের ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে অসংখ্য নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ মুসলমান হয়েছিল। এছাড়া আর্থ সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যেও ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এসব নওমুসলিমগণের পক্ষে ইসলামের মৌলিক উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মর্মার্থ অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। এজন্যে একজন মুসলিম হিসেবে তাদের সঠিক কর্ম কোনটি তারা কিভাবে আল্লাহর উপাসনা করবে এর সঠিক দিক নির্দেশনা না পাওয়ায় তারা তাদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় রীতিনীতির আলোকে ইবাদাতে ব্যাপৃত হল। আবার দেখা যায় কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেও পূর্ববর্তী রীতিনীতির প্রতি তাদের আকর্ষণ থেকেই যায়। ফলে এ সমস্ত মানুষ ইসলামের নামে মূলত তাদের পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের আচার অনুষ্ঠানই পালন করতে থাকে। কখনো কখনো এ গুলোর নতুন নাম দিয়ে ইসলামীকরণ করার প্রচেষ্টা চলে। তারা তাদের বোধ-বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠানের সাথে সাথে হিন্দুদের লৌকিক দেবদেবীর প্রতিরূপেরও আবির্ভাব হয়। যেমন, বাঘের দেবতা দক্ষিণের রায় খাঁ গাজি বা গাজি পীর, কুমিরের দেবতা কালু রায় কালু শাহ, মাছের দেবতা মৎস্যেন্দ্রনাথ

[৪২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
[৪২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

পির মসন্দলি রূপে নওমুসলিমদের কাছে স্থান করে নেয়। এছাড়া বনের দেবতা বনদেবী রূপ লাভ করে বনবিবি নামে। মারাত্মক কলেরা বসন্তের দেবী ওলাকে মুসলমানরাও ভীত হয়ে ওলাবিবি নামে মান্য করতে থাকে। এছাড়া এসময় হিন্দুদের অনেক দেবতা ও সন্ন্যাসী মুসলমানদের কাছে মুসলমান নামে আবির্ভূত হয়। যেমন, সত্যনারায়ন এর উৎপত্তি সম্পর্কে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন,

> "চৈতন্যধর্ম প্রবর্তিত হইবার পর হইতে সমাজে শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়নের উপাসনা একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিল। মুসলমান ধর্মের বলিষ্ঠ একেশ্বরবাদ যখন এদেশে প্রসার লাভ করিতেছিল, তখন চৈতন্যধর্ম শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়নকে অবলম্বন করিয়া এদেশের মধ্যে এক সুস্পষ্ট একেশ্বরবাদ গড়িয়া তুলিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের উপরও তাহার প্রভাব স্বভাবতই বিস্তৃতি লাভ করিল। এই যুগে সত্যপির সত্যনারায়নরূপে হিন্দুর গৃহে পূজা লাভ করিতে লাগিলেন। ইহার বিজাতীয় সকল উপকরণ নারায়ণের নামে শোষিত হইয়া হিন্দুর দেব মন্দির নিঃস্বঙ্কোচ প্রবেশাধিকার লাভ করিল।"[৪২২]

এই সত্য নারায়ণ দুই নামে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে উপাস্যরূপ লাভ করে ধর্মীয় সম্প্রীতি সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে বলা হয়,

"হিন্দুর দেবতা তিনি
মুসলমানের পীর।
দুই কুলে সেবা লয়
হইয়া জাহির॥"

আরো বলা হয়,

"মক্কার রহিম আমি
অযোধ্যায় রাম
কলিতে সম্প্রতি
আমি সত্যনারায়ণ।"[৪২৩]

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সমাজে প্রচলিত এই পাঁচালীর কথাগুলো নতুনভাবে ব্যক্ত করেছেন যেখানে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বাণী উচ্চারিত হয়েছে। তিনি লিখেছেনঃ

"গুলগুল আর গুলাবের বাস
মিলাও ধূপের ধূমে!
সত্য-পীরের প্রচারে প্রথমে।
মোদেরি বঙ্গভূমে।

---

[৪২২] ড.পঞ্চানন সাহা উদ্বৃত, আশুতোষ ভট্টাচার্য: *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৬৪ খ্রী. , পৃ. ৩১
[৪২৩] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

পূর্ণিমা রাতি! পূর্ণ করিয়া
দাওগো হৃদয় প্রাণ।
সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে
হিন্দু মুসলমান!
পীর পুরাতন, নূরনারায়ন,
সত্য সে সনাতন;
হিন্দু-মুসলমানের মিলনে
তিনি প্রসন্ন হন্! [৪২৪]

সত্যপীরের মত মুসলমান সমাজে খাজা খিজির, বদরপীর, মানিক পীর ও পাঁচ পীরের উপাসনাও চলে। এসময় হিন্দুরা যেমন পীরের আস্তানায় মানত করতেন ও মসজিদে শিরনি দিতেন, তদ্রূপ মুসলমানরাও বিভিন্ন সময় হিন্দু দেব দেবীদের স্মরণ করতেন। এইভাবে নওমুসলিমদের কাছে পূর্ববর্তী ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো ইসলামের সাথে মিশ্রিত হয়ে অক্ষুণ্ন হল। ফলে ধর্মীয় ব্যাপারে সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সংঘাত ও বিরোধিতার পরিবর্তে সম্প্রীতি ও মৈত্রীভাব জোড়াল হল।

৫.২.৬ মুসলিম অভিজাত শ্রেণির মধ্যে হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ

সমাজের আমজনতার মধ্যে ধর্মীয় মৈত্রীতার সাথে সাথে মধ্যযুগে সমাজের উচ্চস্তরে শাসকশ্রেণির মধ্যেও হিন্দু আচার অনুষ্ঠানসমূহ সাদরে গৃহীত হতে থাকে। এমনকি মোগল শাসকদের মধ্যেও ইসলাম বহির্ভূত রীতি নীতি, চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সম্রাট আকবর সকল সম্প্রদায়ের ধর্মসমূহের মধ্যে সম্প্রীতি ও সমন্বয় সাধনের জন্য ' দ্বীনে ইলাহি' নামে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। এছাড়া তার ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্ম সমন্বয়ের বিকাশ দেখা যায় হিন্দু ও রাজপুত স্ত্রী গ্রহণের মাধ্যমে। তার প্রাসাদে ইসলাম পালনের পাশাপাশি পূজা অর্চনাও দেখা যেত। বাংলার নবাব পরিবারেও হিন্দু আচার অনুষ্ঠান অতি সহজেই প্রবেশ করেছিল। মতিঝিল প্রাসাদে শাহমত জঙ্গ ও সউলত জঙ্গ এবং মনসুরাবাদ প্রাসাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সানন্দে হোলি উৎসব পালন করেছিলেন।[৪২৫]

৫.২.৬ রাষ্ট্রীয় কাজে হিন্দুদের ব্যাপক অংশগ্রহণ

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনকর্তাদের রাজ দরবারে এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদসমূহে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অংশগ্রহণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রমাণ বহন করে। এ সময় মুসলিম শাসকগণ সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও সংখ্যাগুরু অমুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পান

[৪২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬
[৪২৫] নুহ-উল-আলম লেনিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

নিজেদের উদার মনোভাবের কারণে। তারা বাংলায় সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করতে সক্ষম হন। বাংলার স্বাধীন শাসকবৃন্দ অমুসলিমদের প্রতি সহনশীল নীতি গ্রহণ করে তাদেরকে মন্ত্রীত্ব ও সেনাধ্যক্ষসহ বহু উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দেন। সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু সেনাপতি সর্বপ্রথম নিয়োগ দেন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ। এরপর তার উত্তরসূরী আজম শাহ গনেশ নামে একজন হিন্দু জমিদারকে উচ্চপদে সম্ভবত সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা দিয়ে উজির হিসেবে নিয়োগ দেন।[৪২৬]

পরবর্তী ইলিয়াসশাহী শাসনামলের বিখ্যাত শাসক রুকনউদ্দীন বারবাক শাহও ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং উদার প্রকৃতির লোক। তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে সমাদর করে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দিতেন। এছাড়া পরবর্তী শাসক আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ছিলেন ধর্মীয় সংকীর্ণতা বর্জিত মহৎ ব্যক্তি। তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি উদার নীতি পোষণ করতেন। তাঁর রাজদরবারের উচ্চপদেও অনেক হিন্দুকে সমাসীন দেখা যায়। যেমনঃ রূপ ও সনাতন নামে দুই ভাই যাদের উপাধি যথাক্রমে দবীর খাস এবং সাকের মল্লিক তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। রূপ ও সনাতনের অপর দুই ভাই রঘুনন্দন এবং বল্লভ ও ভগ্নিপতি শ্রীকান্তও রাজ সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া হোসেন শাহের রাজত্বকলে বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসে বিপ্লব সৃষ্টিকারী বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন শ্রী চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্যদেব বিনা বাঁধায় তাঁর ভক্তিধর্ম প্রচার করতে সক্ষম হন। এমনকি চৈতন্যচরিত গ্রন্থসমূহে চৈতন্যদেবের প্রতি হোসেন শাহের শ্রদ্ধা পোষণের আভাস পাওয়া যায়।[৪২৭] এছাড়া হোসেন শাহের আমলে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে হিন্দুদের নিয়োগ প্রসঙ্গে ড. আবদুল করিম উল্লেখ করেন,

> “তাঁর প্রধান দেহরক্ষী ছিলেন কেশব ছত্রী, সুবুদ্ধি রায় ছিলেন গৌড়ের কোতওয়াল এবং তার চিকিৎসক ছিলেন মুকুন্দ দাশ। এছাড়া রামচন্দ্র খান, চিরঞ্জীব সেন, যশোরাজ খান, দামোদর, কবি রঞ্জন, হিরণ্য দাশ, গোবর্ধন দাশ এবং গোপাল চক্রবর্তী ছিলেন রাষ্ট্রের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। যশোরাজ খান এবং কবি রঞ্জন ছিলেন কবি এবং তাঁরা হুসেন শাহের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। ... হুসেন শাহ নিজেই শুধু সহনশীল ছিলেন না, তাঁর কর্মচারীরাও সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। চট্টগ্রামস্থ তাঁর কর্মচারী পরাগল খান মহাভারতের অনুবাদক কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান (নুসরত খান) মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা কবি শ্রীকরন্দীর পৃষ্ঠপোষণ করেছিলেন।”[৪২৮]

মোগল আমলেও বাংলায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। বিশেষ করে মুর্শিদ কুলীখান, নবাব আলী বর্দী খান ও সিরাজদ্দৌলার

---

[৪২৬] ড. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

[৪২৭] কে. এম. রাইছ উদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, এপ্রিল ২০০৯), পৃ. ৩৮৪-৩৮৫

[৪২৮] ড. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

নাম উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদ কুলী খান ইজারাদার বা জমিদার, খাজনা আদায়কারী, ভূমি জরিপ প্রভৃতি কাজে হিন্দুদেরই প্রধানত নিয়োগ দিতেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণসিংহ লিখেছেন, সে সময় দশ ভাগের নয় ভাগ জমিদারী ছিল হিন্দুদের হাতে। ফার্মিঙ্গারের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদশের বৃহত্তর পনেরোটি জমিদারীর মধ্যে মাত্র দুটি আর একুশটি ছোট জমিদারীর মধ্যে মাত্র দুটি ছিল মুসলমানদের আয়ত্বে। তাছাড়া প্রধান প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য ও মহাজনী কারবারও হিন্দুদের করতলে ছিল।[৪২৯] এ সম্পর্কে Dacca History of Bangla (p-410) এ বলা হয়েছে,

> ÒUnder Murshid Quli Khan and the succeeding Nawabs, Bengali Hindus, by the force of their talents and mastery of Persian, came to occupy the highest civil posts under the subahdar and many of the military posts also under the Faujdars. There had been Bengali Hindu Diwans and quanangoes, well versed in the persian language and in Muslim etiqutte, as early as the days of Hussain Shah (c-1519). Under Murshid Quli such men grew prosprous enough to found new Zammendari hauses. Such ennabled civil servants came from the Brahman, Vaidyas, Kayastha and even the confectioner castes- whose projeny are called Rajas. Under the latter Nawabs, more than one Bengali Hindus held the rank of Rayi-Rayans with the funclians of the chancellor of Exchequer.”[৪৩০]

নবাব আলীবর্দী খানের সময় দেওয়ান, অ-দেওয়ান, সাব-দেওয়ান, বক্সী প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই হিন্দুরা অলংকৃত করেছিল। আবার ১৯জন জমিদারের মধ্যে ১৮ জনই ছিল হিন্দু।[৪৩১] মুসলিম শাসনামলে হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অবস্থানের এই চিত্র তাদের প্রতি নিগ্রহ নয়, বরং উদারতার কথা বলে।

৫.২.৭ সম্প্রীতির বন্ধনে হিন্দু মুসলমান

মুসলমানদের বহুপূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধরা এ দেশে এসে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছে। পরবর্তীতে মুসলমানরা আগমণ করে এদেশকে আপন করে নেয়। এভাবে সুদীর্ঘ কাল হতে হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতি পাশাপাশি সমাজে সহাবস্থান করার ফলে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়, তারা

[৪২৯] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
[৪৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
[৪৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

পরস্পর পরস্পরের কাছে আসে, একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করে এবং একে অপরের আচার-আচরণ, বৈশিষ্ট্য, জীবন পদ্ধতি অবহিত হয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসার মনোভাব পোষণ করে। তাই দেখা যায় মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু ও মুসলিম শাসক বা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যেমন সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান ছিল, তদ্রূপ আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। ড. আবদুল করিম এ সম্পর্কে গবেষণায় উল্লেখ করেছেন,

> "মুসলমানরা স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্পর্শে এসেছিল। মুসলমান শাসকরা শুধু এদেশ জয়ই করেননি, তাঁরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় এবং এ অঞ্চলে তাঁদের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। থানার মতো তাদের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে হোক বা শান্তিপ্রিয় লোকদের বসতিতেই হোক, তাঁরা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি। তাদের দৈনন্দিন জীবনে, হাটে- বাজারে এবং অন্যান্য হাজারো কাজেও তারা অমুসলমানদের সংস্পর্শে এসেছিল। সমাজ জীবনেও এক সম্প্রদায়ের ওপর অন্য সম্প্রদায়ের প্রভাব ও পাল্টা-প্রভাব পড়েছিল। সরকারি চাকুরিতে স্থানীয়দের নিয়োগ করা হতো এবং সেখানেও যোগাযোগ ঘটত। একই দেশে বাস করলে এ ধরনের যোগাযোগ ঘটা ছিল সর্বদাই নিশ্চিত।"[৪৩২]

তাঁর গবেষণায় অন্য এক স্থানে তিনি উল্লেখ করেন যে বাংলার মুসলমানরা শুধু তাদের সমাজের মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং তারা অমুসলমানদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং তাদের সমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন। মুসলমানগণ মাঝে মাঝে অমুসলমান ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। মুসলমান সমাজের উন্নয়নে শাসকবৃন্দ সহযোগিতা করলেও শুধু ধর্মীয় বিভিন্নতার কারণে তাঁরা যে কাউকে উৎপীড়ন করেননি, এজন্য সে সময়কার উদার মুসলমান প্রশাসন কৃতিত্বের দাবি রাখে।[৪৩৩]

শাসকদের কাছে তারা মুসলিম শাসকগণ মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি এতটাই ন্যায়পরায়ন ও উদার ছিলেন যে, হিন্দুরা কখনো কখনো তাদের স্বধর্মীদের অত্যাচরের বিরুদ্ধেও তাদের কাছে নালিশ করে এর প্রতিকার চাইতো। এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল শ্রী চৈতণ্য দেবের বিরুদ্ধে। নদীয়ার কাজীর কাছে বৈষ্ণব বিরোধী হিন্দুরা এসে অভিযোগ জানিয়েছিল যে তিনি হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। তিনি যে পদ্ধতিতে করতালি ও ঢাকঢোলের মাধ্যমে কীর্তন করেন তা হিন্দু সমাজের কাছে অসহনীয়। তাই তারা কাজীর কাছে কীর্তন বন্ধ করার অনুরোধ জানান। কাজীর কাছে তাদের এ আবেদন বৃথা যায়নি। তিনি কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।[৪৩৪]

---

[৪৩২] ড. আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১
[৪৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮
[৪৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

মুসলিম শাসনামলে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক তাদের পরস্পরের ধর্মীয় জীবনকেও প্রভাবিত করে। যেমন ব্রাহ্মণরা মুসলমানদের অনুকরণে দাড়ি রাখত, মোজা পরত, ছড়ি ব্যবহার করত, বন্দুক চালাত এবং পারস্যদেশীয় বিখ্যাত সুফি কবি মাওলানা জালালউদ্দীন রুমীর রচিত মসনবী আবৃত্তি করত। আবার মুসলমানগণ হিন্দুদের পূজা উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করত। লক্ষ্মীপূজার দিন নদীয়া জেলার হিন্দু-মুসলমান ছেলেরা লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছড়া কেটে নাড়ু মোয়া সংগ্রহ করত। ছড়াটি হল,

"আইজ তোমাদের নক্কী পূইজো।
দাওগো দুইটি ভাজা-ভূইজো
হরিবোল গাইতে গাইতে গলা হল ভারি
মুসলমান আল্লা বলে হিন্দু বলে হরি।"[৪৩৫]

এভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় প্রভাবে মুসলমানরাও এসব পৌত্তলিকতাকে নিজেদের ধর্মীয় রীতি প্রথার সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলে। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির আরেকটি উদাহরণ হল মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের খানকাহসমূহ। এগুলো হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, উঁচু, নীচু, ধনী, দরিদ্র, নি:স্ব সকল শ্রেণির মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ধর্মপ্রচারকদের ভক্তদের মাঝে মুসলমানদের সাথে অসংখ্য হিন্দুও আসতো। এ খানকাহগুলোতে দর্শনার্থীদের জন্য সরবরাহকৃত খাবার জাত পাতের ভেদাভেদ ভুলে সকলে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করত। ড. আবদুল করিম শাহজালাল (রহ.) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি সিলেটের পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই ইব্‌ন বতুতা তাঁর জন্য উপহার আনতে দেখেছিলেন এবং তাঁর অনুসারীরা প্রধানত সে সব দিয়েই জীবন ধারণ করতেন।[৪৩৬]

বস্তুত সে সময় হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতা বিরাজমান ছিল। উভয় শ্রেণির সাধকদের উক্তিতে তাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ক্ষিতি মোহন সেন সাধক দাদুর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, 'ভগবানের রাজ্যে হিন্দুর দেবালয় আর মুসলমানের মসজিদও নেই। যেখানে তিনি বিরাজিত সেখানে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। আর একজন সাধক দীন দরবেশ যা বলেছেন তাতেও পরধর্ম মত সহিষ্ণুতা দেখা যায়। তিনি বলেছিলেন,

"হিন্দু কহেঁ সো হম বড়ে
মুসলমান কহেঁ হম!
এক মূঁগ দো কাড় হৈঁ
কুন জাদা কুণ কম।।"

---

৪৩৫ ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৪৩৬ আবদুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

অর্থাৎ হিন্দু কহেন আমি বড়ো মুসলমান কহেন আমি শ্রেষ্ঠ। ওরে মূর্খ সে একই। একই দ্বিদলের তোরা বিদীর্ণ দুটি দল: তবে কে বড়ো আর কে ছোট?"[৪৩৭]

মধ্যযুগে হিন্দু মুসলমানের এই সম্প্রীতি ও মৈত্রী ভাব গড়ে ওঠার কারণ হল উভয় সম্প্রদায় তাদের পারস্পরিক নৈতিক আদর্শসমূহ সম্পর্কে অবহিত ছিল। একে অন্যেকে সহযোগিতাও করত। ড. পঞ্চানন সাহা বলেন,

"কোরানের প্রথম সুরা (অধ্যায়) বা 'ফাতিহার' অনুচ্ছেদে দেখা যায় যে ঈশ্বর সম্পর্কে ভারতীয় ও ইসলামীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলগত কোন পার্থক্যই নেই। কোরানের প্রথম সংস্কৃত অনুবাদ করেছিলেন জসিমুদ্দীন খান। কোরানের আবার বাংলা অনুবাদ প্রথমে করেছিলেন নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্য ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।"[৪৩৮]

এভাবে মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একতা, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল।

৫.৩ ব্রিটিশ শাসনামলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

এদেশে মুসলিম শাসনের অবসানের পর ক্ষমতার পালাবদলের মাধ্যমে আন্ত-ধর্মীয় সম্পর্কেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। মুসলিম জাতি শাসক শ্রেণী থেকে হিন্দুদের সাথে সাধারণ জনগণের কাতারে শামিল হয়। এ সময় হিন্দু ও মুসলমান জাতির মধ্যে দূরত্ব তৈরী হয়। সম্প্রীতির স্থান দখল করে নেয় হিংসা-বিদ্বেষ। কখনো তা আবার সহিংসতার রূপ পরিগ্রহ করে। যার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইন্ধন যোগায় ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থ।

৫.৩.১ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দূরত্ব সৃষ্টি

পলাশীর আম্রকাননে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমেই বাংলার মাটিতে ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে। মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া ইংরেজ শাসকগণ তাদের শাসনের গোঁড়া হতেই মুসলিম জনগণের সাথে বিমাতাসূলভ আচরণ করতে থাকে। আর হিন্দু সম্প্রদায়কে কাছে টেনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে মুসলমান জাতিকে তাদের প্রতিদ্বন্দী রূপে দাঁড় করায়। ফলে পারস্পরিক স্বার্থ আবহমান কাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করা সম্প্রদায় দুটির সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় মুসলিম শাসনামলে এদেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে যে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মৈত্রী চেতনা বিদ্যমান ছিল তাতে ফাটল ধরে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখনিতে এ অবস্থাটি পূর্ণাঙ্গরূপে ফুটে উঠে। তিনি বলেন,

---

[৪৩৭] উদ্ধৃত ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

[৪৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

"এদেশে ধর্মবিশ্বাস প্রাচীন ব্যাপার; হিন্দু মুসলমান এখানে যুগ যুগ ধরে প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করেছে। তারা একই আকাশের রোদ-বৃষ্টি-জ্যোৎস্না ভোগ-উপভোগ করেছে, চাষ করেছে মিলেমিশে, একই বাজার হাটে কেনাবেচা করতে তাদের অসুবিধা হয়নি। শোকে দুঃখে পরস্পরকে সাহায্য করেছে, পরস্পরের উৎসবে এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও অনায়াসে যোগ দিয়েছে, মন্দিরের ঘন্টা মিশে গেছে আজানের ধ্বনির সাথে, কোনো গোলযোগ বাঁধেনি। কিন্তু বিপদ ঘটলো তখনই যখন ধর্ম চলে এলো রাজনীতিতে অর্থাৎ যুক্ত হয়ে গেল ক্ষমতার জন্য রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দিতা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদির সঙ্গে। যে লড়াইটা হবার কথা ছিল বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ইংরেজদের, সে লড়াইয়ের ভেতরে প্রবেশ করলো ভ্রাতৃঘাতি হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ।"[৪৩৯]

এ সময় ইংরেজরাও এদেশবাসীকে বিভক্ত করে তাদের শক্তি খর্ব করার মাধমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় অবিরত থাকল। অনেক ইংরেজ গ্রন্থকার কখনো ইঙ্গিতক্রমে, কখনো স্পষ্টাকারে হিন্দু মানসে মুসলমানদের প্রতি একটি গুঢ় বিদ্বেষ বীজ বপন করতে থাকে।[৪৪০]

এছাড়া সামাজিকভাবেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মনে মুসলমানদের সম্বন্ধে অনীহা ও বীতস্পৃহ বোধ জন্মলাভ করে। তারা সামাজিক লেনদেনসমূহে মুসলমানদেরকে অচ্ছুত ও অস্পৃশ্য ভাবতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ অবস্থাটি উল্লেখ করেন একটি ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে। তিনি বলেন, "আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাঁধা আর কিছু নেই।"[৪৪১]এভাবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে তা সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হল।

৫.৩.২ হিন্দু সমাজের জাগরণ: সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তর

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইংরেজদের শিক্ষা সংস্কৃতি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। এদেশের মানুষ নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নতুন শাসক জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্বকরণের চেষ্টায় ব্যাপকভাবে নিমগ্ন হয়। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং ১৮৩০ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক জাগরণের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু এ জাগরণ ছিল শুধুমাত্র হিন্দু জনগোষ্ঠীর জাগরণ। উনিশ শতকের এ জাগরণে মুসলিম সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনার জগতে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি। ফলে হিন্দু সমাজের এই জাগরণ পরোক্ষভাবে আস্তে আস্তে

[৪৩৯] ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি*, (ঢাকা: সংহতি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০১৫), পৃ. ৩৪

[৪৪০] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

[৪৪১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

সাম্প্রদায়িকতার দিকে ধাবিত হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের মধ্যেই তা অন্তর্নিহিত ছিল। এ সম্বন্ধে গোলাম মুরশিদ বলেন,

> "গোড়াতে সরকার হিন্দু কলেজের জন্যে কোনো টাকা পয়সা ব্যয় করেনি। ওদিকে, যে উচ্চবর্ণের এবং উচ্চবিত্তের হিন্দুরা এই কলেজ স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, বৃহত্তর সমাজের অন্য লোকেরা অর্থাৎ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অথবা মুসলমানরা লেখাপড়ায় এগিয়ে আসবেন না। এবং এগিয়ে এলেও তাঁদের সঙ্গে একই ঘরে বসে লেখাপড়া শেখা জাতের বিচারে সঙ্গত হবে না। সুতরাং প্রথম থেকেই হিন্দু কলেজে প্রবেশের অধিকার কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্যেই সংরক্ষিত ছিলো।"[৪৪২]

এই ধর্মীয় ও সামাজিক বিভেদ সত্ত্বেও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম তিন দশকে কয়েক হাজার ইংরেজী শিক্ষিত তরুণ বেরিয়ে আসে। ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত এসব তরুণদের মাধ্যমেই জাগ্রত হয় ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা। তবে এ জাগরণ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শুধুমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই আবর্তিত ছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এ জাগরণ আলোড়ন তুলতে পারেনি। ফলে তারা বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী ইংরেজী শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে পশ্চাৎমুখী ও অনগ্রসর জনসমাজে পরিণত হয়। আর ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের মাধ্যমে সমাজে একটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল মুক্ত হয়ে সংস্কারপন্থী হয়ে যায়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তাদের পোশাক আশাক, খাদ্যাভ্যাস, বক্তব্য ও জীবনযাত্রা দিয়ে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার ওপর প্রবল আক্রমণ করে সে সময় সমাজের মূল্যবোধকে আন্দোলিত করে। ১৮৩১ সালের ১৪মে তারিখের সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত এক চিঠিতে গুরুজনদের এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতি তরুণদের তাচ্ছিল্যভাব ফুটে উঠে। একই বছর প্রকাশিত চন্দ্রিকার আরেক চিঠিতে হিন্দু কলেজের এক ছাত্রের অভিভাবক দাবী করেন যে, তার পুত্র দেবীমূর্তী দেখে প্রণাম না করে তাকে কেবল 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' বলে সম্ভাষণ করেছিল। ১৮৭৮ সালের প্রভাকরে প্রকাশিত একটি লেখায় ঢালাওভাবে দাবী করা হয়েছে যে, তরুণরা গুরুজনদের অমান্য করে স্বধর্মে পদাঘাত করে এবং তারা যা হয়, তাকে হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান এর কোনটাই বলা যায় না।[৪৪৩]

শিক্ষিত তরুণদের অন্য একটি শ্রেণী রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের নেতৃত্ব হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় রীতি নীতি সংস্কারের চেষ্টায় রত হয়ে পড়েন। যেমন সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ, হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন; নারী শিক্ষার প্রবর্তন। তারা বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের মধ্যে যে কুসংস্কার বিরোধী আর যুক্তিবাদী মনোভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস চালাচ্ছিলেন তা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। যার ফলাফল হিসেবে হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তারা দেশকে প্রাচীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে।

---

[৪৪২] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

[৪৪৩] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে। তাদের কাছে আদর্শ পুরুষ ছিলেন শিবাজী, রানা প্রতাপ। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী , অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। ড. পঞ্চানন সাহা তাঁর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক: নতুন ভাবনা শীর্ষক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। হিন্দুদের এ জাগরণ পরবর্তীতে আস্তে আস্তে সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হয়। গোলাম মুরশিদ এর বর্ণনা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

"...কিন্তু নতুন যুগের শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকে প্রথমবারের মতো তাঁদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম এবং স্বজাত্যবোধ দেখা দেয়। এর অল্প পরেই ১৮৫১ সালে গঠিত হয় ভারতবর্ষের প্রথম আধা-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। তার সভাপতি হন রাধাকান্ত দেব, আর সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অর্থাৎ আর্থিক স্বার্থ রক্ষা এবং স্বাজাত্যবোধের নামে সহযোগিতা শুরু হয়েছিলো সমাজের রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল অংশের মধ্যে। ১৮৬০ এর দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্বুদ্ধ হন একটা স্বাজাত্যবোধ দিয়ে। তাঁরা ঠিক রাজনৈতিক আন্দোলন করেননি, কিন্তু ভারতের অতীত গৌরব নিয়ে গর্ব করতে আরম্ভ করেন। সেই সঙ্গে ইংরেজ বিরোধী একটা মনোভাবও তাঁদের মধ্যে দেখা দেয়। তার চেয়েও বেশি করে দেখা দেয় মুসলমান বিরোধী মনোভাব। এই পরিবেশে ১৮৬০ এর দশকে রাজনারায়ন বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র প্রমুখের উদ্যোগে গঠিত হয় জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা আর হিন্দু মেলা। পরের দশকে সঞ্জীবনী সভা। এসব প্রতিষ্ঠানের চেহারা ছিলো অনেকটাই সাম্প্রদায়িক।" [৪৪৪]

নবগোপাল মিত্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে বলেন,

"Hindu nationality ... is not confined to Bengal. It embraces all of Hindu name and Hindu faith throughout the length and breadth of Hindustan; neither geographical position nor the language is counted as a disability. The Hindus are destined to be a religious Nations." [৪৪৫]

জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায় এ সময় প্রাচীন গৌরবে গর্ববোধ করে সাহিত্য রচনা করতে থাকে। এসব সাহিত্যে তারা এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পূর্ববর্তী মুসলিম শাসনের প্রতি বিষোদগার ছড়াতে থাকেন। যা হিন্দু জাতির মনে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেয়। ঐতিহাসিক রামগোপাল হিন্দু পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এ ধরনের মুসলমান বিদ্বেষের বিষময় পরিণাম সম্বন্ধে লিখেছেন, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গের সংবাদ পত্র সমূহে এবং বিশিষ্ট হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে মুসলমান শাসনের প্রতি তীব্র নিন্দা বর্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহ ব্যঞ্জক একরকম সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। দেশ যে সমস্ত সমস্যার দ্বারা পীড়িত ছিল তার প্রায় সবগুলির জন্য মুসলিম শাসনকে দায়ী করা হয়।

[৪৪৪] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[৪৪৫] ড. পঞ্চানন সাহা উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

হিন্দুরা নতুন ব্যবস্থার দ্বারা সর্বাধিক লাভান্বিত হন। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মনে হিন্দুদের সম্বন্ধে একটা অনীহার ভাব সৃষ্টি হয় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরাও মুসলমানদের সম্বন্ধে বীতস্পৃহবোধ করেন ....।"[৪৪৬]

১৯০৩ সালে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় অমর দত্ত 'দি মুসলমান ও স্বদেশী আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "বঙ্গভাষায় ইংরেজী আমল হইতে হিন্দুগণ যে প্রকার অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়নের হস্ত বিস্তার এবং ঘোর অবজ্ঞেয় গ্লানি, কুৎসা ও কলঙ্কজনক অলীক অশ্লীল ভাষিণী হলাহল নিসন্দিনী রসনা এবং লেখনীর পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে দুঃখ সন্তপ্ত নিরীহ মুসলমানগণের কোমল প্রাণ বিদ্বেষের বিষদিশ দীপ্ত ত্রিশূলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। .... কবি ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেম ও নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের শিষ্যানুশিষ্য হারাণ, নারান, মধু, যদু, চুনীরাম, পুঁটিরাম, পাঁচুরাম পর্যন্ত সকলেই মুসলমান জাতিকে পৈশাচিক গালাগালি দিতে এবং তাঁহাদের গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণকে কুৎসিৎ চিত্রে অঙ্কিত করিতে কিছুমাত্র কসুর করিতেছেন না।"[৪৪৭]

উনিশ শতকে ইংরেজী জানা উদারপন্থী নবগঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সমাজে যে জাগরণ ঘটেছিল তার নেতিবাচক প্রভাবে সাম্প্রদায়িকতা জন্ম নিল। হিন্দু সমাজের উদারতা, মানবতা ও সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে পরিণত হল। হিন্দু প্রীতি ক্রমে সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হল। ফলে ধর্মের বিপক্ষে যুক্তি তর্কের বদলে এল সনাতন ভক্তি, সংস্কারের বদলে কুসংস্কার, উদারতার বদলে সংকীর্ণতা, মানবতার বদলে সাম্প্রদায়িকতা।[৪৪৮]

৫.৩.৩ উনিশ শতকে মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলন

হিন্দু সমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রসর তখন মুসলিমগণ ইংরেজী শিক্ষায় নিরুৎসাহী। কিন্তু উনিশ শতকের এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ না করলেও মুসলমানগণ মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। এ সময় বাংলাদেশে আরবী ফার্সীতে পারদর্শী অনেক আলেম ওলামা বিদ্যমান ছিলেন। পরাধীনতা, ধর্মহীনতা, সামাজের নিম্নস্তরের মানুষের ওপর ইংরেজদের জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে এদেশের আলেম সমাজ রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেন। এসময় হতেই ঔপনিবেশিক শাসনের কবল হতে মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের অংশগ্রহণ, হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলন, সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী এবং মীর নিসার আলী তিতুমীর এবং তাদের আন্দোলনগুলোর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত ঘটনা প্রবাহে কখনো হিন্দু মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

---

[৪৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

[৪৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

[৪৪৮] নুহ-উল-আলম লেনিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করেছে। আবার কোন কোন ঘটনাতে সংঘাতও তৈরী হয়েছে। আবার কখনো কোন বিষয়কে সাম্প্রদায়িকতার দিকে টানার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর থেকে হাজী শরীয়তউল্লাহর (১৭৮১-১৮৪০)ফরায়েজী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। আর মীর নিসার আলী খান তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩৩) চব্বিশ পরগণার হায়দারপুর থেকে তার ওয়াহাবী আদর্শ সম্প্রচারের সূচনা করেন। এ দুটি আন্দোলনের জন্ম মূলত বাংলার মুসলমানদেরকে ইসলামের মৌলিক উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের দিকে ধাবিত করা। এ দুই নেতা মক্কায় গিয়ে অনুধাবন করেন তাঁদের দেশের মুসলমানগণ ইসলামের নামে যে ধর্মীয় রীতি নীতি পালন করছে তা সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। তাই দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় শুদ্ধির চিন্তাধারা থেকে তারা শিরক ও বিদ'আত মুক্ত হয়ে ইসলামের মূলনীতির দিকে তাদেরকে আহবান করেন। তারা যে সময় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন দেশের খেঁটে খাওয়া মানুষের জন্য সে সময়টা ছিল এক ক্রান্তিকাল। জমিদার শ্রেণী এবং ইংরেজ সরকারদের দ্বারা তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে চরম নিগ্রহের শিকার। বিলেতী বস্ত্রের বাজার সৃষ্টির জন্য এদেশীয় তাঁতীদের নির্মুল করার উদ্যোগ গ্রহণ করল শাসক শ্রেণী। ১৭৬৬ সালে প্রতিমণ লবণের উপর দু'টাকা হারে কর ধার্য করে লবণ ব্যবসা ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকারে দেয়া হল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনেও মুসলমানদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হল। কোন কোন এলাকায় গরু কুরবানী এবং আজান দেয়া নিষিদ্ধ হলো। হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান প্রজাদের দাঁড়ি ও আরবী নামের উপরে খাজনা আরোপ করলো। তাদের পূজা পার্বণে মুসলমানদেরকে চাঁদা দিতে ও পূঁজার যোগান দিতে বাধ্য করা হল। এমতাবস্থায় শোষিত-বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত মুসলমান জাতি হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তিতুমীরের আহবানে মুক্তির সন্ধান পেয়ে দলে দলে তাদের আহবানে সাড়া দিল। শুরু হল মুসলমান জাতির রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতা। কখনো কখনো ঘটনাক্রমে তাদেরকে হিন্দু জমিদার ও ইংরেজদের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামেও লিপ্ত হতে হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ এসব ইতিহাস বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাই সেসব ঘটনার পুনরায় বিবরণ পেশ করা নিষ্প্রয়োজন। বরং এই ঘটনাপ্রবাহগুলো এদেশে কিভাবে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ধাবিত হল সে সম্পর্কে যে মতামতসমূহ পাওয়া যায় তা বর্ণনাই অধিক যৌক্তিক। ফরায়েজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের পূর্বে এদেশের হিন্দু-মুসলিম প্রায় একই ধর্মীয় রীতি নীতিতে অভ্যস্ত ছিল। নামকরণে ব্যসন-বসনে, খাদ্যাভ্যাস তাদের মধ্যে পার্থক্য প্রায় ছিলনা বললেই চলে। তাই মুসলিম জাগরণের নেতারা যখন বিধর্মী সংস্কৃতি লালনের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করলেন তখন সমাজের হিন্দু ও মুসলমানের বিভেদ চিহ্নিত হল। রফিউদ্দিন আহমেদ লিখেছেন,

> "Among the Muslim peasantry, the Wahabis and the Faraizis violently denounced polytheism (Shirk) and sinful innovation

(Bid`ah) and these obviously inclued participation in Hindus festivals and rites, the adoration of pirs and numerous other syncretish cults and practices so long tolerated on even encouraged by the dominant sufist tradition. Shah Ismail, Sayyid Ahmed's companion and fellow-martyr, had drawn up a formidable list of such un Islamic customs in his Taqwitat-Al-Imam." [৪৪৯]

ওয়াহাবি ও ফরায়েজী আন্দোলনের কর্মসূচীতে দেশকে দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে রূপান্তর করার যে স্বপ্ন ছিল ঐতিহাসিকগণ তাতে সাম্প্রদায়িকতার আবেশ খুঁজে পান। ঐতিহাসিক কান্টওয়েল স্মিথের মতে, তিতুমীরের আন্দোলন মুসলমান জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তীকালের সাম্প্রদায়িক প্রচারের উর্বর ভূমি তৈরী করে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, "... did encourage communal attitudes and left a considerable section of the Muslim masses more susceptible to latter communal propaganda than they might otherwise have been." হোসেনুর রহমান লিখেছেন, "Wahabis and Mujahidies had attempted even in Bengal, Nothing more than an Islamic revival: they had tried to unite under the banner of a common faith millions of the population, with the ultimate object of overthrowing the Christian government and replacing it by a Muslim one. The seed sown by a few earnest untitled men, had borne abundant fruit and at that time overshadowed the whole Bengal." [৪৫০]

তিতুমীর এবং হাজী শরীয়তউল্লাহ তাদের আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে হিন্দু জমিদারদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এক্ষেত্রে তাদেরকে সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে এর মোকাবিলা করতে হয়। আর ঘটনা থেকেই তাদের এই আন্দোলনকে অনেকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। প্রকৃত ব্যাপারটি নুহ-উল-আলম লেনিন তাঁর গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে পরিস্কার করে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

> "সূচনায় তা না ছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে, না ছিল জমিদারি শোষণ বঞ্চনাবিরোধী। তিতুমীরের প্রচার কেন্দ্র সফদরপুর মসজিদে জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সশস্ত্র হামলা ও মসজিদটির ধ্বংস সাধন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করা হয়। তিতুমীরের পক্ষে থানায় ও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা

---

[৪৪৯] ড. পঞ্চানন সাহা উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

[৪৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

> করা হয়। কিন্তু থানা ও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা সর্বোপরি জমিদারদের পরিকল্পিত আক্রমণের ফলে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠতে প্ররোচিত করে। ৬ নভেম্বর তিতুমীরের বাহিনী জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের পুরা বাজারের কালীমন্দিরের সামনে গরু জবাই করে মন্দিরে রক্ত ছিটিয়ে দেয়। এভাবে সফদরপুর মসজিদে অগ্নিসংযোগ ও মুসুল্লী হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তিতুমীরের জঙ্গি বাহিনী একের পর এক সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে জমিদার ও সামন্তদের সন্ত্রস্ত করে তোলে।"[৪৫১]

বস্তুত তিতুমীরের ওয়াহাবী আন্দোলন বা ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের দিক থেকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছিল।

৫.৩.৪ মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্য চেতনার উন্মেষ

হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বাজাত্যবোধ বাঙালী মুসলমানকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। সমাজে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এর পেছনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলো। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানগণ ফরায়েজী, ওয়াহাবী, তরীকায়ে মোহাম্মাদীয়া আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মীয় রীতি নীতির ব্যবধান অনুধাবনে সফল হয়েছিল। সমাজে তারা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়- উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই আওয়াজ বাংলায় অনুরণিত হতে থাকে জোড়ালো ভাবে।

ধর্মীয় কারণ ব্যতীত অর্থনৈতিক বিষয়ও মুসলমানদের স্বাজাত্যবোধকে প্রভাবান্বিত করেছে। আবহমানকাল থেকে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করলেও জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, সরকারী চাকুরীজীবি এবং শিক্ষিত শ্রেণি হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করেছে হিন্দুজাতি। মুসলমানরা এটাকে নীরবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য সাম্প্রদায়িক বোধ দেখা দেয়ায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। ফারায়েজী আন্দোলন পূর্ব বাংলায় জনপ্রিয়তা পাওয়ার একটি বড় কারণ ছিল সমাজে মুসলমানদের অনুন্নত অবস্থান এবং হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের হাতে মুসলমান চাষীদের শোষণ। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং শোষণের প্রতিবাদ করেই ফরায়েজীরা গ্রামের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। আবার তাঁরা ধর্মীয় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বিঘ্নিত হয়েছিলো।[৪৫২]

এছাড়া উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বই এবং পত্র-পত্রিকায় যে প্রবল যবন-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়; তা স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমনদেরকে ব্যথিত করেছিল। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রবলভাবে মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, এটি মুসলিমদের বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাকে প্রসারিত করে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্রবোধকে প্রভাবিত করেছিল।

---

[৪৫১] নুহ-উল-আলম লেনিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[৪৫২] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

এতদ্ব্যতীত এসময়ে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি অংশ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল একটি সচেতন শিক্ষিত মুসলিম সমাজ। তারা হিন্দুদের এই বৈরী মনোভাব লক্ষ্য করে নিজেদের সংগঠিত করেন। নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত মুসলমান জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করণের প্রয়াসে নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে Mohammedan Literary Society স্থাপন করেন। সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের এবং সরকারের নিকট থেকে তাদের অধিকারসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৭৭ সালে কোলকাতায় Central National Mohammedan Association নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ড. মঈনউদ্দীন আহমাদ খান তাঁর Social history of the Muslim Bangladesh Under the British Rule নামক গ্রন্থে উনিশ শতকে মুসলমানদের নবজাগরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। মুসলমানদের মধ্যে নব উদ্দীপনা জাগাতে মুসলিম নেতাগণ এসময় যে অবদান রেখেছেন তাঁর বর্ণনা দিয়ে তিনি যা লিখেছেন তার কিংয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল,

> "In the midst of such a crisis, however, the Muslim community produced a few leaders of extraordinary calibre in Indo-Pak sub-continent, such as Nawab Abdul Latif, Sir Syed Ahmed Khan and Syed Amir Ali, who endeavoured to awaken the Muslims to the gravity of the situation and to reshape their future in line with the scientific progress of modern times. They dominated the course of Muslim history during the second half of the nineteenth century, and sought to build up the political destiney of the Muslims through modern education. They fought strenuously against traditional conservatism of the Muslims and succeeded in forging, however, inadequately, a new outlook for the younger generation in accordance with the exigencies of the time. In the long run, this spirit of modernism and reawakening, stirred up by these three leaders and their collaborators, proved to be the greatest single factor leading to the political salvation of the Muslims, especially in this sub-continent….Nawab Abdul Latif had started a vigorous campaingn for the dissemination of English learning and modern scientivic education among the Muslims. It may also be recalled that English education came within the grasp of the Muslims as early as 1829, when it was introduced for the first time at the Aliyah Madrasah of

Calcutta. But unfortunately, English learning failed to gather momentum among the Muslim students, not because of their prejudice and fanaticism, but on account of serious economic difficulties faced by them as well as due to unenthusiastic attitude of the non-Muslim staff of the English department of Aliyah Madrasah towards their Muslim students. The fact that it did not entirely fail, is borne out by the rise of Nawab Abdul Latif to a great prominence based on his English education from that very Madrasah. Nawab Abdul Latif called upon the Muslim Community of the Sub-continent to come forward for acquiring English and scientific education as early as 1853. Therefore he came to the field much earlier than Sir Syed. For his pioneering work in the field of modern Education of Indo-Pak Muslims, W.W. Hunter called Abdul Latif "the most distinguished Mussalman Reformer of the day" and Sir Richard Temple regarded him as "the most progressive and enlightened among the Mussalmans of Bengal."Another European officer has observed that Nawab Abdul Latif came out "exhorting, supplicating and earnestly appealing to his co-religionists to their sons an English education if they wanted to hold their own in competition with the Hindus." Indeed, he was most passionately eager to put the Muslims back to the wheel of the time, by means of modern education."….Nawab Abdul Latif and Sir Syed Ahmed were able to convince a section of the Muslims, that there was no other way left before them except adopting the policy of 'loyalism' towards the British rulers, acquiring modern education through the medium of English, and effecting the necessary adjustment to the new situation….Both Sir Syed and Nawab Abdul Latif, however, believed in political quietism. But their younger and more vigorous contemporary Syed Amir Ali stood for imparting to the Muslim youth an active political training along with scientific modern education. He, therefore, built up an educational campaign, a renaissace movement and also a political organization side by side."….Amir Ali's powerful aiticle published in August, 1906, in the journal of the nineteenth centrury was followed by important political

developments among the Muslims.This article, indeed, inspired Nawab Salimullah of Dhaka to draw a scheme for organising a political association under the name of All-India Mohammadan Confederacy, which he circulated among the Muslim leaders of the sub-continent.” [৪৫৩]

এসব নেতাগণ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান রক্ষণশীলতা কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা দূর করে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে তাদেরকে নতুন দিনের আলোয় আলোকিত করেন। ১৮৭০ সাল থেকে সরকার বাধ্য হয় মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে। ১৮৭১-৮৫ সালের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ সংবলিত মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। স্কুল-কলেজেও আরবি-ফারসি এবং ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ দেয়া হয়। ফলে ১৮৭২ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যে বাঙালি মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় মোট জনসংখ্যার ১৪ দশমিক ৭ ভাগ থেকে ২৩ দশমিক ৮ ভাগ।[৪৫৪]

৫.৩.৫ উনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতবর্ষে নিজেদের শাসন স্থায়ী করার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল Divide and Rule. এ উদ্দেশ্য তারা সফল হয়। আবহমান কাল থেকে পরস্পর পাশাপাশি মিলেমিশে থাকা শাসিত দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে উনিশ শতকের শেষার্ধে বৈরী মনোভাব প্রকাশ পেল নগ্নভাবে। তাদের চিন্তা-চেতনার ব্যবধান ও দ্বন্দ্ব তাদেরকে উন্নতির স্বতন্ত্র পথে ধাবমান করল। ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথ রুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় পরিচয়ই তখন তাদের কাছে প্রাধান্য পেল। এ সময় সরকারী চাকরি, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে শিক্ষিত মুসলমানদের মনে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এমনকি উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একাধিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। বৈরীতামূলক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়।[৪৫৫]

এই বৈরীতা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণ ঘটনাগুলোও তখন প্রতিপক্ষকে যন্ত্রণা দেয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন, হিন্দুদের জন্য পূজা-পার্বণে গান বাজনা করা এবং মুসলামানদের জন্য কুরবানি ও অন্যান্য কারণে গরুর মাংস খাওয়া সাধারণ রীতি। এ বিষয় নিয়ে তারা কখনো পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে জড়ায়নি। কিন্তু বিশ শতকের সূচনা থেকে দুই সম্প্রদায়ই এ ব্যাপারে অসহনীয় আচরণ করতে শুরু করল। হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই মসজিদের কাছ দিয়ে যাবার সময় অপ্রয়োজনে বাজনা বাজাতে শুরু করলেন যেন মুসল্লিদের বিড়ম্বনার

---

[৪৫৩] Dr. Muin-Ud-Din Khan,(Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, June-1992), Page. 101-105

[৪৫৪] নুহ-উল-আলম লেনিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

[৪৫৫] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

শিকার হতে হয়। আবার হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানতে বহু মুসলমান কুরবানীর সময়ে প্রকাশ্যে গরু জবাই করাকে একটি পবিত্র দায়িত্ব বলে জাহির করতে আরম্ভ করলেন। এমনকি হিন্দু-মুসলমানের শত্রুতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তারা একে অপরের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে চাইতো না। পরস্পর পরস্পর থেকে দূরত্ব বজিয়ে অবস্থান করত। পারস্পরিক সহাবস্থান ব্যাপক বাধাগ্রস্থ হল তাদের লালিত স্বতন্ত্র আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এ সময়ের হিন্দু জাতির মধ্যে একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঙ্গিকে হিন্দু মুসলমানের এই বিরোধের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন,

"আমি জানি, একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কলেজে-পাশকরা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি যাঁর তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন; বলিলেন,'আপনার মুখে পান!' গাড়ি যাঁর তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথি মুসলমান।"[৪৫৬] অন্য স্থানে তিনি বলেছেন,

"যার-তার কুয়োতে মলিনতা থাকার আশঙ্কা আছে, সেই মলিনতায় স্বাস্থ্য ক্লিষ্ট হয়, স্বাস্থ্যের বিকারে চিত্তের বিকার ঘটে, সেই বিকারে ধর্মহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে- এসব কথাই সত্য বলে মানলেও তবু বলতেই হবে অপ্রধানকে পরিমাণ- অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাতে প্রধানের মূল্য কমে যায়। সেই জন্যেই আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে মুসলমান যাদের কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না।"[৪৫৭] "হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের- স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও একথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। আমি একজন ইংরেজিনবিশের কথা জানতেম, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর খুব লোভ ছিল। তিনি আর সমস্তই রুচি পূর্বক আহার করতেন। কেবল গ্রেট ইস্টার্নের ভাতটা বাদ দিতেন; বলতেন, মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠতে চায় না। যে সংস্কারগত কারণে ভাত খেতে বাধে সেই সংস্কার কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিলতে তাঁর বাধবে।

ধর্ম-নিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দু মুসলমান বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে; খিলাফতের অনুকূল্য বা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছায় না।"[৪৫৮]

হিন্দু-মুসলমানের এই দূরত্ব, এই বৈরীতা এক দিনে সৃষ্টি হয়নি। ধীরে ধীরে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাদের মন-মানসে পরস্পরের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, নির্দয়তা, অসহিষ্ণুতা, বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িকতা গড়ে ওঠেছে।

---

[৪৫৬] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[৪৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮

[৪৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৩

৫.৩.৬ সাম্প্রদায়িক সংকট সৃষ্টির কারণ

যুগ যুগ ধরে নানা জাতি ও মানুষের মাঝে যে সহাবস্থান এবং পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হয়ে এ দেশের উন্নয়নের যাত্রায় সম অংশগ্রহণ বিদ্যমান ছিল ব্রিটিশ শাসনের আগমণে সেই সহযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়। সম্প্রীতি, ভালবাসা, মৈত্রীভাব, সহযোগিতার স্থলে প্রকাশিত হয় ঘৃণা, বৈরীতা, দূরত্ব, হিংসা, বিদ্বেষ, সংকট এবং সংঘাত। এ অবস্থার পেছনে কারণ ছিল অনেক। ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, এর একটি কারণ ছিল আর্থ সামাজিক প্রতিযোগিতা। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এদেশের সমাজ জীবনে হঠাৎ করে এমন কোন প্রতিযোগিতা হয়নি যার ফলে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, রেষারেষি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ইংরেজদের আগমনের পর ইংরেজী শিক্ষার সুবাদে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। উইলিয়াম উইলসন হান্টার ১৮৭০ সালে লিখিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেন, "শিক্ষিত হিন্দুরা সিভিলিয়ান, বিচারপতি, গেজেটেড পুলিশ অফিসার, সরকারী ইঞ্জিনিয়ার বা কাস্টমস অফিসার না হলেও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, ছোট আদালতের জজ, মুন্সেফ ইত্যাদি হয়েছেন, হিন্দু উকিল, মোক্তার, কেরানীর সংখ্যাও যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু মুসলমানদের অদৃষ্টে জুটেছে দফতরী, বেয়ারা, পিয়ন, ড্রাইভার, কোচোয়ান আর লস্করের কাজই বেশি।[৪৫৯]

১৮৮১ সালে কোলকাতার বাঙালীদের মধ্যে ব্যারিস্টার, উকিল, অ্যাটর্নি, মোক্তার, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় সেসব পেশাজীবির মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২২৮৭ জন আর মুসলমান ছিল ৬২০ জন অর্থাৎ শতকরা ২২জন অথচ ১৮৯৬ সালে সরকারী কাজে নিয়োজিত বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে মুসলমানের হার ছিল শতকরা ১ ভাগেরও কম।[৪৬০]

আর্থ-সামাজিক এই বৈষম্য তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। শুধু শহরাঞ্চলে নয় এ বৈষম্য ছিল গ্রামাঞ্চলেও। তথাকার অধিকাংশ জমিদার ছিল হিন্দু আর কৃষকদের মধ্যে মুসলমানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দু ভূ-স্বামীরা অধিকাংশই ছিল অত্যাচারী। ফলে তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিরূপ মনোভাব বিদ্যমান ছিল। আর এগুলোই পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক সংকট তৈরী করে। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন,

> "হিন্দুদের এই অগ্রসর পদক্ষেপ এবং মুসলমানদের পশ্চাদমুখীনতাই রচনা করল সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন সময়েই সারা দেশ সমানভাবে অগ্রবর্তী হয় না। আর আয় সম্পদও সকলের সমান থাকে না। প্রত্যেক দেশেই এক শ্রেণী অগ্রসর এবং আরেক শ্রেণী পশ্চাদপদ থাকে। জাতীয়তার ক্ষেত্রে জনসাধারণের এই অসমান উন্নতি কোন বাধা সৃষ্টি করেনা। সেদিক থেকে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু তবু বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে ছিল। কারণ সাধারণভাবে দেশের মধ্যে যারা অগ্রসর তারা হল হিন্দু এবং মুসলমানরা হল পশ্চাদপদ।

---

৪৫৯ আতাউর রহমান ও লেলিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমি*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০খ্রী.), পৃ. ৩৫

৪৬০ ড. পঞ্চানন সাহা , প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

ভারতবর্ষে শ্রেণীবিভাগের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে এইভাবে দেখা দিল সম্প্রদায় বিভাগ। অন্যান্য দেশের মত তাই ভারতেও জাতীয় আন্দোলন মোটামুটি মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক হলেও সে মধ্যবিত্ত দ্বিধাবিভক্ত হল দুই সম্প্রদায়ে।"[৪৬১]

সাম্প্রদায়িক সংকট সৃষ্টিতে স্বার্থান্বেষী মহলের উসকানীও ভূমিকা রেখেছে। ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম ব্যবসায়ীরা হিন্দু মুসলমানের বিবাদকে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে ব্যবহার করেছে। তাদের কারণে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মের নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে অনবহিত ছিল। তাই তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রাচীর।[৪৬২]

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী মন্তব্য করেছেন, "ধর্মীয় বিভাজন ওই সাম্যের পক্ষে মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। কেননা এই বিভাজন নাগরিকদেরকে এপক্ষে ওপক্ষে একেবারে খাড়াখাড়ি ভাগ করে দেয়, এবং তাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। তাছাড়া এটাও সত্য যে, পৃথিবীতে ধর্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে তত রক্তপাত অন্য কোনো অজুহাতে হয়নি। ধর্মকে রাজনীতিতে নিয়ে এসে আমাদের রাজনীতিকরা (সকলে নয়, তবে অধিকাংশই) নিজেরা সাম্প্রদায়িক হয়েছেন, এবং জনগণকেও সাম্প্রদায়িক হতে উৎসাহিত করেছেন।"[৪৬৩]

ঔপনিবেশিক আমলে সাম্প্রদায়িকতা বিরাজমান থাকার অন্যতম কারণ হল শাসক ইংরেজ জাতির বাসনা। এটা ছিল ইংরেজদের এদেশে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করার অভিপ্রায়ে স্থানীয় অধিবাসীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিদ্বেষকে জিইয়ে রেখে তাদেরকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা। তাই দেখা গিয়েছে এদেশে সাম্প্রদায়িকতা যত তীব্র হয়েছে শাসক শ্রেণী তত তৃপ্তি পেয়েছে। আমলাতন্ত্রের উঁচু মহলের চিঠিপত্রসমূহে এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে যে, তারা মন্তব্য করেছে হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে এতই ঘৃণা করে যে আমাদেরকে ঘৃণা করবার বেশি সময় পায় না। তাই সাম্প্রদায়িকতায় ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর সন্তোষ ছিল। এজন্যেই এর প্রতিকার হিসেবে সে সময় তাদের পক্ষ থেকে ক্ষোভ, বিক্ষোভ, নিন্দাজ্ঞাপন, উপদেশ প্রদান, সংবাদপত্রে বিবৃতি দান, প্রবন্ধ রচনা ছিল না।[৪৬৪]

বরং এদেশে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে তারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। ঔপনিবেশিক ইতিহাসবেত্তাগণ মুসলমান শাসকদের অত্যাচারী শাসক ও শোষক প্রমাণ করা তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলেন; যেন ব্রিটিশ শাসনের সুবিচার ও ন্যায়ের সুনাম সমুজ্জ্বল হয়। তারা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় হাত দেন স্বপ্রনোদিত হয়ে। রাজকুমার চক্রবর্তীর মতে,

[৪৬১] বদরুদ্দীন উমর, *সাম্প্রদায়িকতা*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, জুন ২০১১ খ্রী.), পৃ. ১৪
[৪৬২] ড. পঞ্চানন সাহা , প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
[৪৬৩] অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
[৪৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

"ইউরোপীয় লেখক-ঐতিহাসিক-প্রশাসকদের চোখে ইসলাম ছিল বর্বর লুঠেরা ও দখলদারের ধর্ম, যারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে একের পর এক নিষ্ঠুর আক্রমণ ও ধ্বংসকান্ড চালিয়ে। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের হাতে দিল্লির সুলতানরা মন্দির-মূর্তি ধ্বংসকারী মূর্তিমান দুশমনে পরিণত হয়েছে। মিশনারী আলেকজান্ডার ডাও তার হিন্দুস্তানের ইতিহাসে (১৭৭০) বলেছেন, মুসলমান শাসকরা তরবারির জোর খাটিয়ে ভারতের মানুষের দেহকে শুধু নয় মনকেও বন্দি করে ফেলে- এইভাবে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করতে পারে। এ দেশীয়দের ধর্মবিশ্বাস ও তার বেঁচে থাকার পরিবেশ- এই উভয়ের কারণে হিন্দুরা আজ দুনিয়ার সব থেকে পৌরষহীন ভীরু জাতি হিসেবে ভয়ঙ্কর মুসলমান আক্রমণকারীদের অনুগত প্রজায় পরিণত হয়েছে।"[৪৬৫]

বিশপ হেবার (১৮২৩-২৬) বারবার হিন্দুদের একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তারাতো ব্রিটিশদের কাছে স্বাধীনতা হারায়নি, তারা মুসলমান শাসনাধীনে থেকেই পরাধীন ছিল। তিনি আরো মনে করিয়েছেন যে, মুসলিম শাসকগণ ব্রিটিশদের মতোই রক্ত সম্পর্ক বা ধর্মীয় সম্পর্কের দিক থেকে ভারতে বহিরাগত আগন্তুক এবং তারা ব্রিটিশদের চেয়ে ঢের বেশি অত্যাচারী।[৪৬৬]

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মত ভারতীয় হিন্দু ঐতিহাসিকগণও এসময় তাদের লেখনিতে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন। পক্ষপাতমূলক ইতিহাস রচনা করতে উৎসাহী ছিলেন। যেমন পলাশী যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তার মনোভাব পরিস্ফুট হয়। তিনি বলেন,

"When the sun dipped into the Ganges behind the blood-red field of Plassey, on that fateful evening of June, did it symbolise the curtain dripping on the last scene of a tragic drama?..Today the historian, looking backwardover the two centuries that have passedsince then, knows that it was the beginning, slow and unperceived, of a glorious dawn, the line of which the history of the world has not seen elsewhere. On 23rd June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began…" [৪৬৭]

মোগল শাসন সম্পর্কে বলেন,

"Its potency foe good, its very life was gone. The country's administration had become hopelessly dishonest and inefficient, and the mass of the people had been reduced to the deepest poverty, ignorance and moral degradation by a small, selfish, proud, and

---

৪৬৫ উদ্ধৃত নূর মোহাম্মদ, *বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৫), পৃ. ১১০

৪৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৪৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

unworthy ruling class…Education, literature society, religion man's handi work and political life, all felt the revivifying touch of the new impetus from the west…It was truly a Renaissance, wider, deeper, and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantinople." [৪৬৮]

ইংরেজগণ এদেশে এসব প্রথম মুদ্রণ শিল্পের বিস্তার করেন। তাদের পৃষ্ঠাপোষকতায় খুব কম সময়ের মধ্যে বাংলা গদ্য একটি আকার লাভ করে। আর তাতে নতুন ছাপাখানার দৌলতে সংস্কৃতি নির্ভর হিন্দু সাম্প্রদায়িক আধিপত্য সৃষ্টি হয়। সবাই ভুলেই গেল যে কিছুদিন পূর্বেও ফার্সি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উনিশ শতক জুড়ে বাংলা ভাষার উপর হিন্দু আধিপত্য যে শিকড়-বাকড় চাপিয়ে দিয়েছে, তা নিয়ে কেউ ভাবেওনি, উদ্বেগই বোধ করেনি।[৪৬৯]

এ সময় মুসলমান চিন্তাবিদ ও নেতৃবৃন্দ আরবী ও ফারসী ভাষার গুরুত্বারোপ করেন। অসগরের মতে হিন্দি, উর্দু, আরবী, ফার্সী, বাংলা ইত্যাদি ভাষা ভাষী মানুষগণ পৃথক জাতিয়তা অনুভব করেন। এ সময় উপর তলার হিন্দু ও মুসলিম নিজেদের স্বতন্ত্র ভাষার পক্ষে কথা বলেন,

আসগর বলেন, "The First Systematic division brought about between Hindu and Muslim elities in late ninetheenth century India was on question of linguistic identity." [৪৭০]

ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানগণ যে সাহিত্য সম্ভার তৈরী করেছেন তাও তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকট সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৮৭০ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগ। এ সময় হিন্দু মুসলিমের ঐক্য কামনা ও পরাধীনতার গ্লানিবোধ থেকে অনেক রচনা সৃষ্টি হয়েছে। আবার হিন্দু লেখক কর্তৃক মুসলমানদের হেয় করা ও প্রচুর অনৈতিহাসিক হিন্দু গৌরব কাহিনীর জবাবে মুসলমানগণও ইসলামের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুসলমানদের গৌরব সম্পর্কে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন।

সাম্প্রদায়িকতা তৈরীতে হিন্দু ও মুসলিমের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যতার ভূমিকাও ছিল তৎপর। এটি তাদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার পরিবর্তে বিভেদ সৃষ্টি করেছে । অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায়,

> "এই উপমহাদেশে ধর্মের সাংস্কৃতিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ: তবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার জায়গাটাতে সংস্কৃতির ভূমিকা যতটা শক্তিশালী হবার কথা ছিল ততটা হয় নি। এর দরুন সুবিধা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার। হিন্দু- মুসলমানের পক্ষে সাংস্কৃতিকভাবে মিলিত হবার মতো স্থানের কোনো অভাব ছিল না, সেই স্থানটা ছিল ভাষার ভেতর, আচার-আচরণ ইতিহাস- ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে, ছিল

[৪৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
[৪৬৯] নূর মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
[৪৭০] উদ্ধৃত প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

> শিল্পকলাতেও। সংস্কৃতির নিজস্ব আঞ্চলিকতা কমিয়ে এনে তাকে সর্বভারতীয় করে তুলবার যে প্রয়াস তা সংস্কৃতির কোন উপকার করেনি। রাজনীতির উপকার তো করবার কথাই ওঠে না। মিলিত অবস্থান ও সংগ্রাম খণ্ডিত হয়ে গেছে, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বেড়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে শত্রুতা, স্বাধীনতার সংগ্রাম রূপ নিয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার।"[৪৭১]

হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংকট সৃষ্টির অন্যতম কারণ হল হিন্দু ও মুসলিমের পরস্পরের প্রতি বৈরী মনোভাব। যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈরী মনোভাব থেকে সামাজিক মেলামেশায় তারা এমন সব আচরণ করতে থাকেন যা তাদের বিচ্ছেদ ঘটায়, ঘৃণা, বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হয়। ১৯০৫ সালে ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় ওসমান আলী লিখেছেন, "কতিপয় উন্নতমনা উদার প্রকৃতির ব্যক্তি ব্যতীত, হিন্দু মাত্রেই সাধারণত মুসলমান শ্রবণ করিয়া মাত্র উৎকট ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন।... সত্যিই কি মুসলমান ঘৃণার পাত্র?"

১৯১৮ সালে 'আল ইসলাম' নামক বাংলা পত্রিকায় লিখা হয়েছে, "সাধারণ মুসলমানরা অভিযোগ করে যে হিন্দু জমিদাররা তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, এমনকি সাধারণ হিন্দুরাও অযৌক্তিক অপবাদ দেয় ও তাদের সঙ্গে পথে, ট্রেনে, ষ্টীমারে এবং বাজারে শত্রুর মত অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করে। হিন্দুরা মুসলমানদের ছোয়া বাঁচিয়ে চলে আর যবন ম্লেচ্ছ নানা অবজ্ঞাপূর্ণ শব্দ মুসলমানদের প্রতি ব্যবহার করে। হিন্দুদের মুসলমানদের প্রতি সামাজিক সংকীর্ণমনা আচরণ মুসলমানদের মনে তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ সঞ্চার করেছে।"

১৯৪০ সালে মহাত্মা গান্ধী ও 'হরিজন' পত্রিকাতে একথারই পুনরাবৃত্তি করে লিখেন, 'আমি মনে করি অস্পৃশ্যতা আমাদের পতনের এবং হিন্দু-মুসলমান বিভেদের প্রধান কারণ।"[৪৭২]

৫.৩.৭ বঙ্গভঙ্গ: সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বৈরীতামূলক সম্পর্ক যখন প্রকট আকারের দিকে চলমান তখন ব্রিটিশ সরকার এই বিভেদকে স্থায়ী করার পরিকল্পনা হাতে নিল তৎকালীন ভারতবর্ষের বৃহৎ প্রদেশ বাংলাকে বিভক্ত করার মাধ্যমে। যেন বাঙালী জাতি ধর্মীয় ভিন্নতা ভুলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রিত না হতে পারে এবং তাদের জাতিয়তাবাদী চেতনা খর্ব হয়। এলক্ষ্যে ১৯০৪ সালে মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে গঠিত হবে। পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার রাজধানী হবে ঢাকায়। আর হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে থাকবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি যার রাজধানী হবে কলকাতা। কিন্তু তৎকালীন বাঙালী সমাজ প্রমোদ গুনলেন। এটা অনেকের স্বার্থে আঘাত হানায় তারা প্রবল ভাবে এর বিরোধিতা করতে শুরু

---

[৪৭১] অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
[৪৭২] ড. পঞ্চানন সাহা উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

করেন। যা এ সময় হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। তার অনুরণন দেখা যায়। তিনি লিখেছেন,

> "১৯০৫ এর আগের বাংলা আর পরের বাংলা এক নয়, নানা দিক দিয়েই তারা আলাদা। বাংলায় যা ঘটেছে তার নিজস্বতা অতুলনীয়। ১৯০৫-এর আগের বাংলা আর পরের বাংলা এক নয়, নানাদিক দিয়েই আলাদা। দেশপ্রেম, সৃষ্টিশীলতা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের এক প্রবল স্রোত তখন বাংলার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। বেশ বড় রকমের একটি ধাক্কা খেয়েছে দেশের বিত্তবান মানুষ, যেমনটা এর আগে তারা কখনো অনুভব করেনি। শাসক ব্রিটিশ ভয় পাচ্ছিল বাঙালীদের রাজনৈতিক চেতনাকে, অপরদিকে বিত্তবান বাঙালীরা দেখতে পাচ্ছিল যে বঙ্গবিভাগ তাদেরকে স্থায়ীভাবে দুর্বল করে দেবে; সাংস্কৃতিকভাবে তো অবশ্যই, আরো জরুরী যে- ব্যাপার, অর্থনীতি, সে-ক্ষেত্রেও তারা সমূহ ক্ষতির মুখোমুখি হবে। কলকাতাকে সঙ্গে নিয়ে অবিভক্ত বঙ্গে একটি অর্থনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছিল। এতে জমিদার, চাকুরীজীবী, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, সবাই ছিল জড়িত। জমিদারদের অধিকাংশ থাকতো কলকাতায় কিন্তু তাদের অনেকেরই জমিদারী ছিল পূর্ববঙ্গে, সেখানে তাদের নায়েব-গোমস্তারা থাকতো, আত্মীয়স্বজনের একাংশও বসবাস করতো। জমিদাররা পূজা-পার্বণে গ্রামে আসতো, এবং তাদের আয়ের উৎস ছিল ওই জমিদারী। এই জমিদারদের পক্ষে পার্টিশনের বিপদটাকে না বুঝবার কোনো কারণ ছিল না। চারকুরীজীবীদের মধ্যে জন্মসূত্রে যারা পূর্ববঙ্গীয় তারা ভয় পেলো দেশকে হারাবার। পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত ভাবলো চাকরী ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলকাতা তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। পেশাজীবীদের মধ্যে– আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক ইত্যাদি–যারা কলকাতায় থাকতো তারা আতঙ্কিত হলো বিচ্ছিন্নতার ভয়ে, যারা পূর্ববঙ্গে বাস করতো তারাও মনে করলো আগের মতো সুযোগ পাবে না কলকাতা যাবার। পাট ও চালের ব্যবসায়ীরা প্রমাদ গুণলো। কলকাতাবাসী ভাবলো ঢাকার বাঙালরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে; চট্টগ্রাম বন্দর প্রতিযোগিতায় নামবে কলকাতা বন্দরের সঙ্গে। ভীত সন্ত্রস্ত এই মানুষদের পক্ষে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ না দিয়ে কোনো উপায় ছিল না। কার্জন বুঝতে ভুল করেন নি। হৈ চৈ টা সত্যি খুবই তীব্র হয়েছে। দেশপ্রেম তখন এমনভাবে জেগে উঠেছিল যেমনভাবে আগে কখনো ওঠে নি। শিক্ষিত মানুষের কাছে দেশ বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।"[৪৭৩]

এই বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের আবেগ অনুভূতি রূপ নিল জাতীয়তাবাদে। আর তখনই এর সাথে ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটল এবং সেই মিশ্রণের ফোকর গলিয়ে গঁজিয়ে উঠল সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষবৃক্ষটি। দেশপ্রেম হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদ দুই ভাগে বিভক্ত হয় সাংঘর্ষিক পথ অবলম্বন করল। এই হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক এই সংঘর্ষ-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, বৈরীতা ছিল ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তার ইহজগতিকতাবোধকে ভেতর থেকে দুর্বল করার সূচনা। সাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মোচন। ব্রিটিশ শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধের পরিবর্তে উৎসাহিত করে একে মহীরুহে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার পর

[৪৭৩] অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, দেশীয় রাজনীতিবিদদের প্রবল পরাক্রমে উত্থান, বিভিন্ন স্থানে হিন্দু- মুসলিম সংঘর্ষ; আবার কখনো তাদের মাঝে সম্প্রীতি তৈরীর উদ্যোগ এবং এসব ঘটনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের অনিবার্য পরিণতি।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়, আর এর বিরোধীরা সেদিন থেকেই বিভিন্নভাবে এর প্রতিবাদ করতে শুরু করে। সেদিন কলকাতায় হরতাল পালিত হয়। রাখীবন্ধনে মানুষ একে অপরকে এই প্রতিবাদের সহযাত্রী করে নিয়েছে। সকালে উঠে চলে গিয়েছে গঙ্গা স্নানে, বন্দে মাতরম ব্যাজ ধারণ করে স্বদেশী গান গেয়ে পথে পথে খালি পায়ে হেটে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ওই বিক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সশরীরে যুক্ত ছিলেন। এর এক সপ্তাহ আগে তিনি 'বিজয়া সম্মিলন' নামে একটি ভাষণ দেন যেখানে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত আন্দোলনের বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি সেদিন বলেছিলেন, "তোমরা সকলের কাছে যাও, যাও জনগণের কাছে, যেতে হবে চাষীর গৃহে, যাবে দিনের অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নামাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তার কাছেও।" আরো বলেছেন, "তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের বন্দে মাতরম গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাক।"[৪৭৪]

কিন্তু এই আন্দোলন ধর্মীয় বিভেদের কারণে সম্মিলিতভাবে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। বরং ধর্মীয় পার্থক্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধীতাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতাকে জাগ্রত করেছে। এর চিত্র রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। তিনি মুসলমানের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ সম্পর্কে লিখেছেন,

> "হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কুস্তির সময়ে কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না, কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারো গায়ে পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়। আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি; তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে। কারণ সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া। বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক

[৪৭৪] অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোন দিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।"[৪৭৫]

এজন্যই বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনে সাধারণভাবে মুসলমানরা এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা সমর্থন জানাননি, বরং বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের উপকার সাধন করবে এই ধারণার উপর তাদেরকে সক্রিয় করার চেষ্টা করেন নবাব সলিমুল্লাহ। ১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ যেদিন থেকে কার্যকর হলো, সেদিনই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন প্রাদেশিক মুসলিম ইউনিয়ন। পরের বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি এই সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট মুসলিম নেতাদেরকে নিয়ে একটি বৈঠক আহবান করলেন। এই বৈঠকে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ, মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করতে যার ভূমিকা অপরিসীম। আবার দেশ বিভাগের কট্টর সমর্থক হিন্দু মহাসভাও ঐ একই বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪৭৬]

এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯১৫ সালে ৯ এপ্রিল হরিদ্বারে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক সংগঠন নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা গঠিত হয়। এর আগে ১৯০২ সালে গঠিত হয় প্রাথমিকভাবে শরীর চর্চার প্রতিষ্ঠান অনুশীলন সমিতি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটি স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম শুরু করে। বঙ্গভঙ্গ রদকরণের দাবীকে উচ্চবর্ণের হিন্দুও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা স্বদেশি আন্দোলন ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ডাক দেয়। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন এবং মুসলমান ব্যবসায়ীদের ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয়ে বাধাদান প্রভৃতি ঘটনা মুসলমানদেরকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিপক্ষে রূপান্তরিত করে। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সচেতনতার উন্মেষ ঘটে। ১৯০৬ সাল থেকে মুসলমানরাও আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। ১৯০৭ সালে তা ভয়ঙ্কর দাঙ্গা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যার প্রত্যক্ষ ইন্ধন যোগায় ইব্রাহীম খাঁ রচিত " লাল ইশতিহার"। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ইশতিহারটিতে বলা হয়,

> "হে মুসলমানরা, উঠ, জাগো! তোমরা হিন্দুদের সাথে একই স্কুলে পড়ো না। হিন্দুর দোকান হতে কিছু ক্রয় করো না। হিন্দুদের দ্বারা তৈরি কোন পণ্য স্পর্শ করো না। কোন হিন্দুকে কোন কাজে নিয়োগ করো না। হিন্দুর অধীনে তোমরা কোন নিম্নপদ গ্রহণ করো না। তোমরা অজ্ঞ, কিন্তু যদি জ্ঞান অর্জন করো, তবে তোমরা অবিলম্বে সকল হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাতে পারবে। তোমরাই হবে এ প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। কৃষকদের মধ্যে তোমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কৃষিই হচ্ছে সম্পদের উৎস। একজন হিন্দুর নিজের কোন সম্পদ নেই এবং সে কেবল তোমাদের সম্পদ হরণ করেই নিজে সম্পদশালী হয়েছে। তোমরা যদি যথোপযুক্তভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে, তবে হিন্দুরা সকলেই অভূক্ত থাকবে এবং অচিরেই মুসলমান হয়ে যাবে।"[৪৭৭]

---

[৪৭৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
[৪৭৬] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
[৪৭৭] নুহ-উল-আলম লেনিন উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

এমনকি ইংরেজ সরকারও হিন্দুদের আক্রমণ করতে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় জামালপুরের বকসীগঞ্জে প্রাপ্ত একটি বিজ্ঞপ্তি হতে যার বিবরণ হল,

> “আল্লাহু আকবর! মুসলমান ভাইদের সকলে জানে কি করে জামালপুরের মুসলমানরা আহুত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে নিযুক্ত হিন্দুদের দমন করেছে। হে মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা কি জান যে সরকার এবং নবাব সলিমুল্লাহ সাহেব সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমর্থক? সুতরাং আমরা আর কার পারোয়া করবে? লাঠি ধর, হিন্দুদের বিতারিত কর, খ্যামা হিন্দুদের মাথা ভেঙ্গে দাও এবং ধুলায় মিশিয়ে দাও। যে এই বিজ্ঞপ্তি ছিড়বে সে নিজ মাকে অপহরণ করেছে বলে সাব্যস্ত হবে।”[৪৭৮]

যা হোক বঙ্গভঙ্গের ফলে সমগ্র দেশ ব্যাপী যে অরাজকতা, আন্দোলন, বিক্ষোভ, সহিংসতা, সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছিল তার প্রতিকার করতে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের আইন পাশ করে।

৫.৩.৮ সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা

বঙ্গভঙ্গের ফলে এদেশে যে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তার গোড়ায় জল সঞ্চার করার মত যথেষ্ট লোক যেমন সেসময় ছিলেন তেমনি একে নির্মূল করে সম্প্রীতির নির্মল বায়ূ প্রবাহিত করাতে সচেষ্ট ব্যক্তিবর্গও সমাজে বিদ্যমান ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সে সময়ের উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী স্বদেশী গান ‘বন্দে মাতরম’ এর রচয়িতা শক্তিশালী ও প্রভাবশালী লেখক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নাম উল্লেখ আবশ্যক। তার এই গান ছিল স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান উদ্দীপক। সে সময় স্বদেশী বিপ্লবীগণ বন্দে মাতরম তাদের শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এতে দেশকে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন এবং মায়ের মূর্তিকে দেবী দুর্গার চরিত্রের সাথে তুলনা করেছেন। ফলে এই গানের মধ্যে পৌত্তলিকতার উপাদান থাকায় মুসলমান একে গ্রহণ করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস আরো বেশি সাম্প্রদায়িকতা বিস্তার করেছে।এছাড়া তার বহু রচনা উগ্র হিন্দু জাতিয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে। যেমন, ‘ভারত কলঙ্ক’ নামক প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি বলেছেন, “আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরো লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল হয়। তাহাতেই আমার মঙ্গল হয়।” প্রখ্যাত সাহিত্যিক গোপাল হালদার যথার্থই লিখেছেন, “বঙ্কিমের এই জাতীয়তা মূলত হিন্দু জাতীয়তা। যে জাতীয় সংস্কৃতি তাঁর মূখ্যসাধনা, তাও মূলত হিন্দু সংস্কৃতি। এ বিষয় যত তর্ক উঠুক, এ ধারণাটাই বঙ্কিমপাঠে ভারতের অ-হিন্দুর মনে বদ্ধমূল হতে বাধ্য। বঙ্কিম কথিত জাতীয় সংস্কৃতিতে অ-হিন্দু ভারতীয়দের স্থান নগণ্য অ-হিন্দুদের অস্তিত্বই যেন অজ্ঞাত।” কাজী আবদুল ওদুদ সঠিকভাবেই বলেছেন,“শিল্পীরূপে ক্রটি সত্যই বড়ো রকমের। বঙ্কিমের মন্ত্রের দেবতা উগ্র জাতীয়তা।”[৪৭৯]

---

[৪৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

[৪৭৯] ড. পঞ্চানন সাহা উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৪

তার আনন্দমঠ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে সন্তান সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা করছে তাতে তার মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসে এভাবে লিখা হয়েছে, “কেহ বলে- ভাই এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালী হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব? কেহ বলে, “ভাই এমন দিন কি হইবে মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?”[৪৮০]

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে রাজনীতিবিদ ছিলেন না। কিন্তু তার বক্তব্য ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সঞ্চালন করেছে। এর যথার্থ উদাহরণ হলেন অরবিন্দ ঘোষ। তিনি বিলেতে পড়াশোনা করেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে ভারতে চলে আসেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা চেতনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে তিনি একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন যার নাম ছিল বঙ্কিমের বিখ্যাত রচনার নামে ‘বন্দে মাতরম’। তিনি ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গোপন বিপ্লবী দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে সাম্রাজ্যবাদীদেরকে বিতাড়িত করা। এসব বিপ্লবী তৎপরতার অভিযোগে তিনি কারারুদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্সী জেলে কয়েক বছর ছিলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের আধ্যাত্মিক নেতারূপে আবির্ভূত হন। কারামুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তার প্রদত্ত বক্তব্য থেকে তার অবস্থান পরিষ্কার হয়। তিনি বলেছিলেন, “ আমি তো আগেই বলেছিলাম যে এই আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বলেছিলাম যে জাতীয়তাবাদ জিনিসটা রাজনীতি নয়, এ হচ্ছে একটি ধর্ম, একটি জীবন দর্শন, একটি বিশ্বাস। কথাটা আমি আবারো বলছি, যদিও অন্যভাবে। এখন আমি আর বলি না ,যে জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি জীবনদর্শন, একটি ধর্ম, একটি বিশ্বাস; আমি বলি যে আমাদের জন্য সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তাবাদ।”

অরবিন্দের চেয়েও বেশি মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন স্বদেশের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর বিনায়ক দামোদর সাভারকার (১৮৮৩-১৯৬৬) যিনি প্রথম জীবনে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রামের কথা বলতেন। ১৯০৮ সালে তিনি সিপাহি বিদ্রোহের উপর মারাঠী ভাষায় একটি বই লিখেন। এই বইতে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়-সম্প্রদায়কে ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে গিয়ে এক পতাকাতলে সমবেত হয়ে ইংরেজদের বিতাড়ণ করার আহবান জানান। এই বই ভারতে, ইংল্যান্ডে এবং ফ্রান্সে প্রকাশ করবার অনুমতি না পেয়ে তিনি হল্যান্ডে গিয়ে তা ছাপিয়ে ভারত পাঠান, কিন্তু ভারত সরকার অবিলম্বে বইটিকে নিষিদ্ধ করেন। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি চরমপন্থীদের দলে যোগ দেন এবং দ্রুত নেতৃত্বে চলে আসেন। এ সময় বঙ্গভঙ্গের মূল হোতা লর্ড কার্জন লন্ডনে গেলে তিনি তাকে হত্যা করার ব্যর্থ প্রচষ্টা চালান। তাতে ব্যর্থ হয়ে সাভারকার তার চরমপন্থী তরুণ

[৪৮০] অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

সহযোগীদের মাধ্যমে ভারত সচিবের রাজনৈতিক সহকারী উইলিয়াম উইলিকে হত্যা করেন। এরপর সাভারকারকে আন্দামানের দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসনে পাঠানো হয়। প্রায় ৩০ বছর পর মুক্তি পেয়ে তিনি হিন্দু মুসলমানের একতার ধারণাকে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার প্রতিটি বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ইংল্যান্ডে তাঁর বিদ্বেষের পাত্র ছিল ইংরেজ, ভারতে এসে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে গেলেন। এমনকি মুসলমানদের 'তোষণ' করার অপরাধে অভিযুক্ত মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পেছনেও তার হাত ছিল। ১৯৩৭ সালে তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারত একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত হয়েছে বলে যারা মনে করে তারা নিতান্তই ভ্রান্ত, কেননা ভারতে দুটি প্রধান জাতি বাস করে যাদের একটি হিন্দু অপরটি মুসলমান।[৪৮১]

এ সময় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির রূপ ফুটে ওঠে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ডে। জন্মসূত্রে ব্রাক্ষণ এই ব্যক্তি কয়েকবার ধর্মান্তরিত হয়ে শেষে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ব্রহ্মবান্ধব নাম ধারণ করেন। বঙ্গভঙ্গের সময়ে তার কাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, " সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমন্থনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তার মধ্যেই একদিন দেখলাম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ। তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিল। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।" এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের দূরত্ব তৈরী হয়। তারপর, "সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে যখন জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে একলা বসেছিলাম, হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। [...] আলোচনার শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন, চৌকাঠ পর্যন্ত একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন– বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।'– স্পষ্ট বুঝতে পারলুম এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যই তাঁর আসা।"[৪৮২] তার এই পতন হল একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও তিনি বিভীষিকাময় পন্থার দিকে গিয়েছিলেন। এতেই প্রমাণিত হয় সাম্প্রদায়িকতা তখন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।

বাংলার এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এই সময় হতেই ধীরে ধীরে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে লীন হতে থাকল। হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতেও অনেকে এগিয়ে এলেন। যেমনঃ মহাত্মা গান্ধী, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আবদুর রসুল, আবুল হোসেন, চিত্তরঞ্জন দাস। সম্প্রীতির বার্তা লেখনীর মাধ্যমে প্রচার করতে রত হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম। রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতায় সম্প্রীতি তৈরীর প্রচেষ্টায় রাজনীতিবিদগণের অবদান যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

---

[৪৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫১

[৪৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মুসলিমের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আজীবন। কবি ও লেখক হয়েও তিনি এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মুসলমানদেরকে সঙ্গী করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আবার এ আন্দোলন যখন সাম্প্রদায়িক প্রবাহে ধাবিত হয় তখন তিনি তা বর্জন করেন। তিনি মনে করতেন, যে দেশ ধর্মের বাঁধন ছাড়া মানুষকে মেলায় না সে দেশ হতভাগ্য। ধর্মীয় বিভেদ সবচেয়ে সর্বনাশা বিভেদ। দেশকে বাঁচাতে হলে ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে। হিন্দুমুসলমান নামক প্রবন্ধে তিনি সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন,

> "ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সমাজের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এক মহাজাতিকে জাগিয়ে তুলে তার একচ্ছত্র আসন রচনা করব বলে দেশ-নেতারা পণ করেছেন। ঐ আসন জিনিসটা, অর্থাৎ যাকে বলে কন্‌স্‌টিট্যুশ্যন, ওটা বাইরের, রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থায় আমাদের পরস্পরের অধিকারনির্ণয় দিয়ে সেটা গড়ে-পিটে তুলতে হবে। তার নানা রকমের নমুনা নানা দেশের ইতিহাসে দেখেছি, তারই থেকে যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলছে। এই ধারণা ছিল, ওটাকে পাকা করে খাড়া করবার বাধা বাইরে, অর্থাৎ বর্তমান কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছার মধ্যে। তারই সঙ্গে রফা করবার, তক্‌রার করবার কাজে কিছু কাল থেকে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি।
>
> যখন মনে হল কাজ এগিয়েছে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দেখি মস্ত বাধা নিজেদের মধ্যেই। গাড়িটাকে তীর্থে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে সারথি যদি বা আধ-রাজি হল ওটাকে আস্তাবল থেকে ঠেলে বের করবার সময় হুঁশ হল– এক্কা গাড়িটার দুই চাকায় বিপরীত রকমের অমিল, চালাতে গেলেই উল্টে পড়বার জো হয়।
>
> যে বিরুদ্ধ মানুষটার সঙ্গে আমাদের বাইরের সম্বন্ধ, বিবাদ করে একদিন তাকে হটিয়ে বাহির করে দেওয়া দুঃসাধ্য হলেও নিতান্ত অসাধ্য নয়, সেখানে আমাদের হার-জিতের মামলা। কিন্তু ভিতরের লোকের বিবাদে কোনো এক পক্ষ জিতলেও মোটের উপর সেটা হার, আর হারলেও শান্তি নেই। কোনো পক্ষকে বাদ দেবারও জো নেই, আবার দাবিয়ে রাখতে গেলেও উৎপাতকে চিরকাল উত্তেজিত করে রাখাই হবে। ডান পাশের দাঁত বাঁ পাশের দাঁতকে নড়িয়ে দিয়ে যদি বড়াই করতে চায় তবে অবশেষে নিজে অনড় থাকবে না।"[৪৮৩]

এই প্রবন্ধেরই অন্য স্থানে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মুসলমানদের সাথে যে সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতেন তা এসেছে তাঁর নিজের ভাষ্যে। তিনি বলেছেন, "শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রভেদ অনুভব করি নি, এবং সখ্য ও স্নেহসম্বন্ধ-স্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটে নি। যে সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তার মধ্যে মুসলমান গ্রাম আছে। যখন কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা দূতসহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে, তখন বোলপুর-অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা

[৪৮৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

মসজিদ ভেঙে দেবার সংকল্প করছে। এইসঙ্গে কলকাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু, স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি, কেননা তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানী নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করি নি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখনি তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন। এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে, আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা।"[৪৮৪]

শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি আনয়নের প্রচষ্টা চালিয়েছেন 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদক আবুল হোসেন। এ প্রসঙ্গে তার উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করে নূর মোহাম্মদ 'আবুল হোসেনঃ তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন, " তিনি প্রথম মান (Standard) যাদের বয়স ছয় থেকে সাত বৎসর তাদের জন্য বিধান রাখলেন, 'বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের গল্প, যাতে প্রত্যেক জাতির কৃতিত্বে শ্রদ্ধা জাগে'।... মুসলমান চিত্তে মুসলিম সভ্যতার স্মৃতি এবং হিন্দুদের চিত্তে হিন্দু সভ্যতার কাহিনী জাগরূক করার জন্য নানা প্রকার ঐতিহাসিক কাহিনী।...'

'যে সমস্ত গল্প বা কথায় এক সম্প্রদায়ের হৃদয়ে চোট লাগে– তা একেবারে বর্জন করতে হবে। যেমন আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ– রানা প্রতাপের মুসলিম নিধন– অন্ধকূপ হত্যা ইত্যাদি। এ সমস্ত নব Curriculam এ কিছুতেই স্থান পাবে না। কারণ আমাদের এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হবে হিন্দু-মুসলিম (Culture) এর সমন্বয় (Synthesis) সাধন করে হৃদয়বান আধুনিক ভারতবাসী তৈরি করা।' আশঙ্কা যথার্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কয়েক দশক ধরে চলে আসা এই যে পঠন– পাঠন প্রক্রিয়া তার উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তারিত সুগভীর চিন্তার যে পরম্পরা হিন্দু- মুসলমান সম্পর্ক অবনতির একটা বিশেষ কারণ হতে পারে তা কিন্তু হুসেন প্রায় স্পর্শই করতে চাননি। হতে পারে তিনি বিতর্কে না যেয়ে একটা নিষ্পত্তি চান।"[৪৮৫]

[৪৮৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
[৪৮৫] নূর মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৫.৩.৯ রাজনৈতিকভাবে সাম্প্রদায়িক সমঝোতার প্রচেষ্টা

বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়। অবশ্য এর পূর্ব হতেই মহাত্মা গান্ধী ও জিন্নাহর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী সম্প্রীতি তৈরীর উদ্যোগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য জোড়দার করতে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিতে প্রাদেশিক আইন সভাতে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়। এই চুক্তির ফলে হিন্দু মুসলিম উভয় নেতাগণই সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলেন। এরপর ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধী রৌলাট আইন বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। তিনি দেশবাসীকে সত্যাগ্রহের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলনকে সফল করার আহবান জানালেন। ভারতের আপামর জনসাধারণ তার আহবানে সাড়া দিল। ১৯১৯ সালের মার্চ ও এপ্রিলে পুরো ভারত জুড়ে হরতাল, ধর্মঘট আর শোভাযাত্রায় কোটি কোটি মানুষ অংশ নিল। 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য দীর্ঘজীবি হোক' এই ধ্বনিতে সারাদেশ আন্দোলিত হল।

সম্প্রীতির আরেকটি নিদর্শন মূর্ত হয় ব্রিটিশ কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ। ইংরেজ জেনারেল ডায়ার গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের অংশ নেয়া শত শত নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের উন্মুক্ত প্রান্তরে। সমগ্র ভারত ধর্মীয় পরিচয় ভুলে এর প্রতিবাদে এক হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন। এ সময় জনসাধারণের মধ্যে অসাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধ পরিলক্ষিত হল। হিন্দুরা প্রকাশ্যে মুসলমানদের হাত থেকে জল পান করতে আরম্ভ করল আর মুসলমানরাও তাই করল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নিয়ে ফেস্টুন লেখা হল। এমনকি মসজিদের বেদী থেকে হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা দিতে দেয়া হয়েছিল।[৪৮৬]

এদেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল তারকার মত ক্ষণিকের জন্য হলেও হিন্দু মুসলিমের সম্প্রীতির বার্তা বহন করে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন। এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন মহাত্মা গান্ধী। মুসলমান যখন তুরস্কে খেলাফতের পুনপ্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের চিন্তা মাথায় রেখে তিনি মুসলমানদের পাশে দাড়ালেন। ১৯১৯-২২ সালকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জাতীয় নেতাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয় খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯১৯ সালে ২১ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীসহ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এতে অংশ গ্রহণ করে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। ১৯২০ সালে গান্ধী ব্রিটিশদের বিরোধীতা করতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একযোগে চলতে লাগলো গান্ধীর নেতৃত্বে। এছাড়া ক্ষণকালের জন্য হলেও এই আন্দোলন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অপূর্ব

[৪৮৬] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করল। বাংলাদেশে এই অন্দোলন শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে পরিচালিত হল। বাংলাদেশে এর প্রভাব সম্পর্কে ড. পঞ্চানন সাহা বলেন,

> "বাংলাদেশে এই অসহযোগ আন্দোলন বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। শুধুমাত্র শহর ও গ্রামের মধ্যবিত্তদের মধ্যেই নয়, সমগ্র দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যেও এমনকি সহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী বাঙালি বিপ্লবীদের মধ্যেও অসহযোগ আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছিল। এসময় আসামের চা-বাগানের শ্রমিকরা বাগিচা ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশের পথে অগ্রসর হলে চাঁদপুরে তাদের উপর ব্রিটিশ পুলিশের নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও আসামে কয়েক মাস ব্যাপী রেল ও ষ্টীমার শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট ঘটে। এই ধর্মঘটিদের বেশির ভাগই ছিল মুসলমান। আর চা-শ্রমিকদের অধিকাংশ কেন প্রায় সবাই ছিল হয় হিন্দু অথবা প্রকৃতি পূজক আদিবাসী। জাতীয়তাবাদী মনোভাব এ ধর্মঘটের প্রধান কারণ ছিল। আর একটি ঘটনা হল মেদিনীপুরে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড আইন বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য।"[৪৮৭]

১৯২১ এর শেষ দিকে ভারতের রাজনীতি আরো চরম পর্যায়ে উপনীত হল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম একীভূত হল। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে তৈরী হওয়া আন্দোলনগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এর কারণ আন্দোলনের নেতারা অহিংস নীতি প্রবর্তন করলেও সাধারণ জনতা একে সহিংসতার দিকে নিয়ে গেল। যেমন ১৯২২ সালে বর্তমান উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক এক গ্রামের তিন হাজার কৃষকের শোভাযাত্রার উপর পুলিশ নির্মমভাবে গুলি চালায়। এতে কৃষকরা ক্রুদ্ধ হয়ে পুলিশের থানা আক্রমণ করে অগ্নিসংযোগ করলে ২২ জন পুলিশ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। গান্ধীজী এ ঘটনায় অত্যন্ত গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা দেন। সত্যব্রত দত্ত খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ছবি অংকন করে লিখেছেন, "মুসলিম জনগণের সঙ্গে জাতীয় নেতৃত্বের যোগসূত্র স্থাপিত হয় খিলাফতের মাধ্যমেই। আবেদন নিবেদনের পদ্ধতি পরিহার করে খিলাফত ও অসহযোগ ভারতের রাজনীতিকে গণমুখী করে তোলে, রাজনীতিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় অফিসে আদালতে, শিক্ষায়তনে, রাজপথে, মাঠে ও মসজিদে এবং কিছুটা পরিমাণে কলে- কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে। সাময়িকভাবে হলেও হিন্দু মুসলমান ঐক্যের এক অভূতপূর্ব জোয়ার সূচনা করে খিলাফত। অথচ খিলাফত আন্দোলনের এই তাৎপর্যগুলি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকরা অস্বীকার করেন। মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসার ও পরবর্তীকালে দেশবিভাগের জন্য এই আন্দোলনকেই দায়ী করা হয়। বলা হয় এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয়, ব্রিটিশ বিরোধিতা ছিল এর আবরণমাত্র।"[৪৮৮]

[৪৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

[৪৮৮] ড. পঞ্চানন সাহা উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

এরপর দেশে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির পালে হাওয়া দেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেঙ্গল প্যাক্টের মাধ্যমে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, অসহযোগের আন্দোলন দ্বারা স্বাধীনতা আসা সম্ভব নয়। বরং সরকারের ভিতরে থেকেই অধিকার আদায় করতে হবে। এজন্য তিনি আরো কতিপয় সর্বভারতীয় নেতার সঙ্গে মিলে কংগ্রেসের একটি উপদল হিসেবে স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে অধিকাংশ হিন্দু আসন এই পার্টির নেতাগণ পান। এমনকি মুসলমান সদস্যদের সমর্থন আদায় করেন চিত্তরঞ্জন। এসময়ে তিনি তাঁর সহযোগী হিসেবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে পেয়েছিলেন। দূরদর্শী চিত্তরঞ্জন উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দু মুসলিমের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতিত জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব। তাই তিনি স্বরাজ দলের সমর্থন আদায় এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলার মুসলিম নেতাদের সাথে একটি চুক্তি করেন। এটি বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। এ প্যাক্টে মুসলমানদের বড় রকমের ছাড় দেয়া হয়। শতকরা ৫৫টি চাকুরি মুসলমানদের সংরক্ষিত রাখা, তাছাড়া গরু কুরবানী বাধা না দেয়া, মসজিদের কাছে বাজনা না বাজানো ইত্যাদি স্পর্শকাতর বিষয়ও এ চুক্তির অন্তর্ভূক্ত হয়। গোলাম মুরশিদ বলেন,

> "স্বরাজ দল বাস্তবে যেটুকু করেছিলো, তা করেছিলো কলকাতা কর্পোরেশনকে ঘিরে। ১৯২৪ সালে চিত্তরঞ্জন এর প্রথম নির্বাচিত মেয়র হয়ে বলিষ্ঠ কতোগুলো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সুভাষ বসুকে তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। তা ছাড়া, দলের পাঁচজন নেতাকে নিযুক্ত করেন কর্পরেশনের অল্ডারম্যান হিশেবে। খাদিকে তিনি কর্মকর্তাদের আনুষ্ঠানিক পোশাক বলে গ্রহণ করেন। রাস্তাঘাটের নামকরণ করেন দেশীয় কৃতী সন্তানদের নামে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা করেন, তা হলো মুসলমানদের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদে বসান। বিশেষ করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে তিনি নিযুক্ত করেন ডেপুটি মেয়র হিশেবে। এভাবেই সোহরাওয়ার্দির ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি হয়। চিত্তরঞ্জন অন্য একজন মুসলমান নেতাকে নিয়োগ করেন উপ-নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে। মওলানা আকরম খান নিযুক্ত হন অন্যতম অল্ডারম্যান। এভাবে চিত্তরঞ্জন ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের ধারা সাময়িকভাবে থামিয়ে দেন। তবে দেশের রাজনীতিতে বৃহত্তর কোনো ভূমিকা পালন করার আগেই ১৯২৫ সালে জুন মাসে তিনি আকস্মিকভাবে মারা যান মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা বলতে গেলে লোপ পায়। এর ঠিক আগে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মৃত্যুও উদারপন্থীদের দুর্বল করেছিলো।"[৪৮৯]

৫.৩.১০ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের চরম রূপ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এর মৃত্যুতে দেশ গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতাকে হারিয়ে অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হয়। এ সময় সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হিন্দুরা হিন্দু মহাসভার ব্যানারে

[৪৮৯] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৮

সমবেত হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা এগিয়ে আসেন স্যার আবদুর রহিমের নেতৃত্বে। ইংরেজ সরকার তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য চাকরি সংরক্ষণের নীতি ঘোষণা করে। নতুন ব্যবস্থাপক সভায় সর্বস্তরের জনসাধারণের ভোটাধিকার আগের তুলনায় বহু গুনে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়ে হিন্দু ও মুসলিমের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ব্যাপক প্রসার ঘটে। সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরী করে চরম সংঘাত, দাঙ্গা, হানাহানি ও কাটাকাটি।[৪৯০]

১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এদেশের ইতিহাস সাম্প্রদায়িক সংঘাত চরম রূপ লাভ করে। ১৯০৫ এর আগে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রাদায়িক সাহিংসতার ঘটনা ছিল অকল্পনীয়। স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী সময় থেকে রাজনীতির প্রয়োজনে ধর্মের ব্যবহারে সৃষ্টি হয় দেশ ব্যাপী সাম্প্রদায়িক সংঘাত। মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গের মফস্বলে এসব দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। এসব ঘটনা বিশেষভাবে ঘটেছে ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং পরে খুব বড় আকারে কুমিল্লা-নোয়াখালিতে। এদেশের মুসলিম প্রধান এলাকাগুলোতে মানুষের বিক্ষোভ ছিল জমিদার, মহাজন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সকল কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ শোষক শ্রেণির উপর বিক্ষুব্ধ ছিল। এই বিভাজনটা ছিল আড়াআড়ি। বৈষম্য ভূলে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে পড়লো।[৪৯১]

সাইমন কমিশনের রিপোর্টে এসেছে যে, ১৯২২ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে সারা ভারতে ১১২ টি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে ছিল। সেপ্টেম্বর ১৯২৪ সালের কোহাট দাঙ্গাতে মৃত হল ১৫৫ জন ১৯২৬ সালে কলকাতার দাঙ্গাতে নিহত হয় ১৩৮ জন। সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণ করে জওহরলাল নেহেরু লিখলেন, “It was fight between the forces of nationalim and those of law and order of communalism reinforced by corruption, terrorism and false-hood. Religion in danger’ was the way of the oppenents of the congress, both Hindus and Muslim.” [৪৯২]

১৯২৯ থেকে ১৯৩১ সালে অর্থনৈতিক টানা পোড়েন ও ধর্মীয় উন্মাদনায় কলকাতা, পাবনা, পটুয়াখালি, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ছোট বড় অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। ১৯৩৪ সালে ময়মনসিংহে শাসক সে সময় এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

> “ …What we are witnessing is the begining of the break-up of social and economic supremacy of the Hindu higher castes. The Mohammedans realise that where mere mumbers count that must necessarly be a power ... a particular grievance which offen

---

[৪৯০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

[৪৯১] অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

[৪৯২] ড. পঞ্চানন সাহা উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

hears is the refusal of must Hindu landlords and their amla to allow even well-to-do Mohamedan tenates the courtesy of seat."[৪৯৩]

সে সময়কার সংবাদপত্রসমূহেও এসব দাঙ্গা ফাসাদের কারণ এবং প্রতিকার নিয়ে অনেক পর্যালোচনা হয়েছে। ১৯২৬ সালে 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকা লিখেছে,

> "সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে হিন্দু-মুসলমান কলহ বিদ্বেষ ও বিরোধের [...] নির্ব্বাপিত কাল-অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে [...] মি. গান্ধী উপবাস করিয়া, মি. মহম্মদ আলি ধর্মকর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া এবং মি. দাস চুক্তি করিয়া এই কলহের আগুন নিভাইতে চান, কিন্তু এই বিদ্বেষ ও বিরোধের মূল উৎস কোথায় এবং কোন পন্থা অবলম্বন করিলে ঐ বিবাদ-বিসম্বাদ স্থায়ীভাবে চিরদিনের মত দূর হইতে পারে, তাহা বুঝিবার যোগ্যতা এবং বলিবার সৎসাহস ইঁহাদের কাহারও নাই। ইঁহারা পরস্পরের নাম যোগাইয়া খবরের কাগজের সস্তা বাহবা এবং বস্তাভরা সুনাম কিনিতেই ব্যস্ত। সুতরাং জাতির ব্যথা কেমন করিয়া ইহাদের অন্তরে স্থান পাইবে?"[৪৯৪]

৫.৩.১১ রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজন

বিংশ শতাব্দীর উষালগ্ন থেকে রাষ্ট্রীয় ভাবে সৃষ্টি করা সাম্প্রদায়িক বিভাজন এদেশে সাম্প্রদায়িকতার চরম পর্যায়ে উপনীত হওয়ার অন্যতম কারণ। আর নেপথ্যে এর পটভূমি সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময় থেকে। এর পূর্বে ইংরেজদের প্রতি মুসলমান এবং হিন্দুদের মনোভাব যেরূপ ছিল বিদ্রোহের পর তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশরা রাষ্ট্রীয় ভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরী করে। এক্ষেত্রে কথা সাহিত্যিক বদরুদ্দীন উমরের বিশ্লেষণী মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন,

> "ইংরেজদের কাছে হিন্দুসমাজ ছিল সহযোগিতা-প্রার্থী। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর হিন্দু সমাজের একাংশ হল ইংরেজ বিরোধী। মুসলমান সমাজ এক শতাব্দী ধরে নিজেকে রেখেছিল বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর তারাই আবার এগিয়ে এল ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করতে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় হিন্দু- মুসলমানের এই স্বার্থগত সংঘর্ষকে ইংরেজা উপেক্ষা করল না। উপরন্তু নিজেদের সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এই বিভেদকে স্বীকৃতি দিয়ে অনেক কৌশলে একেকে অন্যের বিরুদ্ধে তারা স্থাপন করল। এ ভেদনীতির মুনাফা নিয়ে ইংরেজদের হিসাবে কোন ভুল ছিল না। ভারতীয় সমাজ-জীবনে সিপাহী বিদ্রোহের পর যে সম্প্রদায়- চেতনা দেখা দিল সে চেতনা জাতীয় চেতনার মধ্যে সৃষ্টি করল অনেক বিভ্রান্তি। সুযোগ-সুবিধা হিসাব-নিকাশের রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে অবতীর্ণ হল দুই ভারতবর্ষ।"[৪৯৫]

---

[৪৯৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

[৪৯৪] অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী উদ্ধৃত , প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

[৪৯৫] বদরুদ্দীন উমর, *সাম্প্রদায়িকতা*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, জুন ২০১১), পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

সিপাহী বিদ্রোহের পরের দশকগুলোতে হিন্দুদের ইংরেজ শাসনের প্রতি মোহমুক্তি শুরু হয়। পরাধীনতা থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে তাদের মধ্যে এক জাতীয়তাবাদী শক্তি গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার এই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে মুসলিম প্রীতির পথ বেছে নেয়। তারা মুসলমানদেরকে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী পদসমূহে সর্বোপরি অর্থনৈতিক ভাবে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করতে আরম্ভ করে। এ সময় ইংরেজদের পরিচালিত কাগজগুলোতে মুসলমানদের অনগ্রসরতার চিত্র তুলে ধরা হয়। ১৮৭১ সালে এক তথ্যে সরকারী দায়িত্বশীল পদে হিন্দু ও মুসলমানের তুলনার চিত্র ছিল নিম্নরূপ:[৪৯৬]

পদের নাম	হিন্দু	মুসলমান
১। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১১৩	৩
২। আয়কর বিভাগ	৪৩	৬
৩। রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	২৫	২
৪। ছোট আদালতের জজ	২৫	৮
৫। মুন্সেফ	১৭৮	৩৭
৬। জনকল্যাণ বিভাগ (একাউন্টস)	৫৪	৬
৭। (অন্যান্য)	১২৫	৪
	মোট ৫৬৩ জন	৯৩ জন

ব্রিটিশ শাসক প্রবর্তিত এই বিভেদনীতিতে অগ্রজ ভূমিকা পালন করেন সিভিলিয়ান উইলিয়াম উইলসন হান্টার এবং আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেক। হান্টার ১৮৭০ সালে 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' নামে একটি গ্রন্থ লিখে মুসলমানদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মুসলমানদেরকে ইংরেজদের পক্ষে নিয়ে আসা। এ গ্রন্থে তিনি ভারতের মুসলমানদের দুর্দশা ও দুরাবস্থার বর্ণনা ও পর্যালোচনা করে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান তৎকালে ছোট বড় যাবতীয় পদসমূহ প্রায় সবই হিন্দুদের অধিকারে। অর্থ উপার্জনের সব ক্ষেত্রেই হিন্দুদের প্রাধান্য বিরাজমান। এমতাবস্থায় মুসলমানরা ইংরেজদের বিরোধিতা করলে তা তাদেরই ক্ষতির কারণ হবে। এরপর তিনি তাদের দুরাবস্থা ও পশ্চাৎপদতা নির্মূলে সরকারের কাছে কিছু প্রস্তাব রাখেন।

এর ফলে ইংরেজ সরকার শিক্ষিত মুসলিম সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আস্থা অর্জন করেন। মুসলমানরা ভাবতে শুরু করে সরকারের সাথে সহযোগিতা মূলক নীতিই তাদের উন্নয়নের পথকে প্রসারিত করবে। মুসলমানদের এই মনোভাবকে কাজে লাগান থিওডোর বেক। তিনি স্যার সৈয়দ

[৪৯৬] ড. পঞ্চানন সাহা উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

আহমদকে মুসলমান জাগরণের কাজে প্রভাবিত করেন। আর বাংলায় মুসলমানদের পশ্চাদমূখীতা দূরীকরণের দায়িত্বে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন নবাব আবদুল লতিফ এবং সৈয়দ আমীর আলী।[৪৯৭] ১৮৮৫ সালে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জন্ম নেয়া কংগ্রেস তার মূল আর্দশ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে ইংরেজরা এ অবস্থা থেকে সুযোগ গ্রহণ করে।আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেক স্যার সৈয়দকে মুসলমান সমাজের মধ্যে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে প্রবুদ্ধ করে ১৮৯০ সালের ৩০ মার্চ এক চিঠিতে লিখেন, "I think it very necessary for us to prove to the people of England in the most unmistakable way that the Mohammedans are opposed to it."[৪৯৮] এছাড়া ব্রিটিশ শাসক কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যেই কংগ্রেসের সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। ১৯৯০ সালে লর্ড কার্জন প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন, "The Congress is tottering to its fall and one of my great ambitions, while in India, is to assist it to a peaceful demise." [৪৯৯]

এরপর মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে ইংরেজরা তাদের বিভেদ নীতিকে স্পষ্ট করে তুলল। ১৯০৬ সালে ১ অক্টোবর সিমলা ডেপুটেশনে মুসলমানদের পক্ষে আগা খান মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী করলে বড় লাট লর্ড মিন্টো এতে পরিপূর্ণ সমর্থন করেন। এ বছরেই ৩১ ডিসেম্বর মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবী দাওয়া আদায়ের পথ পৃথক হয়ে যায়। এ সম্পর্কে ১৯০৭ সালের ২২ জানুয়ারী স্টেট্সম্যান পত্রিকাতে লিখা হল,

> "It is evidently still necessary to protest against the systematic attempts that are being made to set Hindus and Mussalmans at variance each other. The most recent occasion that has been turned to this sinister purpose is the Educational Conference that was held at Dhaka three weeks ago and was followed by a meeting at which an all India Muslim League was inaugurated." (22 January-1907)
>
> "...three is an important difference between the awakening activities of the Indian Moslem community, educational and

[৪৯৭] ড. পঞ্চানন সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
[৪৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
[৪৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

political and sectarian organisations designed to carry an anti-Hindu propaganda.” (22 January-1907) [৫০০]

১৯০৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ সমর্থনে হিন্দুদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে ‘হিন্দু মহাসভার’ও আত্মপ্রকাশ ঘটে। ইংরেজ সরকার এই বিভেদ নীতিকে পরিপূর্ণ রূপ দেয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯০৯ সালে সরকার সিমলা ডেপুটেশনের দাবী মেনে নিয়ে মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের অধীনে পৃথক নির্বাচনের ঘোষণা করেন। এর ফলে জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রামের পথ রুদ্ধ হল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নিজেদের ও দেশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে অন্য সম্প্রদায়ের সমালোচনা ও বিরোধিতার পথই বেছে নিল। ফলে এ দেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকল।

৫.৩.১২ দ্বি জাতি তত্ত্ব

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক ঘোষিত দ্বিজাতি তত্ত্ব বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্য মন্ডিত একটি ঘটনা। এর মাধ্যমে তিনিই প্রথম ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন।

রাষ্ট্রীয়ভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু হবার পর উভয় সম্প্রদায় আরো বেশি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হল। নিজস্ব জাতিয়তাবোধ হল জাগ্রত। তাদের কাছে ভারতীয় পরিচয়ের বাইরে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই নামে ধর্মীয় পরিচয়ই প্রাধান্য পেল। গড়ে ওঠল দ্বিজাতি তত্ত্ব। ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মীয় দিক থেকে জাতিগত এই পার্থক্য উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে দৃঢ় করল। হিন্দু-মুসলমান এবং বিশেষ করে ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে একে ইচ্ছেমত ব্যবহার করল। ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ, রেষারেষি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখমের মাধ্যমে পারস্পরিক বিরোধ ক্রমশঃ ধাবিত হল চরম রূপ পরিগ্রহের দিকে। হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অসম্ভাব্যতা অনুধাবিত হল। এর উপর ভিত্তি করে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেল। এটি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের এক জাতিতত্ত্বের প্রতিক্রিয়া। নূর মোহাম্মদ রচিত ‘বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা’ শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় বদরুদ্দীন উমর দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তি সম্পর্কে লিখেছেন,

> “একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, হিন্দু পুঁজি মালিকদের এবং ওপর তলার লোকদের এক জাতি তত্ত্ব এবং জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বই ছিল না। উপরন্তু দ্বিজাতি তত্ত্বের দ্বারা জিন্নাহ হিন্দুদের জাতি তত্ত্বকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। হিন্দুরা এক জাতি খাড়া করে মুসলমানদেরকে জাতি

[৫০০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

হিসাবে বাইরে ফেলার পর জিন্নাহ সেই বাইরে পড়াদেরকেই একটি পৃথক জাতি বলে শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন। এভাবে দ্বিজাতি তত্ত্ব খাড়া করবার কারণে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা যেভাবে জিন্নাহকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে নিজেদের অসাম্প্রদায়িকতা নিয়ে চল্লিশের দশকে মাতামাতি করেছিলেন সেটা রীতিমত বিস্ময়কর। নিজেদের জাতিতত্ত্ব খাড়া করে ভারতকে হিন্দুদের দেশ এবং মুসলমানদেরকে বিদেশী আখ্যা দিয়ে যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভাবনা ঊনিশ শতক থেকে অগ্রসর হিন্দু সমাজে বিকশিত হয়েছিল পিছিয়ে পড়া মুসলমানরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক অবস্থান জোরদার করে তার মোকাবেলা করতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।”[৫০১]

এর প্রভাব পড়েছিল পূর্ব বঙ্গেও। বাঙ্গালী মুসলমানরা ততদিন উপলব্ধি করতে পেরেছে তারা বাঙালী হিন্দুদের সাথে শত শত বছর ধরে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে চলেছিল তার যবনিকাপাত করা হয়েছে। হঠাৎ করেই বাঙালী হিন্দুরা তাদেরকে পর করে দিয়ে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতীয় হিন্দুদের স্বার্থের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এ অবস্থায় পূর্ববঙ্গে আবহমান কাল থেকে পাশাপাশি বসবাস করা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চরম আকার ধারণ করে এক অনাকাঙ্খিত ঘৃণ্য পরিবেশের সৃষ্টি করে। এর প্রভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলমান গোষ্ঠী হাজার হাজার মাইল দূরের মুসলমানদের সাথে এক জাতি গঠনে পাকিস্তানের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হল।[৫০২]

৫.৩.১৩ হিন্দু-মুসলিম সমন্বিত আন্দোলন ও দেশ বিভাগ

পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংঘাত রেষারেষি সত্ত্বেও চল্লিশের দশকে দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশ থেকে বৃটিশদের বিতাড়ণের উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় এক পতাকাতলে সমবেত হয়। এমনকি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টিও এক সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯৪২ এর ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন, এরপর নেতাজী সুভাষ বসু গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ১৯৪৬ সালে ক্যাপ্টেন রশীদ আলীর মুক্তির দাবী, নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, শ্রমিক শ্রেণীর রাজপথে অবস্থান, ডাক ও রেলের কর্মচারীদের ধর্মঘট, তীব্র ছাত্র আন্দোলন সব মিলিয়ে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে সে সময় বিশেষ করে ১৯৪৫ এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজনৈতিক অঙ্গনে যে অস্থিরতা বিরাজমান ছিল তাতে এদেশের আপামর জনসাধারণ ধর্মীয় পরিচয় ভুলে এক হয়ে গিয়েছিলেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ সম্পর্কে লিখেছেন,

“যেন সেই ১৮৫৭ আবার ফিরে এসেছে, নতুন চেহারা নিয়ে। এই যে আসাম্প্রদায়িক জন ঐক্য, জনগণের মধ্যে প্রবল ব্রিটিশবিরোধী ক্ষোভ এবং বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আগ্রহ, এসব

---

[৫০১] নূর মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

[৫০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ শাসকদের পছন্দ হবার কথা নয়, পছন্দ হয় নি কংগ্রেস এবং লীগেরও। ব্রিটিশ শাসক ভারত ছেড়ে চলে যাবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে এই রকমের সম্ভাবনা কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের মধ্যেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব তৈরী করেছে, উভয়েই ব্যস্ত ক্ষমতার অংশলাভের ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে; কে কতটা পাবে তার হিসাবনিকাশ এবং সেই লক্ষ্যে দরকষাকষিটাই ছিল তখন তাদের প্রধান কাজ, পিতার মৃত্যু আসন্ন দেখলে উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটে। এই পরিস্থিতিতে সরকার সাধারণ নির্বাচন দিয়ে দিলো। তাতে কংগ্রেস, লীগ এবং সরকার, বিবদমান এই তিন পক্ষেরই সুবিধা হলো- কেননা জনগণের বিক্ষোভ প্রবেশ করলো ভোট-কাড়াকাড়ির চোরাগলিতে। নির্বাচনের ফলাফল যেমনটা ধারণা করা গিয়েছিল সেই রকমেরই হলো। লীগ পেলো মুসলিম ভোটারদের শতকরা ৯৩ ভাগ ভোট, হিন্দুদের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ফল লাভও হলো ওই একই রকমের। ১৯৩৭এর নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির ফজলুল হক মুসলিম আসনগুলোর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, ১৯৪৬এর এই নির্বাচনে তাঁর দল পেলো মাত্র পাঁচটি আসন, রাজনীতি থেকে তিনি প্রায় নির্বাসিতই হয়ে গেলেন। ওদিকে ঘোরতর সাম্প্রদায়িক, এবং জিন্নাহর চাইতেও অধিক মাত্রায় দ্বিজাতি তত্ত্বে-দীক্ষিত হিন্দু মহাসভা একটিও সাধারণ আসন পেলো না, দলের প্রধান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংরক্ষিত আসনটি থেকে। অর্থাৎ কি না, প্রমাণিত হলো যে, লীগের পাকিস্তান দাবীর বাইরে মুসলিম ভোটাররা অন্যকিছু শুনতে রাজি নয়; ঠিক তেমনি হিন্দু ভোটাররা জানিয়ে দিল যে, হিন্দু মহাসভাকেও আলাদা করে ভোট দেবার প্রয়োজন নেই, কেননা মহাসভার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দায়িত্ব ততদিনে কংগ্রেসই নিয়ে নিয়েছে। নির্বাচন এভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে আরো পরিষ্কার করে দিল; হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা ক্ষীণতর হয়ে এলো।" [৫০৩]

এরই প্রেক্ষিতে ১৬ আগষ্ট মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবীতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করে। এই দিবসের কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে কলকাতায় নজীরবিহীন দাঙ্গার সুত্রপাত হয়। এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি, কুমিল্লা, বিহার ও চট্টগ্রামে। আরো বিস্তৃত হয় শাসক শ্রেনির হৃদয়ে। ফলে তারা পরবর্তী এক বছরের মধ্যে এই দেশকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দুভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে এদেশে তাদের রাজত্বের অবসান ঘটায়।

৫.৪ পাকিস্তানী শাসনামলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে এদেশে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেলো। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনের পরবর্তী সময়েই ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা দিলেন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার স্থান দখল করে নিল ভাষাভিত্তিক আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনে বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলিমের সমন্বিত অংশগ্রহণে বাঙালী

[৫০৩] অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮১

Dhaka University Institutional Repository

জাতি এক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির সূত্রপাত ঘটায়। মূলত ৫২এর ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালী জাতিসত্তা হিসেবে নিজেকে খুঁজে পাবার প্রথম সফল প্রয়াস। ১৯৪৭ এ যে জনগোষ্ঠী নিজের ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাকে অস্বীকার করে ধর্মীয় ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তারাই আত্মবিকাশের প্রয়োজনে নিজেদের ভুল সংশোধনের কার্যক্রম শুরু করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে। তারা বাঙালীদের উপর উর্দুকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইলে বাঙালীরা ভাষার ভিত্তিতে স্বজাত্যবোধ উপলব্ধি করতে শুরু করে এবং ১৯৫২ সালে আত্মদানের মাধ্যমে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাদের এই আত্মদান পাকিস্তানের ধর্মীয় পরিচয় ভেঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক জাতি প্রতিষ্ঠা করল।[৫০৪]

এরপর ৫৪ এর নির্বাচন, কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভা, যুক্ত নির্বাচনের বিধান সম্বলিত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা, এবং সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে সমগ্র পাকিস্তানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব খর্ব হয়ে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল হল। এজন্যেই দেখা যায় ১৯৪৬ ও ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলিম লীগের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সাধারণ মানুষের একাংশ যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, ১৯৬৪ সালে সাধারণ বাঙালি মুসলমান সেভাব অংশগ্রহণ করেনি।

তবে ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে তারা পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে রক্ষা করা। এ যুদ্ধের প্রভাবে পাকিস্তানে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুপস্থিত বা বিভক্ত পরিবারের হিন্দুদের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে 'শত্রু সম্পত্তি অর্ডিন্যান্স' জারি করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।[৫০৫]

অবশ্য দেশভাগের আগে থেকেই বিত্তশালী হিন্দুদের অধিকাংশ পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে পশ্চিম বঙ্গে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। ১৯৪৮ এবং ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার পর এই হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৪ এর দাঙ্গার পর তা আবার ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশেও হিন্দুদের দেশত্যাগের এই প্রবণতা অব্যাহত থাক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সুত্রে জানা যায়, দেশ ভাগের আগে পূর্ব বঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা ছিল ২৮ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে এই হার ক্রমশঃ আরো হ্রাস পায়। ১৯৫১, ১৯৬১ এবং ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই হার ছিল যথাক্রমে ২২%, ১৮.৫% এবং ১৩.৫% এতঃপর ১৯৮১, ১৯৯১ এবং ২০০১ সালে ক্রমহ্রাসমান হারে এর অনুপাত দাঁড়ায় যথাক্রমে ১২.১% ১০.৫% এবং ৯.২%।[৫০৬]

সাম্প্রদায়িকতার অবস্থা যখন এরূপ তখন আপামর জনসাধারণের চিত্র ভিন্ন। গোলাম মুরশিদের লেখায় এই চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন,

---

৫০৪ শামসুজ্জোহা মানিক, *ধর্ম ও শ্রেনীতন্ত্রের যাঁতাকলে বাঙালী জাতি*, (ঢাকা: ব-দ্বীপ প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১০), পৃ. ৪৬
৫০৫ নুহ-উল-আলম লেনিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯
৫০৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

“.. দেশ বিভাগের পরে অবস্থা উভয় বাংলায় নাটকীয়ভাবে বদলে যেতে আরম্ভ করে। পূর্ববাংলার অনেকে বর্ধিত সুযোগ পেয়ে হিন্দু প্রতিবেশীদের সমকক্ষতা অর্জন করেন। তা ছাড়া হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার ঘটনা-না থাকায় আগেকার বিদ্বেষ এবং ছোঁয়াছুঁয়ির তীব্রতা খানিকটা হ্রাস পেয়েছিলো। যদিও মুসলমানদের অনেকে আবার প্রতিবেশী হিন্দুদের চোখ রাঙিয়ে এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে ভিটেছাড়া করার মনেভাবও দেখাতে শুরু করেন। মোটকথা, মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেলো, আবার কমেও গেলো। চাকরি এবং ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত কোটা থাকায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিলো, দেশবিভাগের ফলে তাও রাতারাতি হ্রাস পায় - সংসার ভাগ হলে ভাই-এ ভাই-এ ঝগড়া যেমন কমে যায়, তেমনি।”[৫০৭]

সাধারণ জনগণ সবসময়ই থেকেছে দাঙ্গা সহিংসতার বিপরীতে। তাদের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন ছিল অটুট। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময়ে বরিশালের আগরপুর গ্রামে একজন মুসলমান ব্যক্তি নিহত হয়েছিল।

দেশ বিভাগের পর সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই দেশে মন মানসিকতার পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। মুসলমান বাঙ্গালী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতে থাকে। অমুসলিম কবি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসদন দত্ত, শরৎচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিরা তাদের প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হলেও এদেশে ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিমে সম্প্রীতির বন্ধন লক্ষ্যণীয়। আর এ প্রেক্ষাপট তৈরী করে দেয় পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণমূলক শাসন এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।[৫০৮]

৫.৫ স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

৫.৫.১ যুদ্ধকালীন সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

বাংলাদেশের হাজার বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইতিহাসে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এদেশের নির্যাতিত-নিপীড়ত হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত অংশগ্রহণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। পঁচিশ বছর পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলিম নামধারী শাসকগোষ্ঠী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণকে যেভাবে শাসন ও শোষণ করেছে তাতে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তথা আপামর জনসাধারণ ধর্মীয় পরিচয়ের ভেদাভেদ ভুলে স্বাধীনতার প্রশ্নে এক হয়ে গিয়েছিল। পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার লাল সূর্য। এছাড়া আপামর

---

[৫০৭] গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮
[৫০৮] প্রাগুক্ত

জনসাধারণের মানসে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অবস্থান ছিল শূন্য। বরং সাধারণ মানুষ যুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। ধর্মীয় পরিচয় জানা ছিল অত্যন্ত গৌণ বিষয়। হিন্দু মুসলমান একই রান্না খেয়েছে। একই সাথে যুদ্ধ করেছে। কেউ ধর্মনাশের প্রশ্ন তোলেনি। এ সময় এদেশের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধন লক্ষ্যনীয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রচনাবলী, সাহিতক চলচ্চিত্রসমূহ এর প্রমাণ বহন করে। নন্দিত কথা সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ুন আহমেদের 'শ্যামল ছায়া' নামক চলচ্চিত্রে দেখা যায় যুদ্ধের সময় একটি নৌকায় হিন্দু মুসলিম সবাই একসাথে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যাত্রা করেছে। আবার বিপদের সময়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সাহায্য সহাযাগিতার হাতকে প্রশস্ত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 'বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ' এর চেয়ারম্যান বীর উত্তম সি আর দত্ত লিখেছেন,

> "এ দেশ কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের জন্যে স্বাধীন হয়নি। শুধু হিন্দুদের বা শুধু মুসলমানদের অবদানে এ দেশ স্বাধীন হয়নি। সবার অধিকার আদায় করতেই আমরা নিজেদের স্বাধীন করেছি। বাংলার হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সবার অবদানেই লাল সূর্যটা ধরা দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় হিন্দুরা মুসলমানদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। আবার হিন্দুরা মুসলমান মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। আমরা যে যেভাবে পেরেছি, সেভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছি। মনে পড়ছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা একদিন রাতে এক মুসলমান বাড়িতে বেলা দুইটার সময় গিয়েছিলাম। বাড়ির কর্তা আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমরা খেয়েছি কি না। আমরা বলি, না। পরে দেখি ধোঁয়া ওঠা ভাত, গরম ডাল হাজির। তখন কিন্তু ওই বাড়ির মালিক আমাদের একবারও জিজ্ঞেস করেননি, তোমরা কি হিন্দু, না মুসলমান?"[৫০৯]

একাত্তরে এদেশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনা পরিস্ফুট না হলেও এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্মম নিপীড়ন নির্যাতন করা হয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীরা তাদেরকে স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি মনে করেই তা করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের ধর্ম মুখ্য বিষয় ছিল না, কারণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বহু মুসলিম নরনারীকেও নির্যাতন নিস্পেষণে জর্জরিত করেছে। দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্য ধর্মযুদ্ধ ছিল না। বরং তাদের যুদ্ধ ছিল ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে মুক্তিকামী সকল জনতার বিরুদ্ধে।[৫১০]

বলা যায়, ১৯৭১ এর যুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ছিল না। এদেশের হিন্দু, মুসলিম জনগোষ্ঠী আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অপর দিকে পাক-বাহিনী এদেশের জনতার দাবী আদায়ের কণ্ঠকে চিরতরে নিঃশেষ করার অভিপ্রায়ে অস্ত্র ধরেছিল। তাদের চেতনায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ছিল অনুপস্থিত।

---

[৫০৯] দৈনিক প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০১২

[৫১০] ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, *ইসলাম, মুসলমান ও সাম্প্রদায়িকতা*, (ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৫), পৃ. ৪৩

৫.৫.২ ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা

ধর্মের অপব্যবহার বিশ্বে ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্ম দিয়েছে। জার শাসিত রাশিয়ায় খ্রীষ্টান চার্চের সীমানা ছাড়ানো প্রভাব প্রতিপত্তি ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে অষ্টাদশ শতকে মার্ক্সীয় বস্তুবাদী দর্শন ধর্মনিরপেক্ষতার সূত্রপাত ঘটায়। বিংশ শতাব্দিতে এই উপমহাদেশের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব সংঘাতে মর্মাহত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের উপর এর প্রভাব পড়ে। শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের উপর পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছে। হারাতে হয়েছে অসংখ্য জীবন। তাই শান্তি প্রিয় ও মানবতাবাদী মানুষ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতার দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন এবং স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করে। ষাটের দশকে এদেশের তরুণ সমাজ সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতার দাবী তোলে। যার ফলে বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের জন্মলগ্নেই ধর্মনিরপেক্ষ গণপ্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হয় এবং বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি রূপে ধর্মনিরপেক্ষতা বিশিষ্ট স্থান দখল করে নেয়।[৫১১]

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা রোধে ধর্মনিরপেক্ষতার গ্রহণযোগ্যতাকে ব্যাখ্যা করে ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধান অনুমোদনের দিন গণপরিষদে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ভাষণ দেন তিনি বলেন,

"..... ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা হয়। বাংলার সাড়ে ৭ কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করে রাখতে চাই না এবং করব না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দেয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম করবে তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে নিয়ে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন ব্যভিচার- এই বাংলাদেশের মাটিতে এসব চলছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না।"[৫১২]

স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যাবহিত পরে শাসক শ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা যুগপৎ ছিল। কারণ, ধর্ম বিশ্বাস নির্বিশেষে মুসলমান হিন্দু, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সকল মাধ্যমে এ দেশের জনগণের মানসে যে বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল সেখানে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব ছিল।

---

[৫১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২

[৫১২] শেখ মুজিবুর রহমান, গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণ ১৯৭২, উদ্বৃত বাঙালির কণ্ঠ, মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ১৯৯৮, পৃ. ৩৪৬-৩৪৮

৫.৫.৩ সাম্প্রদায়িকতার প্রচারণা

আবহমান কাল থেকে এদেশের সাধারণ মানুষের রয়েছে ধর্মের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা। এই ধর্মভীরু জনগোষ্ঠী ধর্মের বিরোধিতার চেয়ে ধর্মের কথা শুনতেই বেশী পছন্দ করে। তাই রাষ্ট্রীয় ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও এদেশের শাসকগোষ্ঠী জনগণের ধর্মীয় আবেগকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করেছে। এক্ষেত্রে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন হওয়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। এর ফলে বঞ্চিত ও মর্মাহত হয় সংখ্যালঘু হিন্দু,বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনতা। অঙ্কুরিত হয় শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্টি সাম্প্রদায়িক প্রচারণা। স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার মুসলিম দেশসমূহের আন্তর্জাতিক সংগঠন OIC এর সদস্যপদ গ্রহণ করে। দেশে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখে। এ সময়েই ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এসময় সাম্প্রদায়িক প্রচারণা সত্ত্বেও সাধারণ জনতার মধ্যে ধর্মীয় বিভেদের কারণে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ বিরল। ১৯৭৫ সালে একটি নির্মম নৃশংস সামরিক অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হন। এরপর অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক সামরিক সামাজিক অভ্যুত্থানে শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি সমাজের সকল ধর্ম ও ভাষাভাষী মানুষকে অখণ্ড সত্ত্বায় বিকাশিত করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী মতবাদ। গঠন করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। এই দলের ইসলাম পন্থী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ইসলাম ধর্মের অন্যতম সিম্বল 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' যুক্ত করার মাধ্যমে। ফলে সঙ্গত কারণেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাজের সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায় অপরাপর সংখ্যালঘু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উপর অধিষ্ঠিত হয় বিশেষ মর্যাদায়। দেশে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করে গড়ে ওঠে নানা রাজনৈতিক সংগঠন।

এরপর ১৯৮৮ সালে জেনারেল হোসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদার অভিষিক্ত করে তা রাষ্ট্রীয় সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করেন। এভাবে এদেশের মুসলিম সমাজের রাষ্ট্রীয় অবস্থান সুসংহত হয়। আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ নিজেদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হয়। একই বছরে গড়ে তোলে হিন্দু বৌদ্ধ- খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ। ১৯৯০ সালে জেনারেল এরশাদ সরকারের পতন হলে বর্তমান সময় পর্যন্ত বি এন পি এবং আওয়ামী লীগ পালাক্রমে ক্ষমতাসীন হয় এবং সাথে সাথে চলতে থাকে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা।[৫১৩]

---

[৫১৩] নুরুল কবীর, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর ধর্মান্ধ হামলা: রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক অধঃপতন ও নিরাময় প্রসঙ্গে, *রামু সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সংকলন*, সম্পাদক ব্যারিষ্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া, (ঢাকা: দৃক প্রকাশন, মে ২০১৩ খ্রী.), পৃ. ৩৪৮-৩৫১

৫.৫.৪ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা

রাজনৈতিক ভাবে বিশেষ পরিচর্যা পেয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষটি এদেশের মাটি ও মানুষের মাঝে পরিপুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠার সুযোগ পায়। স্বার্থান্বেষী মহল এ সুযোগের সদ্ব্যবহার (?) করতে সচেষ্ট থেকেছে সব সময়। এরই প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার পর থেকে সাধারণ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ বিভিন্ন সময়ে সহিংসতার শিকার হয়েছে। এর নজীরও একেবারে কম নয়। এর একটি ছোট্ট চিত্র তুলে ধরেছেন সাংবাদিক সুশীল বড়ুয়া। তিনি লিখেছেন,"মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর গোলার আঘাতে ঐতিহ্যবাহী রমনা কালীমন্দির ধ্বংস হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হিন্দু সম্প্রদায় এই ভাঙ্গা মন্দিরে পূজা করেছিল। পরে তৎকালীন সরকারপ্রধানের নির্দেশে গাজী গোলাম মোস্তফা ও সুধাংশু শেখর হালদারের নেতৃত্বে মন্দিরটি বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে স্বাধীন দেশে প্রথম দুর্গা পূজা চলাকালে অষ্টমী পূজার দিন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত প্রতিটি পূজামণ্ডপে হামলা ও প্রতিমা ভাঙার ঘটনা ঘটে একই সময়ে। হামলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় দলীয় একটি পত্রিকা অফিসে এক বৈঠকে। সেই বৈঠকে ঠাটারি বাজারের মন্টু পোদ্দারও ছিলেন। মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য মতে, ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এক হাজার ৭০০ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়েছে।" [৫১৪] ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন নূরুল কবীর তাঁর নিবন্ধে। যেমন,

"<u>২০০৩ সালের নভেম্বর</u>। মধ্যরাত। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি উপজেলার সাচিনপুর গ্রাম। ১২ জন নারী-পুরুষ ও শিশুর একটি হিন্দু পরিবার নিজেদের দোতলা মাটির ঘরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় একদল দুর্বৃত্ত ওই বাড়িতে হামলা চালায়। হামলা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য অসহায় মানুষগুলো ঘরের ভেতর থেকে দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। দুর্বৃত্তরা তখন পুরো বাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। অসহায় নারী-পুরুষের আর্তচিৎকারে আশ-পাশের মানুষ বেরিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা কয়েক রাউন্ড বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে রাতের অন্ধকারে অন্তর্ধান করে। ইতোমধ্যে, পরিবারটির একজন সদস্য, বিমল শীল ছাড়া বাকি সবাই পুড়ে কয়লায় পরিণত হয়ে যায়। বিমল অগ্নদগ্ধ অবস্থায় জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। আহত অবস্থায় বেঁচে যাওয়া বিমল শীলের কল্যাণে আমরা জানতে পারি যে, আক্রমণকারী দুর্বৃত্তরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্য। আর এই পাশবিক হত্যাযজ্ঞের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল হিন্দু পরিবারটির জমি-জিরাৎ আত্মসাৎ করার দানবীয় লোভ।

<u>২০০৩ সালের অক্টোবর।</u> জামালপুর জেলার ইটাইল ইউনিয়নের মীর্জাপুর গ্রামের একটি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী পরিবার নানান ধরনের নিপীড়ন ও হয়রানির শিকার হয়ে আসছিল। এক পর্যায়ে খ্রিষ্টান পরিবারটির ৪.৫ একর কৃষিজমি জবরদখল হয়ে যায়। অন্যের জমি অন্যায়ভাবে জবরদখলকারী

---

[৫১৪] রামু ট্র্যাজেডির ২৪ ঘন্টা, *সুশীল বড়ুয়া*, নয়া দিগন্ত, ৬ অক্টোবর ২০১৫

দুর্বৃত্তটি স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন প্রভাবশালী লোক, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর।পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইন সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ের জমির উপর হামলে পড়ে এবং বৌদ্ধ বিহারের জমি জবরদখল করে নেয়। দখলকারী দুর্বৃত্তরা আবারো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্য এবং তৎকালীন সরকারি দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

একই বছরে সংঘটিত উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সদস্যগণ নানান মাত্রায় আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রমণকারীরা অভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্য এবং সমাজে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। স্পষ্টতই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনায় একটি অভিন্ন প্যাটার্ন রয়েছে। প্রথমত,তিনটে ঘটনার পেছনেই সক্রিয় রয়েছে স্থাবর সম্পত্তি, বিশেষত জমিজমা জবরদখল করার অন্যায় আকাঙ্খা। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট লোভী হামলাকারী ব্যক্তিবর্গ তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী স্থানীয় সদস্য।[৫১৫]

এ সমস্ত ঘটনাবলীর প্রত্যেকটিতেই ব্যক্তি বিশেষের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য ছিল। সাম্প্রদায়িকতার ধোঁয়া তুলে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করা। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনা সংগঠিত হয়েছে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কক্সবাজার জেলার রামু ও টেকনাফ উপজেলায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের উগ্র, উচ্ছৃংখল একটি অংশ সে সময় যে নারকীয় তাণ্ডব চালায় তা নজীরবিহীন। তারা হাজার বছরের বাঙালি সভ্যতার ঐতিহ্য বৌদ্ধ সভ্যতার পীঠস্থান রামু ও উখিয়ায় যে সহিংস আচরণ করে ধ্বংসস্তুপ গড়েছে তা ক্ষমার অযোগ্য। রামু ও টেকনাফে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর কয়েক শত স্থানীয় মুসলমান দফায় দফায় হামলা চালায়। হামলা শুরু হয় ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যরাতে। সেদিন সন্ধ্যায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী উত্তর কুমার বড়ুয়ার ফেইসবুকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ ট্যাগ হওয়া কোরআন অবমাননাকর ছবির খবরটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। রাত ১০টার মধ্যে ক্ষুব্ধ মুসলমানগণ দলে দলে রামুর চৌমুহনী চত্বরে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। জনরোশ প্রশমিত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। পুলিশ আসে, আসে র‍্যাব। স্থানীয় আওয়ামীলীগ ও বিএনপির নেতারাও ঘুরে যান সমাবেশস্থল। রাত ১২টার পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নাকের ডগায় জড়ো হওয়া মুসলমানগণ ‘নারায়ে তাকবির’ ধ্বনি দিয়ে স্থানীয় বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে সংঘবদ্ধ হামলা চালায়। হামলাকারীরা শত বছরের পুরনো ১২টি বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে। এতে পুড়ে যায় বৌদ্ধপল্লীর ৪০টির মত বসতবাড়ি। আরো শতাধিক বাড়ি তারা ভাংচুর করে ।[৫১৬]

---

[৫১৫] নূরুল কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭

[৫১৬] প্রথম আলো, ১ অক্টোবর ২০১২

তবে আশার কথা হল এই নৃশংস ঘটনার পরও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রবীণ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা ভোলেননি। তারা বলেছেন, "এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির নজির হাজার বছরের। এই সম্প্রীতি বিনষ্ট করে সুদূরপ্রসারী ফায়দা হাসিলের জন্য কোন পক্ষ পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটাতে পারে। আর ফেইসবুকে কোরআন অবমাননার ঘটনাটি হতে পারে তাদেরই সাজানো।" তারা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার ব্যাপারেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[৫১৭]

দেশে ও বিদেশে এ ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি অত্যন্ত ধিকৃত হয়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকল মানুষ এর প্রতিবাদে মুখরিত হয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জাতীয় সম্মেলন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শিক্ষাবিদ আনিসুজ্জামান বলেন,

> "গেল সেপ্টেম্বরে রামুসহ সন্নিহিত এলাকায় বৌদ্ধসম্প্রদায় আক্রান্ত হলে আমরা প্রথমে এটিকে একটি আকস্মিক ঘটনা বলে ভাবতে চেয়েছিলাম। পরে সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের এবং রংপুরের তারাগঞ্জে আহমদিয়াদের ওপর সহিংসতা ঘটলে আমাদের মনে হয়, এসবই পরিকল্পিত ঘটনা। তিনি আরো বলেন, সরকার ও প্রশাসন এসব ঘটনায় নির্লিপ্ত থাকলেও দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে আমাদের মনে হয়েছে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন। কারণ, সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতে সাংগঠনিকভাবে অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের মনে হয়েছে, যে আদর্শ ও স্বপ্ন নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম তা বিপন্ন হতে দেয়া যায় না ।"[৫১৮]

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আলোচনার শেষ পাদে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যেখানে কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রবল নয় সেই আপামর সাধারণ জনগোষ্ঠী হাজার বছর ধরে এই সুজলা সুফলা সবুজ বাংলার মাটিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে পরস্পরের সুখে সুখী হয়েছে, দুঃখে ব্যথিত হয়েছে, প্রয়োজনে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রচনা করেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইতিহাস। এর নজীর রয়েছে এদেশের মাটির পরতে পরতে। সমাজের সর্বস্থানে। সি আর দত্তের ভাষায়, "এ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অসংখ্য নজির দেওয়া যাবে। একবার জগন্নাথ হলে ছাদধ্বসে প্রচুর হিন্দু ছাত্র আহত হয়েছিল। আর এ আহত হিন্দু ছাত্রদের বাঁচাতে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা লাইন ধরে রক্ত দিয়েছিল। রক্ত দিয়েছিল মুসলমান মা-বোনেরাও। মুসলমান ভাইয়ের রক্তে সেদিন শত শত হিন্দু ভাইয়ের জীবন বেঁচেছিল। এই হলো আমাদের বাংলাদশে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ।"[৫১৯]

---

[৫১৭] নূরুল কবীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

[৫১৮] প্রথম আলো, ২৪ ডিসেম্বর ২০১২

[৫১৯] প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০১২

সম্প্রীতির আরো বড় উদাহরণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলো। যেখানে মুসলমান হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল ধর্মাবলম্বী ছাত্রীদের একই ছাদের নিচে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আবাসন সংকটের কারণে কখনও বা দ্বৈতাবাসিক হিসেবে একই সীটে বসবাস। সম্প্রীতির উদাহরণ দিয়ে সাংবাদিক সঞ্জীব চৌধুরী লিখেছেন, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নানুপুর মাদ্রাসার একটি রক্ষণশীল ইসলামধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। ওই মাদরাসার লাগোয়া একটি বর্ধিষ্ণু বৌদ্ধপল্লী। সীমানা দেয়ালের একপাশে মাদরাসা, অন্যপাশে বৌদ্ধমন্দির। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে চলছে সম্প্রীতিময় সহাবস্থান। মাদরাসার মহাপরিচালক জমিরুদ্দীন হুজুর যখন মারা যান, তখন নানুপুরের ও বৌদ্ধপল্লীর ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছিল। চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদরাসা এখন সম্ভবত দেশের বৃহত্তম ইসলামধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। এক বছরের কিছু বেশি সময় আগে হাটহাজারীতে হিন্দুদের জমি দখলের অপচেষ্টায় গুটিকয়েক দুর্বৃত্ত হিন্দুপল্লীতে ধ্বংসাত্মক হামলা চালায়। হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রধান ব্যক্তি আল্লামা শাহ্ আহমদ শফী সেদিন অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে দৃঢ়ভাবে রুখে না দাঁড়ালে সেখানে রক্তগঙ্গা বয়ে যেত। মরহুম মুফতি ফজলুল হক আমিনীর উগ্র ভাবমূর্তির কথা সবাই জানেন। কিন্তু ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা-অর্চনায় যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে, সেজন্য যে তিনি সদাসতর্ক থাকতেন, এ ব্যাপারে লালবাগ মাদ্রাসার ছাত্রদের খেয়াল রাখার নির্দেশ দিতেন, সে খবর কেউ রাখে না; রাখলেও মুখ ফুটে বলে না। ...আমি তখন দৈনিক যুগান্তরে সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত। হফেজ আহমদউল্লাহর তত্ত্বাবধানে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত পত্রিকাটির ধর্মপাতা বেশ জমে উঠেছে। প্রায় সময় বিভিন্ন এলাকা থেকে আহমদউল্লাহর কাছে হুজুররা আসেন। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় রূপ নেয়। তা দেখে সম্পাদকীয় বিভাগের আমার এক সহকর্মী (তিনি এখন অন্য পত্রিকায় কর্মরত) রসিকতা করে বলেছিলেন, খুব তো খাতির জমাচ্ছেন, পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিলে বুঝবেন মজা! তার ওই রসিকতার পর এক দশক পেরিয়ে গেছে। কোনো হুজুর আমার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেয়নি এবং আমি এখনও সাংবাদিকতা করে ডাল-ভাত খাচ্ছি।”[৫২০]

ষাটের দশকের তুখোড় ছাত্র নেতা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে লিখেছেন,

“আমার পিতা ছিলেন সমকালীন পরিমন্ডলে একজন সম্মানিত ‘আলেম। স্কুলের আরবী ভাষার শিক্ষক। সারা জীবন চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে রেলওয়ে এলাকার ঈদের প্রধান জামাতে ইমামতি করেছেন। আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মশাই, যিনি সংস্কৃত পড়াতেন, তিনি ছিলেন একজন পৈতাধারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। তিনি আমাকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। নবম শ্রেনীতে যখন পড়ি তখন আমার আগ্রহ জাগলো সংস্কৃত শেখার। পণ্ডিত মশাইকে আমার আগ্রহের কথা জানালাম। তিনি

[৫২০] দৈনিক আমার দেশ, ৫ এপ্রিল ২০১৩

হাসলেন। সংস্কৃত বাল্য শিক্ষার একটা বই যোগাড় করে শব্দ করে পড়তে থাকলাম- 'অথঃনীল বর্ণ শৃগালঃ কথাঃ'। একদিন বাবার চোখে পড়ে গেলাম। তিনি রেগে অগ্নিশর্মা। আমার সংস্কৃত শেখা আর হলো না। দু'দিন পর পণ্ডিত মশাই আমাকে সামনে পেয়ে হাসি মুখে বললেন, 'ফেরদৌস, তোমার বাবা তো চান না তুমি সংস্কৃত পড়ো। বাবার কথা শুনতে হয়।' আসলে স্কুলের মৌলভী সাহেবের ছেলে, ঘটা করে সংস্কৃত পড়তে দেখলে নানা জনে নানা কথা বলবে। বাবার জন্য তা' কিছুটা বিব্রতকর হতো বই কি। তবে স্বীয় ধর্মীয় অবস্থানে অনড় থাকলেও ব্যক্তি জীবনে বাবার আচরণ ছিল একেবারেই ভিন্ন। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে পণ্ডিত দেখতাম স্কুলের টিফিন বিরতিতে তাঁরা দু'জন টিচার্স কমনরুমের এক প্রান্তে পাশাপাশি চা-নাস্তা খাচ্ছেন আর খোশ গল্প করছেন।

আমাদের সমাজে তেমন মৌলভী সাহেব, তেমন পণ্ডিত মশাই, তেমন ভিক্ষু, তেমন পাদ্রী সাহেব সামনের কাতারে থাকলে সাম্প্রদায়িকতার অনাসৃষ্টি থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পায়।"[৫২১]

এরকম বহু দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরাজমান। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সবাই এদেশের নাগরিক। সবার অধিকার ও দায়িত্ব সমান। তাই দেশের স্বার্থে ধর্মীয় পরিচয়ের বেড়াজালে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ না রেখে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব সকলের। এজন্য প্রয়োজন সকল সংকীর্ণতা, স্বার্থান্বেষিতা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা মূলোৎপাটন করে সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ গঠন করা। যেখানে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায় থাকবে কিন্তু অনুপস্থিত থাকবে সাম্প্রদায়িকতা।

[৫২১] ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমকালীন বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সমকালীন বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রপঞ্চটি সমকালীন বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশ্বের নানা বৈচিত্রের মাঝে ঐক্যতান মানবতার কাম্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিশ্বে মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অথচ তারা বিশ্বাস, বর্ণ, জাতি, ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে বহুধা বিভক্ত। এজন্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রপঞ্চটি সমকালীন বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে। গণমাধ্যমে মানুষের এই সম্পর্কটি প্রাধান্য পাচ্ছে কখনো ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচকভাবে। মানুষ এই একতাকে অস্বীকার করে তৈরী করেছে সাম্প্রদায়িকতা। বিশ্বের অনেক দেশে সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চরম হুমকির মুখে। যেমনঃ ভারত, মিয়ানমার, চীন, শ্রীলংকা, ফ্রান্স ইত্যাদি রাষ্ট্রসমূহ। তবে আশার কথা হল বিশ্ববিবেক জাগ্রত হতে শুরু করেছে। সাম্প্রদায়িক নৈরাজ্য, অরাজকতা, বিশৃংখলার মাঝেও বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরীর জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে অনেক দেশ কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান অধ্যায়ে তার একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের কয়েকটি আলোচিত দেশের তথ্য প্রবাহ অনুসন্ধান চালিয়ে বিবরণ পেশের প্রয়াস পাওয়া গেল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভারত

ভারত আবহমান কাল থেকে বৈচিত্রের মাঝে একতা তৈরী করে এসেছে। সেখানে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, বংশ ও ধর্মের মানুষ ভারতীয় জাতিয়তাবাদে আবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির যাত্রা অব্যাহত রেখে বিশ্বের বুকে স্বমহিমায় ভাস্বর। অভিন্ন জাতীয় স্বার্থের প্রতি সকল শ্রেণীর মানুষের অকুন্ঠ ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকার কারণে ক্রিড়া সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য চোখে পড়ার মত।

ভারতীয় জাতিয়তাবাদে বিভিন্ন বৈচিত্রের মানুষ একীভূত হয়েছে। তারা এক দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম-বিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতে ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলিম এবং খ্রীষ্টান প্রধান। প্রাচীনকাল হতে এসব জাতিসমূহ নিজেদের মধ্যকার বর্ণ-গোত্রের পার্থক্য ভুলে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সাথে বসবাস করে আসছে। ভারতে শান্তি, সম্প্রীতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সে দেশের সংবিধানেও রয়েছে সুস্পষ্ট বিধান। যেখানে সকল ধর্মের নাগরিকদের মৌলিক ও ধর্মীয় অধিকারসমূহ স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে,

PART III of the Indian Constitution–FUNDAMENTAL RIGHTS

Right to Freedom of Religion (Article 25 –28)

Article 25 -Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion25. (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.25. (2) nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—a) Regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;

b) Providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.

These rights guarantee to every person the freedom of conscience and right to profess, practise and propagate religion. This right is however, subjected to public order, morality and health and to the other provisions of Part III of constitution. Right to propagate does not include right to convert. This means no one has the right to convert another person to his own religion by force, fraud or by offering incentives. The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion. In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jainor Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

Article 26 -Freedom to manage religious affairs

26. Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—

a) To establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;

b) To manage its own affairs in matters of religion;

Dhaka University Institutional Repository

c) To own and acquire movable and immovable property;
d) To administer such property in accordance with law.

This article permits every religious group, the right to manage its own affairs in matters of religion. Every religious sect has the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Each religious group is also free to purchase and manage its movable and immovable property in accordance with law, for the propagation of its religion.

Article 27 -Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion

27. No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination.

According to this article, the state cannot levy or collect any tax, the proceeds of which are to be used exclusively for the promotion of a particular religion. E.g. Jizyah, tax levied during medieval times imposed on non-Muslims and the proceeds of the tax were reserved for the promotion of Islamic religion. The government can levy fee for maintenance of religious shrines and this does not amount to violation of Article 27.

Article 28 -Freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions

28. (1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds.

28. (2)Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution which is administered by the State but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution.

28. (3) No person attending any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person or, if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto.

According to this article, no religious education can be imparted in any educational institution which is wholly maintained out of the state funds. This restriction does not apply to those educational institutions which are not wholly maintained out of State funds. But, even in those institutions, no child can be compelled to receive religious instructions against his /her wishes.

If religious denominations are set up under religious denominations or charitable trusts, religious education can be provided at such institutions and students can be compelled to attend can be provided at such institutions and students can be compelled to attend.

বহুজাতিভূক্ত ভারতে সম্প্রীতির জন্য আইন প্রণয়ণ করা হলেও এখানে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ঘটনাও কম নয়। সাম্প্রতিক কালে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহ হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু ব্যক্তি দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। পত্র-পত্রিকাতে এ খবরসমূহ বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন, ভারতের ‘জনতা কা রিপোর্টার’ নামের এক সংবাদপত্রে গরু জবাইয়ের অভিযোগে একজন মুসলিম যুবকের ওপর বর্বরতার খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফফরাবাদে গরু জবাইয়ের অভিযোগ তুলে রিয়াজ নামক এক মুসলিম যুবকের ওপর নৃশংস বর্বরতা চালিয়েছে হিন্দু জঙ্গিবাদী বজরং দলের সদস্যরা। মুজাফফরাবাদের শ্যামলী নামক

এলাকায় বসেছিলেন তরুণ রিয়াজ। পাশে একটি স্থানে গরু জবাইয়ের চিহ্ন ছিল। রিয়াজ এ ব্যাপারে কিছু জানেন না বললেও স্থানীয় বজরং দলের কিছু সদস্য তাকে সন্দেহ করে ধরে মারতে শুরু করে। দুই ঘন্টা ধরে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে পেটানো হয়। পেটানোর দৃশ্য আশপাশের লোকজন ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছেড়ে দেয়ার পর তা সবার দৃষ্টিতে আসে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, 'বেশ কিছু যুবক রিয়াজের গলায় কাপড় বেঁধে ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে পেটাতে পেটাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রিয়াজের শরীর রক্তাক্ত। হামলাকারী ব্যক্তিরা তখন স্লোগান দিচ্ছিল, 'গরু জবাইকারীদের প্রতি আমাদের আচরণ এমনই হবে।' রাজিব যাদব নামে একজন মানবাধিকার কর্মী এ ঘটনার জন্য ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং উত্তর প্রদেশের সমাজবাদী পার্টিকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, যেভাবে বজরং দলের সদস্যরা একজন মুসলিমকে রাস্তায় ঘুরাতে ঘুরাতে পেটালো এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক শ্লোগান দিল তাতে মনে হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়েই ছাড়বে বিজেপি এবং সমাজবাদী পার্টি। দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে পুলিশ এখন ভুক্তভোগী যুবকটিকেই আটক করে রেখেছে। ২০১৩ সালে স্মরণকালের ভয়াবহ দাঙ্গা হয় মুজাফফরাবাদে। তখন হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিদের হামলায় অন্তত ৫০ মুসলিম নিহত এবং কয়েকশ' আহত হন।[৫২২]

আইআরআইবি সূত্রে জানা যায়, ভারতের মহারাষ্ট্রের পরে বিজেপি শাসিত হারিয়ানাতেও গরু জবাইয়ের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিধানসভার এক বাজেট অধিবেশনে এমন আইন আনা হচ্ছে, যেখানে গরু জবাই করলে ওই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা পর্যন্ত রাখা হচ্ছে। গরুর গোশত বিক্রি এবং মজুদ রাখাও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে প্রস্তাবিত আইনে। গোশত বিক্রি এবং মজুদ রাখা হলে তাকে আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা থাকছে। কেউ গরু জবাই করতে গিয়ে ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে।

হরিয়ানার বিজেপি সরকার গরু জবাই বন্ধ করতে এবং রাজ্যে গরুর সংখ্যা বাড়াতে বিধানসভায় দুটি বিল আনছে। এদের মধ্যে একটি বিলের নাম হচ্ছে গোবংশ সংরক্ষণ বিল, অন্যটির নাম হলো গোসংবর্ধন বিল। সরকার বলছে, এই বিল দুটি আইনে পরিণত হলে নির্বাচনের সময় মানুষকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে।[৫২৩]

ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিহার রাজ্যে উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের বাড়িঘরে আগুন দেয়ায় কমপক্ষে চারজন মুসলমান গ্রামবাসী পুড়ে মারা গেছেন। বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে ১০৫ কিলোমিটার উত্তরে সারায়িয়ান গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

---

[৫২২] http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=18380#sthash.2Kulhmjk.dpuf
[৫২৩] http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=17114#sthash.DGydeDHD.dpuf

বিহারের মুজজফরপুর জেলায় ১৮ জানুয়ারী, ২০১৫ ইং তারিখে সংঘঠিত এই ঘটনায় পাঁচজন অগ্নিদগ্ধ হয়। সেদিন বিকেলে একদল উন্মত্ত জনতা একটি গ্রামের ২৫ টি ঝুপড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে মানুষজন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়। হামলাকারী হিন্দুরা যখন মুসলিমদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ ধ্বংস করছিল, তখন প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত সেখানে পুলিশ ঢুকতে পারেনি। বেশির ভাগ মুসলিম বাসিন্দা জীবন বাঁচাতে তাদের পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি ও জিনিসপত্র রেখে পালিয়ে যান। ঘটনার কিছু দিন আগে পাশের একটি গ্রামে একজন দলিত যুবক মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়। গ্রামের পাশে ওই যুবকের লাশ পাওয়া গেলে ব্যাপক উত্তেজনা শুরু হয়। এতে উন্মুক্ত হিন্দুরা ওই মেয়েটির গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হিন্দু ছেলেরা ওই যুবকের মৃত্যুর জন্য স্থানীয় মুসলমানদের দায়ী করেন। স্থানীয় এক মুসলিম কিশোরীর সঙ্গে ওই যুবকের বন্ধুত্ব ছিল বলে জানান তারা।

বিহার পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক (এডিজি) গুপ্তেশ্বর পাণ্ডে জানান, এখানকার পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হলেও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এখানে কোনো রকম কারফিউ জারি করা হয়নি। জেলা পুলিশের সব কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। পুলিশ গ্রামে হামলা চালানোর দায়ে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। এই ঘটনায় ১৪জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সরকার নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছে। ১২০ কোটি মানুষের দেশ ভারতের ৮০ শতাংশ হিন্দু ও ১৩ শতাংশ মুসলিম। দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি থাকলেও মাঝে মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর প্রদেশের মোজাফফরনগরে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষে প্রায় ৫০ জনের প্রাণহানি ঘটে।[৫২৪]

২৭ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক টাইমস প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে ভারতের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে,

> "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যাপারে আশাবাদ এবং ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ দেয়া তার জঙ্গি হিন্দু জাতীয়তাবাদী সমর্থকদের বিভেদ এজেন্ডা বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে মারাত্মকভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে চলেছে। এসব কাজ অনুমোদনের অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছেন স্বয়ং প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
>
> গত মঙ্গলবার সমাপ্ত সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিনে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হট্টগোলে অচল হয়ে পড়ায় বারবার অধিবেশন মুলতবি করতে হয়। আর এতে বিঘ্নিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন কাজ। খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের হিন্দু মতবাদে দীক্ষিত করার জন্য উগ্র হিন্দু গ্রুপ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচির

[৫২৪] দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৮ জানুয়ারী, ২০১৫ খ্রী.

প্রচারণায় এই ইস্যু নিয়ে উত্তেজনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা সেকুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে জঙ্গি হিন্দুরা আগ্রায় এবং গুজরাট ও কেরালা রাজ্যে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের হিন্দু মতবাদে ধর্মান্তর শুরু করেছে। পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে, খাদ্যের রেশন কার্ড দেয়ার প্রতিশ্রুতিসহ বিভিন্ন ধরনের ঘুষ আর ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তাদের ধর্মান্তর করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে খ্রিষ্টান এবং তাদের উপাসনা কেন্দ্রগুলোতে আক্রমণ তীব্রতর হয়েছে। গত ১ ডিসেম্বর রাজধানী নয়া দিল্লির সবচেয়ে বড় গির্জায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ১২ ডিসেম্বর হায়দারাবাদে বড়দিনের শোভাযাত্রায় আক্রমণ করা হয়েছে।

ভারতীয়দের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। তবে ভারতের শত শত বছরের ইতিহাসজুড়ে মুসলমান, খ্রিষ্টান ও শিখরা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করে আসছেন। ধর্মীয় বহুত্ববাদ ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ভারতের সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে। ধর্মান্তরের বিষয়টি নিয়ে ভারতে রয়েছে অনেক বিতর্ক। অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত বহু দলিত বা অন্য নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং আদিবাসী প্রাথমিকভাবে বর্ণগত কুসংস্কার ও নিপীড়ন– নিষ্পেষণ থেকে রেহাই পেতে ইসলাম বা খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রধান স্থপতি জন্মগতভাবে দলিত ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর হিন্দুধর্মের বর্ণ-নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। একজন বিরোধী রাজনৈতিক নেতা দাবি করেছেন এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা ভাঙা প্রয়োজন। আর বিভাজন ও বিদ্বেষের রাজনীতি অর্থনৈতিক সংস্কারকে পাশে ফেলে রেখে মূল জায়গা দখলের আগেই হিন্দু জঙ্গিদের প্রতি তার কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা প্রয়োজন।”[৫২৫]

ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃষ্টান্তও কম নয়। উপরোক্ত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া আপামর জন সাধারণের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতার মনোভাব বিদ্যমান। ১৯৯৬ সাল থেকে ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে National Communal Harmony Award প্রদান করা হয়। সাধারণত যারা ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতি তৈরীতে অবদান রাখেন তারাই এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। TCN News এর সংবাদে জানা যায়। ২০০৯ সালে এই পুরস্কারটি লাভ করেন ৫৮ বছর বয়সী সংস্কৃত পন্ডিত ড. মুহাম্মদ হানিফ খান শাস্ত্রী। তিনি তার রচনাবলীর মাধ্যমে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্যসমূহ উল্লেখ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়নে অবদান রেখেছেন।

২০১০ সালে এ পদকটি লাভ করেন লেখক, বক্তা ও সমাজকর্মী লোকেশ মুনি। তিনি দিল্লী ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ‘অহিংস বিশ্ব ভারতী’ এর প্রধান রূপকার। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো অহিংসা, শান্তি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, কন্যাশিশু ভ্রূণ হত্যারোধ এবং মাদকাসক্তি প্রতিরোধ। এছাড়া ভারতে আরো কিছু সংগঠন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়নে কাজ করে। যেমন, Center for Human Rights and social welfare. এর কাজ হল সাম্প্রদায়িক

[৫২৫] প্রাগুক্ত, ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রী.

সম্প্রীতি প্রতিস্থাপন, মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ, গৃহহীন ও দুস্থ নারীদের উন্নয়ন সাধন এবং লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন।[৫২৬]

বর্তমান ভারতের বিভিন্ন কেস স্টাডিতে এটা প্রমাণিত হয় যে, বৃহৎ এই রাষ্ট্রটিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সাথে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নানাভাবে বিদ্যমান। শুধুমাত্র এটাকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা বলে কোনক্রমেই আখ্যা প্রদান করা ঠিক হবেনা। কখনো বা উগ্র নেতৃত্ব থেকে আসা উস্কানিমূলক বক্তব্যও এই সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে। একথা উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিকভাবে এই দেশটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি প্রমাণিত সাক্ষ্য বহন করে যেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষাকল্পে বার বার হিন্দু শ্রেণীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যার প্রবাহমানতা আজও স্বরূপে বিদ্যমান।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মায়ানমার

সাম্প্রতিক বিশ্বে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে আলোচিত একটি দেশ হল মায়ানমার। এদেশের আরাকান প্রদেশে প্রাচীনকাল হতেই মুসলমানদের বসবাস। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব বণিকদের আগমনে আরাকানে সর্বপ্রথম ইসলামের আলো পৌঁছে যায়। জানা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় সাহাবী আবু ওয়াক্কাস (রা.) ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান সফর করে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। যতদূর জানা যায় ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭৮০ বছর পর্যন্ত আরব বণিক ও দায়ীদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার চলতে থাকে। পরবর্তীতে ১৫ শতকের শুরুতে আরাকানের বুদ্ধ রাজা নরমিখলার ইসলাম গ্রহণ ও সুলাইমান শাহ্ নাম ধারণ করায় আরাকানে মুসলমানদের জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময়েই উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানরা বিভিন্ন কারণে আরাকানে আগমন করে এবং অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আরাকান দীর্ঘ সাড়ে তিনশত বছর মুসলিম শাসনাধীন ছিল। মায়ানমারের বর্তমান জনসংখ্যা ৫০ মিলিয়নের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা কমপক্ষে ৬ মিলিয়ন। ৬ মিলিয়ন মুসলমানের মধ্যে আরাকানেই বসবাস করে ৩ মিলিয়ন । এদেরকে বলা হয় রোহিঙ্গা মুসলমান। আরাকানের সর্বমোট জনসংখ্যার ৭০% মুসলমান। অবশ্য বিভিন্ন সময় হত্যা, স্থান ত্যাগ ও দেশ ত্যাগের কারণে আরাকানে মুসলমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। বাকী মুসলমানগণ বার্মার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাস করে।

---

[৫২৬] http://twocircles.net/2011jul29/dr_mohammad_hanif_khan_gets_national_communal_harmony_award.html#.VkrvuF4g7cc

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আরাকানী মুসলমানদের আদি পুরুষেরা নরমিখলার রাজত্বকাল (১৪৩৪) থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত বসতি স্থাপনকারী মুসলমানদের বংশধর। কাজেই আরাকান সহ মায়ানমারের যে কোনো স্থানে বসবাস করার জন্মগত ও আইনগত অধিকার তাদের রয়েছে। আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানগণ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সকল প্রকার নাগরিক অধিকার ভোগ করেছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের পর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। মগ দস্যুদের অত্যাচার নির্যাতন এ সময়ে বহু রোহিঙ্গা মুসলমান প্রাণ হারায়। অগণিত রোহিঙ্গা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের স্বাধীনতা হারানোর পর থেকেই মুসলমানদের উপর দানবীয় নির্যাতন শুরু হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মি উনুর নেতৃত্বে মায়ানমার স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন মায়ানমারের প্রথম মন্ত্রিসভায় ২ জন মুসলিম সদস্য স্থান পায়। এ মন্ত্রিসভা ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মায়ানমারে জেনারেল নে উনের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সব রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নে-উইন মায়ানমারে নিজস্ব পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নে-উইন ক্ষমতায় ছিলেন। নে-উইনের শাসনামল ছিল একটি কালো অধ্যায়। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নে-উইন আরাকানকে বুদ্ধশাসিত একটি অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দান করে। মুসলিম তথা রোহিঙ্গাদের বিতাড়নের বিভিন্ন অমানবিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১৯৭৮ সালে কুখ্যাত "নাগসিন ড্রাগন" অপারেশন শুরু করে। এ অপারেশনে কমপক্ষে দশ হাজার রোহিঙ্গা নিহত হয়। প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। শরণার্থীদের এহেন বিপজ্জনক ঢল জাতিসংঘ ও বিশ্ব বিবেককে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়।

মুসলমানদের আরাকানসহ মায়ানমারের বিভিন্ন জনপদ থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে মায়ানমার সরকার বিভিন্ন সময় অভিবাসন ও নাগরিকত্ব আইন জারি করে। এ সমস্ত অমানবিক আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. বার্মা অভিবাসন আইন (জরুরি)-১৯৪৭

২. ইউনিয়ন নাগরিকত্ব আইন- ১৯৪৮

৩. বার্মা অভিবাসন (জরুরি) আইন- ১৯৫৭

৪. নাগরিকত্ব আইন-১৯৮২

নাগরিকত্ব ও অভিবাসনগুলোর মধ্যে সামরিক জান্তা জারিকৃত ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনটি বেশি জঘন্য ও অমানবিক। এ আইনটির মূলকথা হল ১৮২৩ সাল হতে ১৯৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত মুসলমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে আরাকানসহ মায়ানমারের বিভিন্ন জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তারা বহিরাগত এবং মায়ানমারের নাগরিক নয়। এ আইনে ১৮২৩ সালের পরের বাসিন্দাদের বিতাড়নের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অথচ মায়ানমারের

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা মায়ানমারের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী মি. উনু ১৯৫৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এক বেতার ভাষণে রোহিঙ্গাদের দেশের অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মতো বার্মার নাগরিক বলে ঘোষণা করেন। এছাড়াও মায়ানমারের অপর এক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ১৯৫৯ সনের ৩ নভেম্বর এক ভাষণে মুসলমানদেরকে অন্যান্য সকলের ন্যায় সমঅধিকার প্রাপ্ত নাগরিক বলে ঘোষণা করেন। অথচ রোহিঙ্গাদেরকে আজ আরাকানে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য যে ১৭৮৪ সালে বর্মীদের আরাকান দখলের পূর্বে সুদীর্ঘ ৩৫০ বছর পর্যন্ত আরাকান রোহিঙ্গা মুসলমান কর্তৃক শাসিত হয়েছে। অথচ তারা আজ নিজ দেশে পরবাসী। আরাকনসহ মায়ানমারকে মুসলিম শূন্য করার লক্ষ্যে ১৯৩৭ সাল থেকে যে নির্যাতন চলছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল:

১৯৩৮ সালে সেন্ট্রাল বার্মায় ২০ হাজার মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশরা আরাকান ত্যাগ করলে এবং জাপান আরাকান দখল নেওয়ার পূর্বে স্বল্প সময়ে আরাকানকে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হয়। এ সময় কমপক্ষে এক লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান নিহত হয় এবং কয়েক লক্ষ দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

১৯৪৮ সালে" এথনিক ক্লিনজিং প্রোগ্রাম" এর আওতায় প্রায় ৫০ হাজার জনকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বলপূর্বক প্রেরণ করা হয়।

১৯৭০ সনে অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করার নামে আরাকানে অনেক বার তল্লাশির নামে আরাকানী যুবক যুবতীদেরকে চরমভাবে নির্যাতন করা হয়।

১৯৭৮ সালের ড্রাগন অপারেশনের মাধ্যমে হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলমানকে হত্যা ও প্রায় ৩ লাখকে বাংলাদেশে বিতাড়ন করা হয়।

১৯৯১-১৭ সালের মধ্যে প্রায় ২ লাখ মুসলিমকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়।

২০০৪ সাল নাগাদ বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, বাংলাদেশে কমপক্ষে ১৫ লক্ষ রোহিঙ্গা বসবাস করছে। ২০১২ সালে রাখাইন বৌদ্ধরা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। এ জাতীয় যুলম অত্যাচার আজ পর্যন্ত চলছেই। বরং এ নির্মম প্রক্রিয়া মায়ানমার সরকারের একটি রুটিন কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। তাদের একটাই উদ্দেশ্য আরাকানকে মুসলিম শূন্য করা। এক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল। কারণ প্রথম দিকে রোহিঙ্গারা কিছুটা আশাবাদী ছিল। সাধ্যমত প্রতিবাদ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। আন্তর্জাতিক ও মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সহায়তা লাভের চেষ্টা করেছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাড়া না পেয়ে আজ তারা হতাশ। কোনো আশার আলো দেখতে পায় না। তাই উদ্দেশ্যহীনভাবে দেশ ত্যাগ করছে। সাগরে ভাসছে, ডুবে মরছে, না হয় মায়ানমার সরকারের বিভিন্ন বাহিনী বা মগ দস্যুদের হাতে প্রাণ দিচ্ছে। আরাকানের মুসলমানগণ আজ অত্যন্ত অসহায়। তারা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামেও স্বাধীনভাবে যাতায়াত করতে পারে না। জমি-জমা ভোগ করতে পারে না। স্বাধীনভাবে সন্তান জন্ম

দান এমনকি বিবাহ পর্যন্ত করতে পারেন না। সন্তানের নাম রাখাও যাবে না কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নাম ছাড়া। শিক্ষা দানের কোনো সুযোগ নাই। স্বাস্থ্যসেবা একেবারেই নাই। বিভিন্নভাবে পদে পদে রোহিঙ্গাদের অপমানিত ও অপদস্ত হতে হয়।[৫২৭]

এমনকি মায়ানমারের উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধরা রাষ্ট্রীয় মদদেই মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে; নিজেদের এক প্রতিবেদনে এমন দাবি করেছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। ওই সংবাদ মাধ্যমের মার্কিন সাংবাদিক জোসেফ স্কটের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে রোহিঙ্গা জীবনের ভয়াবহ বিপন্নতার কথা।

শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রতি মায়ানমারের সাবেক রাজধানী রেংগুনের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে মার্চ করতে করতে একটি ফুটবল মাঠে জড়ো হয় উত্তপ্ত বক্তৃতা দিয়েছে। সেখানে পুলিশ কিছুই করেনি। অদূরেই প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে পুলিশ চা পান করছিল। অভূতপূর্ব ও বিরল এ দৃশ্যের অবতারণা ঘটল কারণ আন্দোলনকারীরা দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিল না। সেদিন তাদের আন্দোলনের বিষয়বস্তু ছিল দেশটির রাখাইন রাজ্যের রাজ্যহীন রোহিঙ্গা সম্প্রদায়। রোহিঙ্গারা সম্প্রতি আবারও বিশ্বজুড়ে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে, নিজ দেশে নিরাপত্তা সঙ্কটে হাজার হাজার রোহিঙ্গা উন্নত জীবনের আশায় মাসের পর মাস সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে, এমন খবর প্রকাশ হওয়ার পর। রোহিঙ্গাদের প্রতি মায়ানমারের আচরণের কারণে এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এমন ধারণা স্পষ্ট অস্বীকার করেছে দেশটি।

আন্দোলনকারীদের প্রত্যেকের টি-শার্টে রোহিঙ্গাবিরোধী বিভিন্ন (শ্লোগান) লেখা ছিল। তারা বলছিল, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নয়। তাদের কোনো দায়িত্ব নেবে না মায়ানমার। রোহিঙ্গাবিরোধী এসব কার্যাবলির নেপথ্যে থাকে বৌদ্ধ সংগঠনগুলো। মুসলিমবিরোধী প্রচারণা চালানোই সংগঠনগুলোর আদর্শিক বৈশিষ্ট্য। গেল চার বছরের বেশি সময় ধরে এভাবেই দেশটি গণতন্ত্রের চর্চা করে আসছে।[৫২৮]

২০১২ সালে বৌদ্ধ এবং রোহিঙ্গাদের মধ্যে সংগঠিত সহিংসতায় ২০০ মুসলিম মারা যায় এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার মুসলমান বাস্তহারা হয়। এএফপি,এপি ও বিবিসি সূত্রে জানা যায়, ২০১৩ সাল থেকে মায়ানমারে মুসলিম নিধনযজ্ঞ আবারও ছড়িয়ে পড়েছে। অসহায় মুসলিমদের হত্যার পাশাপাশি বৌদ্ধ মৌলবাদীদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মসজিদ ধ্বংস করা। সে বছর জানুয়ারী মাসে সেখানে মসজিদ ও মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে মৌলবাদী বৌদ্ধরা। মাত্র কয়েক দিনের মুসলিমবিরোধী দাঙ্গায় দেশটিতে অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছে। এ সময় বহু মসজিদ গুড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি মুসলিমদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এর পূর্বে মধ্যাঞ্চলীয়

[৫২৭] http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=18142#sthash.RxQsrtnv.dpuf
[৫২৮] http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=18058#sthash.wyqilChd.dpuf

মিখটিলা শহরে এক মুসলিম স্বর্ণকার ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর মধ্যে কথা কাটাকাটির জের ধরে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। মায়ানমারের বৃহত্তম মুসলিম সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মুসলিমদের হত্যা করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে শুধু নিপিধো শহরে অন্তত ২০ হাজার মুসলিম উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। দেশটির সেনাবাহিনীর যখন বার্ষিক প্যারেডের জমকালো আয়োজন চলছিল, সে সময়ই ইয়াংগুন শহর থেকে দেড়শ' কিলোমিটার দূরের জিগন শহরে একটি মসজিদ ও বেশকিছু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে বৌদ্ধরা।

মায়ানমারের চলমান মুসলিমবিরোধী দাঙ্গায় দেশটির বিরোধী গণতান্ত্রিক নেত্রী নোবেল জয়ী অং সান সূচির নীরবতায় হতাশা প্রকাশ করেছেন মানবাধিকার কর্মীরা। চলমান মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার মধ্যেই গতকাল সেনা প্যারেডে তাকে জেনারেলদের সঙ্গে খোশগল্পে মেতে থাকতে দেখা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সন্ন্যাসীসহ মৌলবাদী বৌদ্ধরা হাতে ছুরি ও লাঠি নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এরপর দেশটির দাঙ্গাকবলিত মধ্যাঞ্চলীয় মিখটিলা শহরের বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ থেকে নতুন করে আরও আটটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ইয়াংগুনের তিনটি শহরে মসজিদ ও মুসলিমদের ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া হয়। এর আগে ইয়াথেমিন শহরে কমপক্ষে ৪৩টি মসজিদ ও বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। প্রথম দিকে সহিংসতা কেবল মিখটিলা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে তা তাতকোনসহ আরও কয়েকটি শহরে ছড়িয়ে পড়েছে।

মিখটিলা শহরে কয়েকদিনের দাঙ্গায় বেশকিছু মসজিদ, মাদরাসা, মুসলিমদের কয়েকশ' ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ধ্বংস করা হয়েছে। সেখানে উগ্র বৌদ্ধদের হামলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে শহরের প্রধান ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হেমারাতুল ইসলাম মাদরাসা। ওই মাদরাসার প্রিন্সিপাল মুফতি ওয়াজিদসহ চার শীর্ষস্থানীয় আলেম নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া মাদরাসার ২৮ ছাত্রও নিহত হয়েছে বলে বিভিন্ন সুত্রে থেকে দাবি করা হয়েছে। তবে নিরপেক্ষ কোনো সূত্র থেকে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মিখটিলা শহরে সহিংসতা শুরুর পর একদিন রাতে প্রায় ৩০০ বৌদ্ধ ওহ দ্য কনে শহরে মসজিদে এবং মুসলিমদের দোকানপাটে ভাংচুর চালিয়েছে। ওহ দ্য কনে শহর ছাড়াও মিখটিলা থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরের তাতকোন শহরের একটি মসজিদে হানা নিয়ে সেখানে লুটপাট ও ভাংচুর চালিয়েছে সশস্ত্র বৌদ্ধরা। কাছাকাছি ইয়ামেনথিন শহরেও একটি মসজিদসহ ৫০টি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে বৌদ্ধরা। আগুনে জ্বলছে রাজধানী নিপিধোর উপকণ্ঠেও।

মায়ানামারে একটি সংস্কারমুখী সরকার ক্ষমতা নিলেও দেশটির নিপীড়িত মুসলিমদের ভাগ্যের কোনো উন্নতি হয়। সামরিক জান্তার মুসলিমবিরোধী নীতি এখনও বহাল আছে।

২০১৩ সালের জুন মাসে মায়ানমারের রোহিঙ্গা রাজ্যে নতুন করে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা শুরু হলে সরকারি হিসেবেই অন্তত ১৮০ জন নিহত হয়। নিহতদের বেশিরভাগই হতভাগ্য মুসলিম

সম্প্রদায়ের। এ সময় অন্তত এক লক্ষ ১০ হাজার মানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। তবে মায়ানমারের প্রবাসী মুসলিমরা বলছেন, দাঙ্গায় হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, মায়ানমারে মুসলিমবিরোধী নিধনযজ্ঞে মৌলবাদী বৌদ্ধদের সঙ্গে সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীও যোগ দিয়েছিল। মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের সেদেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না।[৫২৯]

গত দুই বছরে এখানে বহু নিরপরাধ মুসলমান উগ্র বৌদ্ধদের হাতে নিহত হয়েছে বলে মানবাধিকার সংস্থাগুলো খবর দিয়েছে। মুসলমানদের ওপর গণহত্যার এইসব ঘটনায় মায়ানমারের সরকারি ও বিশেষ করে সামরিক কর্মকর্তারাও জড়িত ছিলেন বলে জাতিসংঘসহ মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে। এ অঞ্চলে মুসলমানদের ওপর উগ্র বৌদ্ধদের পরিকল্পিত এক হামলার ঘটনায় খুব কম সময়ের মধ্যে বিশটিরও বেশি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং এতে ধ্বংস হয়ে যায় ১৬০০ বাড়িঘর। এ ছাড়াও হতাহত হয় বহু মুসলমান। যারা পালিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের অনেককেই বন্দি ও হত্যা করা হয় এবং মুসলিম নারীদের অনেকেই হন ধর্ষণের শিকার। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওইসব হামলার ঘটনায় উগ্র বৌদ্ধদেরকে অনেকগুলো জ্বালানি তেলের ড্রাম দিয়েছিল মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী যাতে তারা মুসলিম গ্রামগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে এবং এর ফলে মুসলমানরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী যে মুসলমানদের ওপর গণহত্যায় ভূমিকা রাখছে এমন খবর বারবার উঠে এসেছে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তদন্ত-রিপোর্টে। আরাকান তথা রাখাইনের ২৭টি অঞ্চলে তদন্ত টিম পাঠিয়েছিল হিউম্যান রাইট ওয়াচ। তদন্ত শেষে সংস্থাটির রিপোর্টে বলা হয়, একটি গণ-কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে একই গর্তে ১৮ জন রোহিঙ্গা মুসলমানদের লাশ পাওয়া গেছে। লাশগুলোর হাত ছিল প্লাস্টিকের দড়ি বা কর্ড দিয়ে বাঁধা যা দেশটির পুলিশ ব্যবহার করে থাকে।[৫৩০]

আলজাজিরা, এএফপি ও রয়টার্স সূত্রে জানা যায়, মায়ানমারের সাবেক রাজধানী ইয়াঙ্গুনে ২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ ভোরে একটি মাদরাসায় রহস্যজনক অগ্নিকান্ডে ১৩ শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুদের সবাই এতিম ছিল বলে জানা গেছে। ঘটনাটি এমন সময় ঘটল যখন ঠিক ওই অঞ্চলটিতেই সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছে বৌদ্ধ মৌলবাদীরা।

দেশটির কর্মকর্তারা জানান, ভোররাত পৌনে তিনটার দিকে বোতাতং জেলার একটি মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসায় আগুন লাগে। এতে ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হয়ে ১৩ ছেলে শিশু মারা যায়। তবে ওই এলাকার মুসলিম অধিবাসীরা বলছেন, তাদের বিশ্বাস, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তদন্ত কমিটিতে মুসলিম নেতাদের রাখারও কথা বলেছে।

[৫২৯] দৈনিক আমার দেশ, ২৩ মার্চ, ২০১৩ খ্রী.
[৫৩০] দৈনিক ইনকিলাব, ১১ জানুয়ারী ২০১৫ খ্রী.

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নতুন করে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গার পর থেকে বৌদ্ধ মৌলবাদীদের হামলার আশাঙ্কায় ওই মাদরাসার দরজা তালাবদ্ধ ও জানালা বন্ধ ছিল। ঘটনাস্থলে থাকা নোয়াং থেইন নামের এক ব্যক্তি জানান, নিহত শিশুদের বয়স ১৩ থেকে ১৪ বছর। মাদরাসার জানালায় লোহার শিক থাকায় শিশুরা বের হতে পারেনি। ঘটনার পর থেকে দাঙ্গা পুলিশ ওই এলাকা ঘিরে রেখেছে। দুর্ঘটনার সময় মাদরাসাটিতে ৭০টি শিশু ঘুমাচ্ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। অন্য শিশুদের উদ্ধার করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মিন্ত অং বলেন, আমরা সকালে আগুন নিভিয়েছি। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও জানি না। এ নিয়ে অনেক গুজব শোনা যাচ্ছে। সেদিনই জানাজা শেষে হতভাগ্য শিশুদের ইয়াঙ্গুনে দাফন করা হয়। এ সময় শিশুদের স্বজনরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

উল্লেখ্য, ২০ মার্চ, ২০১৩ থেকে ইয়াঙ্গুনে নতুন করে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়। বৌদ্ধরা ছুরি ও লাঠি নিয়ে মুসলমানদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। মৌলবাদী বৌদ্ধদের আক্রমণ থেকে জীবন বাঁচাতে মুসলিমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মায়ানমারে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক স্পেশাল রিপোর্টার টমাস ওজিয়া কুইনটানা বলেছেন, মুসলিমবিরোধী সংহিসতায় রাষ্ট্র জড়িত। তবে মায়ানমার সরকার ওই দাবি নাকচ করে দিয়েছে।

এর আগে ২০১২ সালের জুনে মায়ানমারের আরাকানে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি হিসেবে বলা হয়, এতে অন্তত ১৮০ জন নিহত এবং ১ লক্ষ ১০ হাজার লোক উদ্বাস্তু হয়েছে। তবে রোহিঙ্গাদের নিয়ে কাজ করে– এ ধরনের সংগঠন বলেছে, হতাহতের সংখ্যা এর কয়েক গুণ। মায়ানমারের ৬ কোটি লোকের মধ্যে ৪-৫ শতাংশ মুসলিম। তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা সেখানে বাস করলেও মায়ানমার সরকার তাদের সে দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, রোহিঙ্গা মুসলিমরা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নিগৃহীত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।[৫৩১] তবে আশার কথা হল বৌদ্ধ এবং রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির উন্নয়নেও বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এমনকি অনেক বৌদ্ধ আছেন মুসলমানদের প্রতি যাদের গভীর মর্মবেদনা আছে। তারা মায়ানমারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য বেসরকারিভাবে সংগঠিত হচ্ছেন বিভিন্ন নামে। এমনি একটি সংগঠন হল PIN অর্থাৎ People in Need এটি ২০১২ সাল থেকে সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে এবং এই সংগঠনটির কাজ হল:

- স্থানীয় অংশীদারদের সহযোগিতা করা।
- আন্ত-ধর্মীয় পারস্পরিক আলোচনার আহবান করা।
- বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- সংঘাত নিরসনে আন্তজার্তিক শিক্ষায় সহযোগিতাকরণ।
- এবং মালাদে মন প্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চলের তরুণ নেতৃবৃন্দকে পুনঃএকত্রিতকরণ।

[৫৩১] দৈনিক আমার দেশ, ২৩ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রী.

২০১৩ সালে PIN এবং TLDA(Treasureland Development Assoeciation) যৌথভাবে নরওয়েজিয়ান পিপলস এইচ এর আংশিক আর্থিক সহযোগিতায় “peaceful living in Harmony” এবং Emergency Rich Privention worldshop এর ব্যানারে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে মায়ানমারের কিছু প্রদেশে ডায়লগের ব্যবস্থা করে এবং তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে।

এছাড়া PIN ইয়াঙ্গুন এবং মালাদে প্রদেশের একটি অলাভজনক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান SEDF(Simle Education and Development Foundation কে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে। এ কার্যক্রমের আওতায় ছিল সামাজিক উন্নয়নের জন্য ট্রেনিং দান, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সংযম ও সহনশীলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য আন্তঃধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটানো।[৫৩২]

এছাড়া মায়ানমারের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহনশীলতার উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। মার্কিন রাষ্টদূত ডিরেক মিখেল আয়োজিত এক সভায় ইয়াঙ্গুনের আর্চবিশপ বো, Islamic Center of Mayanmer এর নেতা ইড আয়ে লুইন এবং বৌদ্ধ নেতা সিতাগু সায়াদ্ধ একত্রিত হয়ে দেশের স্বার্থে ধর্মীয় সহিংসতা বন্ধের জন্য জাতির কাছে জোড়ালো আবেদন জানান। তারা বলেন, আমরা সকল ধর্মের প্রত্যেক সদস্যের কাছে দাবী জানাচ্ছি। কেননা শান্তিই আমাদের দেশের একমাত্র পথ। আমরা লক্ষ্য করেছি সাম্প্রতিক আন্তঃধর্মীয় সহিংসতায় আমাদের সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বহু নিরীহ নারী-পুরুষ নিহত হয়েছে এবং অনেক মানুষ বাসস্থান হারিয়েছেন। এটা আমাদের সংস্কৃতির জন্য একটি দঃখজনক ঘটনা।

Agenzia Fides তাদের উদ্যোগ সম্পর্কে প্রকাশ করে,

> “Religious leaders underline emphatically that "no religion teaches hatred," and urge the faithful of all communities to "avoid hate speech against members of other religions," stressing that "these conflicts may postpone the process of reforms in the nation." The urgent issues for the people, they say, are "education, health care, and human development," which can only be "in a climate of mutual respect, acceptance of the principles of unity and diversity, and tolerance." The statement also calls on all religious leaders to "lead by example through marches and meetings to promote peace and religious harmony."[৫৩৩]

---

[৫৩২] http://www.bbc.com/news/world-asia-18395788

[৫৩৩] Agenzia Fides, 28th June, 2013

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শ্রীলংকা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মায়ানমার এর মত শ্রীলংকাতেও মুসলিম সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা ধর্মীয় সহিংসতার শিকার হচ্ছে। দেশটিতে চরম সাম্প্রদায়িক সংঘাত বিরাজ করছে। বিবিসি ও এএফপি সূত্রে জানা যায়, শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় বৌদ্ধভিক্ষুদের নেতৃত্বে শত শত মানুষ মুসলিমদের মালিকানাধীন পোশাকের দোকানে হামলা চালিয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অনেকে। বিবিসির ধারণ করা ছবিতে দেখা গেছে, বৌদ্ধভিক্ষুরা কলম্বোর একটি জনপ্রিয় পোশাক কেন্দ্রের মুসলিম মালিকানাধীন বিভিন্ন দোকানে পাথর ছুড়ছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ওই এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। এদিকে মায়ানমারের মধ্যাঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এ অঞ্চলে বসবাসরত অনেক মুসলিম বাসিন্দাই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। মুসলিমদের জীবনধারার বিরুদ্ধে শ্রীলংকার কট্টরপন্থী বৌদ্ধদের আন্দোলনের ডাক দেয়ার ধারাবাহিকতায় এ হামলা চালানো হয়েছে। এ হামলার পরিপ্রেক্ষিতে দেশটিতে মুসলিমদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আলোচনার জন্য আইনমন্ত্রী রউফ হাকিম প্রধানমন্ত্রীর কাছে মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক ডাকার আহ্বান জানিয়েছেন। রউফ হাকিম নিজে একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে শ্রীলংকার সেনাবাহিনী চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করার চার বছর পর দেশটিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটল। শ্রীলংকার সংখ্যারিষ্ঠ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। দেশটির তিক্ত গৃহযুদ্ধের সময় থেকেই তামিল ভাষাভাষী সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিম্ন মর্যাদায় জীবনযাপন করতে হচ্ছে। সংখ্যায় তারা দেশটির মোট জনসংখ্যার ৯ শতাংশ। কিন্তু এখন কট্টক আদিবাসী বা গোত্রীয় সংখ্যাগরিষ্ঠরাও তাদের হামলার লক্ষ্যে পরিণত করছে। কলম্বোয় বিবিসির প্রতিবেদক বলেন, প্রায় ৫শ' মানুষ চিৎকার করে পোশাকের দোকানের মুসলিম মালিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও নাজেহাল করে। এ সময় দায়িত্বরত সাংবাদিকদেরও তারা হুমকি-ধমকি দেয়। হামলার ও ঘটনায় ৫-৬ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ক্যামেরাম্যানও রয়েছেন যার শরীরে সেলাই দিতে হয়েছে। পুলিশ শুরুতে এ ঘটনায় দর্শকের ভূমিকা পালন করলেও পরে এটি ছড়িয়ে পড়ার মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। পুলিশের মুখপাত্র বুদ্ধিকা সিরিওয়ার্দেন বলেন, 'আমরা বিশেষ বাহিনীর বাড়তি সদস্যদের পরিস্থিতি মোকবিলায় নিয়োজিত করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।' তবে এতে কাউকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি বলেও তিনি জানিয়েছেন। টেলিভিশন ফুটেজে দেখা গেছে, পোশাকের দোকানের কাচের দেয়াল ভেঙে কাপড় চোপড় রাস্তায় এনে ফেলে দেয়া হয়েছে। শ্রীলংকার নববর্ষকে সামনে রেখে সে সময় কট্টর বৌদ্ধগোষ্ঠী মোবাইলে ক্ষুদ্রবার্তায় মুসলিমদের মালিকানাধীন দোকান থেকে পোশাক না কেনার আহ্বান জানায়।

শ্রীলংকায় মুসলিমদের জীবনধারা ও হালাল খাবার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বৌদ্ধ উগ্রবাদীদের চালানো প্রচারণা ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মুসলিম গোষ্ঠী ধর্মঘটের ডাক দেয়ার পর দেশটির সরকারে শরিক কট্টরপন্থী বৌদ্ধ রাজনৈতিক দল এক বিবৃতিতে জানায়, 'সিংহলি বৌদ্ধদের এ ধরনের মুসলিম উগ্রবাদীদের এমন শিক্ষা দেয়ার সংকল্প গ্রহণ করা উচিত, যেন তারা (মুসলিম) কখনও তা ভুলে যেতে না পারে।' মিয়ানমারের মধ্যাঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এ অঞ্চলে বসবাসরত অনেক মুসলিম বাসিন্দাই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। গুজবে উত্তেজিত বৌদ্ধরা দলবেঁধে হামলা চালাচ্ছে দেশটির সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপাসনালয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়ি-ঘরে।

মধ্যাঞ্চলের সিত কউয়িন গ্রামের দুই হাজার বাসিন্দার মধ্যে মাত্র একশ' জনের মতো ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিল। হামলার পর এদের অধিকাংশই এলাকা ছেড়ে অজানার পথে পা বাড়িয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট এবং ধর্মীয় উপাসনালয় (মসজিদ) ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ঘর-বাড়ি ছেড়ে কেউ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, কেউ বা বন্ধু বা আত্মীয়দের বাড়িতে আত্মগোপন করেছে। তবে তাদের মধ্যে অনেককেই হত্যাও করা হয়েছে।

এক মুসলিম দোকানির কথা বলতে গিয়ে সিত কিউয়িনের ২৪ বছর বয়সী ট্যাক্সিচালক অং কো মাইন্ত বলেন, 'তারা কোথায় আছে আমরা জানি না, হামলাকারীরা আসার আগ মুহূর্তে সে পালিয়ে যায়।'

২০ মার্চ কট্টর বৌদ্ধরা মধ্যাঞ্চলীয় মেইখতিলা টাউনে দাঙ্গার সূত্রপাত করার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪২ জন নিহত হয়েছে। এরপর আরও অন্তত ১০টি শহর ও গ্রামে তারা দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। মুসলিমবিরোধী উস্কানিতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সাধারণ বৌদ্ধরা। টেলিফোন, ফেইসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিচালিত '৯৬৯ আন্দোলন' এসব গুজব সাধারণ বৌদ্ধদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়। বুদ্ধ থেকে নেয়া এই তিনটি সংখ্যা বুদ্ধের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করে, এর মধ্যে তার শিক্ষা ও ভিক্ষুত্ব অন্যতম। কিন্তু মিয়ানমারে এটি মুসলিমবিরোধী জাতীয়তাবাদী উগ্রপন্থী প্রতিনিধিত্ব করছে। এই আন্দোলন বৌদ্ধদের মুসলিম পরিচালিত দোকানপাট ও সেবা বয়কট করার আহ্বান জানায়। চারদিন আগে থেকে সিত কউয়িনে সমস্যা শুরু হয়। ৩০টি মোটরসাইকেলে চড়ে বহিরাগত কিছু লোক গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে মুসলিম প্রতিবেশীদের বয়কট করার আহ্বান জানায়। এরপর তারা একটি মসজিদ ও মুসলিম মালিকানাধীন একসারি দোকানপাট ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করে।

পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, 'গুজবে উত্তেজিত হয়ে তারা এখানে আসে।' তিনজন বৌদ্ধভিক্ষুর নেতৃত্বে ত্রিশটি শক্তিশালী গোষ্ঠী শুক্রবার একটি মসজিদের দিকে রওয়ানা হয় হলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশি বাধার মুখে লাঠিধারী এসব দাঙ্গাকারী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। 'এরপর এ ধরনের আর কিছু হতে দেব না আমি,' বলেন পুলিশ কমান্ডার ফোনি। পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণের জন্য গতকাল পুলিশকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। তবে মিয়ানমারে নিযুক্ত জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি বলেছেন, মেইখতিলার সাম্প্রতিক সহিংসতায় রাষ্ট্রীয় যোগসাজশ থাকার অভিযোগ পেয়েছেন তারা।

শ্রীলংকার এই সাম্প্রদায়িক সংঘাত সম্পর্কে NYU এর রাজনীতির অধ্যাপক Maha Hosain Azis সিএন এন কে প্রদত্ত তার বক্তব্যে বলেন,

"In Sri Lanka, for example, reports surfaced in January that eight Buddhist monks were involved in an attack on two churches in the southhern town of Hikkaduwa. Another group, the Buddhist Power Force, is said to have been targeting Muslim minorities, and has pushed to ban headscarves, halal foods and other Muslim businesses. In July 2013, Buddhist mobs reportedly attacked a mosque in the north-central town of Dambulla; in August that year, a mosque was attacked in Colombo, sparking clashes between Buddhists and Muslims that left at least a dozen people injured. Sadly, the response from the Sir Lanka government, distracted as it is by the ongoing fallout since the end of the civil war with the Tamil Tigers, has been muted at best". [৫৩৪]

আল জাজিরা সংবাদ মাধ্যম দ্বারা জানা যায়, শ্রীলংকার প্রধান মুসলিম দল শ্রীলংকান মুসলিম কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের ব্যাপক ক্ষমতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে বিরোধীদলকে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শ্রীলংকার মুসলিম কংগ্রেস নেতা রউফ হাকিম একই সাথে বিচার মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের কথাও ঘোষণা করেছেন।

বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ট দেশটির সংখ্যালঘু মুসলমান দলটির নেতৃত্বস্থানীয় সদস্য আমির ফয়েজের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি রাজাপাকসের সরকারের "ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি অসহিষ্ণুতার" এবং তার শাসন নীতির ব্যাপারে তাদের মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৌদ্ধ চরমপন্থী গ্রুপগুলোর প্রতি সমর্থন দেওয়া এবং তাদের মুসলিম বিরোধী সহিংসতার ব্যাপারে চোখবুজে থাকায় রাজাপাকসে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। হাকিমের পদত্যাগ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোন মন্তব্য জানা যায়নি, তবে ক্ষমতাসীন দল সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে যে, মুসলিম দলের পদত্যাগ তাদের

---

৫৩৪ http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2014/03/28/is-asia-facing-a-new-wave-of-religious-extremism/

নির্বাচনী প্রচেষ্টায় একটি বড় ধরনের আঘাত। শ্রীলংকায় মুসলমানেরা হলো হিন্দু তামিলদের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। দেশটির প্রায় ১০ শতাংশ ভোটার হলেন মুসলমান। সংখ্যাগুরু সিংহলিরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জয় পরাজয় নির্ধারণে তারা প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। রাজাপাকসে ও সিরিসেনা উভয়েই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। হাকিমের আগে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী রিশাদ বদিউদ্দিন পদত্যাগ করেন। খোদ সিরিসেনাও গত মাসে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে বিরোধীদলে গিয়ে যোগ দেন। দেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের এমন দ্বিধা বিভক্ত বৈরী মনোভাবাপন্ন অবস্থায় সাবেক প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিলেন। উগ্রবাদী ও সরকারী বাহিনী যখন হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস ও তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করছে তখন তিনি দেশের সকল ধর্মীয় নেতা, সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে দেশের এই অরাজকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আন্তঃধর্মীয় সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য আহবান জানান। ধর্মীয় নেতাদের সাথে আলোচনার পূর্বে তিনি বিরোধীদলের নেতা অনিল বিক্রমা সিংহের ও ৪ সদস্য বিশিষ্ট UNP Leadership Council এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং South Asia Policy and Research Institute (SAPRI) কর্তৃক প্রদত্ত একটি রিপোর্ট হস্তান্তর করেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীলংকার প্রতিটি ধর্মের প্রতি সম্মান এবং সহনশীলতা প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। রিপোর্টে আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, ধর্মীয় সহনশীলতাই পারে সমাজে চলমান অরাজকতা ও বিশৃংখলার শিকড় উপড়ে ফেলে হৃদ্যতা ভাবাপন্ন সম্পর্ক স্থাপন করতে। তিনি SAPRI কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়গুলোকে সমর্থন করার আকুল আবেদন জানান। অনিল বিক্রমাসিংহেও SAPRI এর রিপোর্টকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং ধর্মীয় সহনশীলতার মাধ্যমেই সমাজের সমস্ত বিশৃংখলাকে দূর করে যুদ্ধোত্তর একটি সুন্দর দেশ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখা সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও চীন

সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের রোজা রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইসলামী বিশ্বের প্রতি প্রকাশ্য উসকানি । রমজানের ঠিক আগে চীনের মুসলিম অধ্যুষিত দক্ষিণের প্রদেশে শিনজিয়াংয়ের একটি গ্রামে বিয়ার উৎসব করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। শিনজিয়াংয়ে বসবাসরত উইঘুর মুসলমানদের ওপর বরাবরই ধর্মীয়ভাবে নিপীড়ন চালিয়ে থাকে চীনের কমিউনিস্ট সরকার। এখানে গত তিন বছর ধরে মুসলমানদের ওপর রোজা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

২০১৫ সালে নিয়া জেলায় বিয়ার উৎসবের আয়োজন করে স্থানীয় সরকার। নিয়ার অধিকাংশ বাসিন্দাই উইঘুর মুসলমান। কুরআনের বিধান অনুযায়ী, মুসলমানদের জন্য মদ ও মদজাতীয়

পানীয় হারাম। নিয়া জেলার সরকারি ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, রমজানের ঠিক আগে অনুষ্ঠিত বিয়ার প্রতিযোগিতায় ৬০ জনেরও বেশি তরুণ, কৃষক ও পশুপালক অংশ নিয়েছেন।

ওয়েবসাইটে দেয়া ছবিতে দেখা গেছে, একটি মঞ্চের সামনে নারীরা নাচছেন, আর মঞ্চে লাইন ধরে এক মিনিটে কে কতটা বিয়ার পান করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলছে। প্রতিযোগীদের পরনে ঐতিহ্যবাহী উইঘুরের টুপি ছিল। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের এক হাজার ইউয়ানের বেশি অর্থ পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয়েছে। খবরটি রোববার আঞ্চলিক সরকারের নিউজ ওয়েবসাইটে তুলে দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'আধুনিক সংস্কৃতি ব্যবহার করে গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনকে উজ্জীবিত করে ধর্মের অবৈধ আনুষ্ঠানিকতাগুলি সঙ্কুচিত করে গ্রামীণ ছন্দ ও স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে এ আয়োজন করা হয়েছে'। ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেসের মুখপাত্র দিলশাত রক্ষিত এ আয়োজনের নিন্দা করেছেন। এ ই-মেইল বার্তায় তিনি এ আয়োজনকে 'ইসলামি বিশ্বাসের প্রতি প্রকাশ্য উসকানি' বলেছেন।[৫৩৫]

২০১৪ সালে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলিম উইঘুর সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার স্বাধীনতা চেয়ে অনুষ্ঠিত মিছিলে লাঠিচার্জ করে দেশটির পুলিশ।

মুসলমানদের সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র মাহে রমজানে এবারও রোজা রাখতে পারছেন না চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়। প্রদেশটির সরকার এক ঘোষণায় জানিয়েছে, উইঘুর জনগোষ্ঠীর মুসলিমরা এবার পবিত্র রমজান মাসে কোনো রোজা রাখতে পারবেন না।

জিনজিয়াং কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সরকারি চাকরিজীবী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা রোজা রাখতে পারবেন না। সেই সঙ্গে মুসলিম মালিকানার সব রেস্টুরেন্ট খোলা রাখতে হবে। চীনের সরকারি ওয়েবসাইটগুলোতে রমজানের প্রথম দিন এ ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে।

জিনজিয়াংয়ের জিংহি এলাকার সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'পুরো রমজান মাসে হোটেল, রেস্টুরেন্টসহ খাদ্য পরিবেশনকারী স্থানগুলোর স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকবে।' একই প্রদেশের বোলে এলাকার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে, রমজানে কেউ রোজা রাখবেন না বা রাত্রিতে জাগাসহ অন্য কোনো ধর্মীয় কাজকর্ম করবেন না।'

প্রদেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত বোজৌ রেডিও এবং তারফাং শহরের বাণিজ্যবিষয়ক ব্যুরো একই ঘোষণা দিয়েছে বলে জানায় সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট।

উইঘুর কংগ্রেসের মুখপাত্রের বরাতে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষ উইঘুররা রমজান পালন করছে কি না তা তদন্ত করতে বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিচ্ছে।

এর আগে ২০১৪ সালে চীনের মুসলিম জিনজিয়াং প্রদেশে লম্বা দাঁড়ি রাখা এবং বাসে ভ্রমণের সময় ইসলামী পোশাক পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আল-জাজিরার খবরে বলা

[৫৩৫] দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৩ জুন, ২০১৫ খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে– একই বছর আগস্টে জিনজিয়াংয়ের কারাম অঞ্চলে হিজাব, বোরখা ও লম্বা দাড়ি নিষিদ্ধ করা হয়।[৫৩৬]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু দেশের অভিবাসীর বসবাস। এরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী। মার্কিনী এবং এসব অভিবাসীরা ধর্মীয় সহনশীলতার সাথে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করে এসেছে। তবু মাঝে মাঝে মার্কিন নাগরিকদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রচেষ্টা দেখা যায়। যেমন, মিথ্যা প্রচারণার উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যক্তরাষ্ট্রের ওকলোহামা সিটিতে বোমা হামলার ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যায়। ১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল টিমোথি ম্যাকভে Timothy Mcveigh নামে প্রথম ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক হতাশাগ্রস্ত মার্কিন সৈনিক ওকলোহামা সিটির একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে ১৬৮ জন মার্কিন নাগরিক নিহত হয় এবং ৫৮০ জন আহত হয়। অথচ বোমা হামলার সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রকার তথ্যপ্রমাণ এবং অনুসন্ধান ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও ইসরাইলের প্রচার মাধ্যমে কথিত মুসলমান সন্ত্রাসীদের দায়ী করা হতে থাকে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পশ্চিমের সর্বত্র রব তোলা হয়, মুসলমানরা আবার আঘাত হেনেছে। অথচ সত্য উদঘাটিত হলে দেখা গেল, এই হামলার সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সংশ্রবই ছিল না। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী একাধিক মার্কিন নাগরিক মিলে ঐ সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে।[৫৩৭]

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবী ব্যাপী এই মুসলিম বিদ্বেষ তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে টুইন টাওয়ার হামলার ঘটনার পর। নিউইয়র্ক সিটিতে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১- এ দুটি সন্ত্রাসী প্লেন এ্যাটাকে ম্যানহ্যাটনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়। প্রায় একই সময়ে রাজধানী ওয়াশিংটনে এবং পেনসেলভানিয়াতে আরো দুটি সন্ত্রাসী প্লেন এ্যাটাক হয়। এই চারটি আক্রমণে চারটি প্লেনের ১৯ জন হাইজ্যাকার এবং সব প্লেনের সব যাত্রী ও বিভিন্ন ভবনের ২,৯৭৭ অধিবাসীসহ, সেই দিন মোট ২,৯৯৬ জন মানুষ নিহত হয়। আহত হয় ৬,০০০-এর বেশি। ধারণা করা হয় ১৯ জন হাইজ্যাকারই ছিল আল কায়েদা সংস্থার সদস্য আরব মুসলিম।

সারা আমেরিকার মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার আকাংখা কিছু আমেরিকানের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। এই ক্ষুব্ধ আমেরিকানদের অন্যতম ছিল ডালাসের এক ডে লেবারার বা দিনমজুর, মার্ক এন্টনি স্ট্রোম্যান ৩১। সে প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ ডালাসে ইলাম রোডে একটি গ্রোসারি স্টোরে কাজ করছিলেন পাকিস্তানি বংশ উদ্ভুত ওয়াকার হাসান ৪৬। স্ট্রোম্যান সেই দোকানে ঢুকে গুলি করে ওয়াকারকে খুন করে।

[৫৩৬] http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=18292#sthash.7BDzPX1u.dpuf
[৫৩৭] আমার দেশ, ৩ এপ্রিল ২০১৩

এর ছয় দিন পর স্ট্রোম্যান তার দ্বিতীয় শিকারের লক্ষ্যে যায় ডালাসের সাউথ বাকনার বুলেভাতে পেট্রলপাম্প সংলগ্ন একটি মিনিমার্টে। সেখানে ক্যাশিয়ারের কাজ করছিলেন বাংলাদেশী রইস। রইসকে তার বস বলে রেখেছিল, কখনো কোনো আগন্তুক এসে যদি বন্দুক দেখিয়ে ডলার চায়, তাহলে ক্যাশে দেড়শ ডলার রেখে বাকি সব ডলার বিনা বাক্য ব্যয়ে আগন্তুককে দিয়ে দিতে। রইসের মিনিমার্টে মাঝেমধ্যে আগন্তুকরা আসত চোরাই ল্যাপটপ, টিভি প্রভৃতি বিক্রির আশায় । সেদিন ভরদুপুরে ওই আগন্তুকের হাতে ল্যাপটপ বা টিভি ছিল না। ছিল একটি শটগান। তার মাথা ছিল ন্যাড়া । দেহ ছিল উল্কি বা ট্যাটু আঁকা । পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী রইস তার ক্যাশ বক্স খোলেন। কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে স্ট্রোম্যান জিজ্ঞাসা করে তোর দেশ কোথায় ? হোয়ার আর ইউ ফ্রম? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর রইস দেওয়ার আগেই স্ট্রোম্যান সরাসরি তার মুখে গুলি করে। সে মারা গিয়েছে ভেবে স্ট্রোম্যান চলে যায়। রক্তাক্ত রইস কোনো রকমে পাশের দোকান, একটি হেয়ার ড্রেসিং শপে যান। সেখান থেকে পুলিশে ফোন করা হয়। এরপর পুলিশ যখন আততায়ীকে খুঁজছিল তখন স্ট্রোম্যান তার তৃতীয় শিকারের লক্ষ্যে তৎপর হয়। ৪ অক্টেবর ২০০১-এ টেক্সাসের মেসকিট শহরে ইনডিয়ান বংশ উদ্ভূত বাসুদেব প্যাটেলকে ৪৯ সে খুন করে।[৫৩৮]

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে চলন্ত ট্রেনের সামনে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে প্রবাসী বাঙালিকে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া মার্কিন নারী এরিকা মেনেনডেজের ৩১ বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। আদালতে তিনি স্বীকার করেছেন, ২০০১ সালে নিউইয়র্কে সন্ত্রাসী হামলার পর তার মধ্যে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ তৈরি হয়। এটি থেকেই তিনি ভারতীয় বাঙালি সুনন্দ সেনকে ৪৬ ধাক্কা মেরে ট্রেনের নিচে ফেলে দেন। এশীয় চেহারা দেখে সুনন্দকে মুসলমান মনে করেছিলেন বলে স্বীকার করেন মেনেনডেজ। মেনেনডেজের বিরুদ্ধে কুইন্সের ফৌজদারি আদালতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। শুনানিকালে তিনি অস্বাভাবিক আচরণ করেন। আদালতকক্ষে তিনি এতটাই হাসাহাসি করেন যে, বিচারক তাকে মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার নির্দেশ দেন। পুলিশ কর্মকর্তা পল ব্রাউন জানাল, মেনেনডেজ তার অপরাধের কথা স্বীকার করেছেন। তার বিরুদ্ধে ‘সেকেন্ড ডিগ্রি মার্ডার’ বা পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া হত্যার অভিযোগ করা হয়েছে।

নিউইয়র্কের কুইন্স সাবওয়ে ষ্টেশন গত ৩০/১২/১৪ বৃহস্পতিবার ভারতীয় অভিবাসী সুনন্দ সেনকে চলন্ত ট্রেনের সামনে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে হত্যা করেন মেনেনডেজ। সুনন্দ অবিবাহিত এবং মা-বাবাও বেঁচে নেই। কলকাতার এই বাসিন্দা কয়েক দশক ধরে কুইন্সে বসবাস করে আসছিলেন। এর আগে গ্রেপ্তারের পর পরই পুলিশের জেরার মুখে মেনেনডেজ বলেন, সুনন্দকে দেখে মুসলিম মনে হওয়ায় তিনি তাকে ট্রেনের নিচে ধাক্কা মারেন। তিনি বলেন, ‘২০০১ সালের পর থেকে আমি হিন্দু ও মুসলমানদের ঘৃণা করে আসছি। তারা টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে দিয়েছে।[৫৩৯]

---

[৫৩৮] শফিক রেহমান, “টেক্সাসে খুন ও ক্ষমা এবং নিয়মিত টানে একজন বাংলাদেশী” প্রকাশিত ‘দৈনিক নয়া দিগন্ত’, ১৪ অক্টোবর ২০১৪ খ্রী।

[৫৩৯] টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে প্রকাশিত দৈনিক প্রথম আলো, ১লা জানুয়ারী ২০১৩ খ্রী

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হলেও এসকল দেশে দৃশ্যমান কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনীহাকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী করতে চান বিশ্বের গবেষকগণ। তারা আরও দাবী করতে চান রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকাই যথেষ্ট বিশ্বের এসকল দেশসমূহের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নিরসনে। গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে একথাও দৃশ্যমান হয় যে, বেশীরভাগ দেশে মুসলমানরাই সাম্প্রদায়িক রোষানলে পিষ্ট। আর সে কারণেই বিশ্বব্যাপী মুসলমানগণ তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে সদা ব্যর্থ হচ্ছে। এজন্য মুসলমানরা নিজেরাও অনেকাংশেই দায়ী। কেননা মুসলমানরা প্রায়ই তাদের মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে না। ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানদের ছিল মূল্যবোধ ভিত্তিক যুগ, ছিল সোনালী যুগ। সে যুগের আদর্শ থেকে বিচ্যুতিই তাদেরকে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে অবহেলিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। অনেকটাই শক্তি-সামর্থ্য হারানোই মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িকতার রোষানলে পতিত হতে মদদ যোগায়। তাই বিশ্ব বিবেককে মুসলমানদের প্রতি যথোচিত আচরণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের মাধ্যমেই কেবল বিশ্বভ্রাতৃত্ব গঠন করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

গবেষণার প্রাপ্তি/অর্জন/আবিষ্কার

উপরোক্ত গবেষণার মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয় বেরিয়ে এসেছে। যেমন-

১. ইসলাম একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। এতে রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিময় সহাবস্থানের দিক নির্দেশণা।

২. বাংলাদেশ ও পৃথিবী ব্যাপী ইসলামকে সাম্প্রদায়িক, সহিংস ও বর্বর আখ্যা দিয়ে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত অথবা ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলাফল।

৩. অধিকাংশ মুসলমান ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান করছে। আর এটি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের মনে ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাবের জন্ম দিচ্ছে।

৪. মুসলমানদের মধ্যকার আবেগপ্রবণ ও গোঁড়া মানসিকতা তাদেরকে উগ্রপন্থী হতে প্রেরণা যোগায়।

৫. মুসলমানদের নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বলে প্রতীয়মান হওয়া।

৬. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যে নীতিমালা রয়েছে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছে মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাচারণে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে তাদের পরিচালিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায়।

৭. অশান্ত, সহিংস বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের নির্দেশনাই হতে পারে একমাত্র এবং কার্যকরী সমাধান।

৮. বাংলাদেশে আবহমান কাল থেকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান। তবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা-সংঘাত যা কিছু ঘটেছে তার কারণ হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থই ছিল মুখ্য ।

৯. আন্তর্জাতিক বিশ্বে সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উভয়ই দৃশ্যমান। নাইন ইলেভেন এর পর থেকে সৃষ্ট মুসলিম বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িক সহিংতার জন্ম দিচ্ছে।

১০. অনেকক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বিরোধী বলয় কর্তৃক মুসলিম দেশগুলোকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার প্রচেষ্টা।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা

১. বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান জাতিকে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২. মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করে এর প্রকৃত বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৪. যারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত তাদের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরার সামষ্টিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫. প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বিশেষ করে ও আই সি এবং আরবলীগের মত প্রতিষ্ঠানসমূহ মুসলিম জাতি বা ইসলাম সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. বিশ্বব্যাপী ইসলামের পক্ষে শক্তিশালী মিডিয়া চালুর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে ইসলাম তথা মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৭. মুসলিম ফকীহ্গণের গবেষণালব্ধ ও যুগোপযোগী বিবৃতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের অনন্তর প্রচেষ্টা থাকা।

৮. অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরী করতে এবং পারস্পরিক ভ্রান্ত ধারনা নিরসনে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ব্যবস্থা করা।

৯. গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, চলচ্চিত্র, নাটক, সামাজিক গণমাধ্যম, ব্লগ, টুইটার প্রভৃতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূল্যবোধের সংস্কৃতিকে উপস্থাপনের প্রয়াস করা যেতে পারে।

১০. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্য এ অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায় পৃথক ভাবে গবেষণা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ও সমাপ্তি

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম মহান আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে সমস্ত মানবকূলের জন্য যথোচিতরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। যা ছিল তৎকালীন সময়োপযোগী এবং ইতিহাসের সকল সময়ের জন্য। এটি যেন সাবলীল ও গ্রহণযোগ্যরূপে মানবকূলের সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হতে পারে সে ব্যাপারেও মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের ঘোষণা পবিত্র কুর'আনুল মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্য মূলতঃ প্রতিভাত হয় এই ব্যবস্থার কল্যাণমূলক গুরুত্বের কারণে যা সাময়িক নয় বরং চিরন্তন ও স্থায়ী। দৃশ্যতঃ ইসলামের নির্দেশনা পালন প্রাথমিকভাবে কষ্টসাধ্য মনে হলেও এর ফলাফল যুগান্তকারী। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহ প্রদত্ত বাণীর প্রচার ও পালনে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। সাময়িকভাবে কখনও কখনও অত্যাচার ও নির্মমতার স্বীকার হলেও শেষ পরিণতিতে সাবলীল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত পৃথিবী তারা উপহার দিয়েছিলেন যা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়। সাময়িক ঝঞ্ঝা মোকাবেলায়ই তারা সফল ছিলেন না বরং স্থায়ী সমস্যা সমাধানের পথ তারা বাতলিয়েছিলেন। পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা অসীম ধৈর্য্য, সাহসিকতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। এটা তারা করতে পেরেছিলেন কারণ তারা ছিল ঐশী মদদে লালিত ও নির্দেশিত। তাদের সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া কখনই কারও প্রতি যুলম করেনি; বরং নিষ্কলুস ও ন্যায়বিচারের মোহনীয় দৃষ্টান্ত তারা উপস্থাপন করেছিলেন। অন্য ধর্ম, মত ও পথ যেখানে গোষ্ঠী স্বার্থকে বড় করে দেখে যুগে যুগে অত্যাচারী শাসকগণ জনগণকে নানাভাবে অত্যাচার ও অনাচার করেছে। সেখানে ইসলামের ইতিহাসে সকল জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে আমলে নিয়ে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সকল মুসলমান শাসকেরা তাদের রাষ্ট্র তথা সমাজব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন। যেখানে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নয় বরং গোষ্ঠীগত সখ্যতাই ছিল প্রধান। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যখনই জালিম শাসক জনগণের উপর সওয়ার হয়েছে, তখনই মহান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যুলম থেকে রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। যারা প্রেরিত হয়েছিলেন তথাকথিত সময় পরিবর্তনের বাহক হিসেবে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় ছিলনা কোন সাম্প্রদায়িক অনাচার। ছিল ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক অনন্য প্রচেষ্টা। শুধু শান্তিকালীন সময়ে নয়; সংকটকালীন সময়েও তারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে শান্তির জন্য ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তিত মদীনা সনদের উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যুদ্ধবন্দীদের সাথে শোভনীয় আচরণের মাধ্যমে মানব ইতিহাসে ক্ষমা প্রদর্শনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন। শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে ক্ষমা করা ও তাদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হয়ে আচরণ

করার শিক্ষা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা ইসলামের সর্বশেষ নবী দেখিয়েছিলেন। তার খুলাফায়ে রাশেদীনও তাঁকে অনুসরণ করে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বরোপ করেছেন। তাদের শাসনকালে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় ছিল। বাংলাদেশেও আবহমান কাল থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজমান। এদেশে এবং সমগ্র বিশ্বে যেসব সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সংগঠিত হয়েছে তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ সকল ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থ সিদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এহেন অবস্থার বিবেচনায় একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। বরঞ্চ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে অনাবিল সুখের সমাজ তথা রাষ্ট্র বিনির্মাণ করাই ইসলামী আদর্শের মূল উদ্দেশ্য। এ সত্ত্বেও মানবহিতৈষী এই মহান ধর্মকে বিভিন্ন মহল থেকে নানাভাবে সাম্প্রদায়িক, যুদ্ধবাজ ও সন্ত্রাসীদের ধর্ম বলে আখ্যা দেয়া হয়। তাদের এই অপ্রামাণ্য ঘোষণার মূলোৎপাটনে এই অধ্যয়নটি গবেষণার জগতে বিরোধীদের প্রোপাগাণ্ডা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই গবেষণার মাধ্যমে প্রতীয়মান হল যে, ইসলাম সাম্প্রদায়িক নয়; বরং ইসলাম প্রবর্তিত মৌলনীতির প্রয়োগে বিশ্ব ব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আনয়ন সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমদ, *তাহযিবুল লুগাহ*,(বৈরুতঃ দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০১ খ্রী.)

২. আবুল হাসান আহমদ ইব্‌ন ফারিস আররাযী, *মু'অজামু মাক্বাইলিল লুগাত*,(দামেশকঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রী.)

৩. আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মাওয়ার্দী, *তাফসীরে মাওয়ার্দী*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)

৪. আবু নায়ীম আহমদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, *মা'অরিফাতুস সাহাবাহ*, (রিয়াদঃ দারুল ওয়াতানি লিন নাশর, সৌদী আরব,১৯৯৮ খ্রী.)

৫. আবুল ফিদা ইসমাইল ইব্‌ন কাছীর, *সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, (বৈরুতঃ দারুল মা'অরিফাতি লিত ত্ববা'আতি ওয়া নাশরি ওয়াত তাওযিই'য়ি, ১৯৭৬ খ্রী.)

৬. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল আজীম*, (দারুত ত্বয়্যিবাতু লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৯৯ খ্রী.)

৭.

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস(রা.), *তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.)

৮. আব্দুল মালেক ইব্‌ন হিশাম, *সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ* , (মিসরঃ শিরকাতু মাকতাবাতু ওয়া মাতবা'আতু মুসতাফা আলবাবী আলহালবী ওয়া আওলাদিহি, ১৯৫৫ খ্রী.)

৯. আল্লামা সাফিউর রহমান মুবারকপুরী ,*আর রাহীকুল মাখতুম*, (দামেশকঃ দারুল 'উসামা, ১৪৬৭ হি.)

১০. আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল কুরতুবী, *তাফসীরে কুরতুবী*, (কায়রোঃ দারুল কুতুবীল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রী.)

১১. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত তিরমিযী, *জামীউল কাবীর*, (বৈরুতঃ দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রী.)

১২. আবু বকর আহমদ ইব্‌ন হুসাইন আলবায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রী.)

১৩. আবু 'আব্দুল্লাহ আল হাকিম আন নিশাপুরী, *আল মুসতাদরাক আস সাহীহাইন*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.)

১৪. আবুল ক্বাসেম তাবারানী, *মু'অজামুল কাবীর*, (কায়রোঃ মাকতাবু ইব্ন তাইমিয়াহ, ১৯৯৪ খ্রী.)

১৫. আবু মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ দারেমী, *মুসনাদুদ দারেমী আল মা'রুফ*, (সৌদী 'আরবঃ দারুল মুগনী, ২০০০ খ্রী.)

১৬. আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আশশায়বানী, *মুসনাদে আহমদ*, (সৌদী 'আরবঃ মু'সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রী.)

১৭. আবু দাউদ সুলাইমান, *সুনানে আবি দাউদ*, (বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুল আসারিয়্যাহ, তা.বি.)

১৮. আবুল ক্বাসেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ আত ত্বাবারানী, *আল মু'আজামুল কাবীর*, (কায়রোঃ মাকতাবাতু ইব্ন তাইমিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১ম সংস্করণ ১৯৯৪ খ্রী.)

১৯. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা, *সুনানে তিরমিযী*, (মিসরঃ শিরকাতু মাকতাবাতু ওয়া মাতবা'আতু মুসত্বফা আল বাবিল হালবী, ১৯৭৫ খ্রী.)

২০. আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইব্ন শুয়াইব আন নাসায়ী, *সুনানুল কুব্রা*, (মিসরঃ মু'অসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রী.)

২১. আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, (মিশরঃ মু'সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রী.)

২২. আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল আলামিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রী.)

২৩. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান আদ দারিমী, *মুসনাদুদ দারিমী*, (সৌদী 'আরবঃ দারুল মুগনী লিন নশর ওয়াত তাওযী'অ, ২০০০ খ্রী.)

২৪. আহমদ ইব্ন হুসাইন আল বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রী.)

২৫. আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হাব্বান, *সহীহ ইব্ন হাব্বান*, (বৈরুতঃ মুসাসাতুর রিসালাত, ১৯৯৩ খ্রী.)

২৬. আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ আত ত্বারানী, *মু'অজামুল কাবীর*, (কায়রোঃ মাকতাবাতু ইব্ন তাইমিয়াহ, ১৯৯৪ খ্রী)

২৭. আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল জুরজানী, *কিতাবুত তা'রিফাত*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রী.)

২৮. আবুল হুসাইন আহমদ ইব্ন ফারিস আর রাযী, *মু'অজামু মাকাইসুল লুগাহ*, (দামেশকঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি.)

২৯. আলেমদের একটি জামা'আত, *মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, (কুয়েতঃ ওয়ারাতুল আওকাফি ওয়াশ মুয়ুনিল ইসলামিয়্যাতি, তা.বি.)

৩০. ড. আহমদ মুখতার, *মু'অজামু লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল মা'আছিরাহ*,(বৈরুতঃ'আলিমুল কুতুব, ২০০৮ খ্রী.)

৩১. ড. আহমদ আলী, *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ফেব্রুয়ারী ২০১০ খ্রী.)

৩২. ড. আহমদ আলী, *খলীফাতু রাসূলিল্লাহ আবূ বকর আছ ছিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৩ খ্রী.)

৩৩. আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*,(বৈরুতঃ দারু ইহয়াউত তুরাছ আল 'আরাবী, ১৯৮৮ খ্রী.)

৩৪. আবু 'উবায়েদ আল কাসেম ইব্ন আসসালাম আল বাগদাদী, *কিতাবুল আমওয়াল*, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.)

৩৫. আল্লামা জাললুদ্দীন সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, (মাকতাবাতু নাযারী মুসতাফা আল বায, ২০০৪ খ্রী.)

৩৬. আল্লামা মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী র., আল-লু'লু' ওয়াল মারজান, ড. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম সম্পাদিত, (ঢাকাঃ সোনালী সোপান প্রকাশন, ২০১৩ খ্রী.)

৩৭. আল্লামা শিবলী নোমানী ও আল্লামা সোলায়মান নদভী, *সীরাতুন নবী (সাঃ)*, (ঢাকাঃ সোলায়মানিয়া বুক হাউস, ২০০৯ খ্রী.)

৩৮. আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম, *আল খারাজ*, (মিসরঃ আল মাকতাবাতুন আযহারিয়্যাহ লিত তুরাছ, তা.বি.)

৩৯. আল্লামা শিবলী নুমানী, *আল ফারুক*, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া পুস্তকালয় লিমিটেড, জুন ২০১২ খ্রী.)

৪০. আল বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, (বৈরুতঃ দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, ১৯৮৮ খ্রী.)

৪১. আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ আল মিসরী, *ফুতুহুল মিসর ওয়াল মাগরিব*, (মাকতাবাতুছ ছাকাফাতুদ দিয়নিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.)

৪২. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত তিরমিযী, *জামীউল কাবীর*, (বৈরুতঃ দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রী.)

৪৩. আবু বকর আহমদ ইব্ন হুসাইন আলবায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা* (লেবাননঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রী.)

৪৪. আবু মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ দারেমী, *মুসনাদুদ দারেমী আল মা'রুফ*, (সৌদী 'আরবঃ দারুল মুগনী, ২০০০ খ্রী.)

৪৫. আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আশশায়বানী, *মুসনাদে আহমদ*, (সৌদী 'আরবঃ মু'সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রী.)

৪৬. আবু দাউদ সুলাইমান, *সুনানে আবি দাউদ*, (বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুল আসারিয়্যাহ, তা.বি.)

৪৭. আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা, *সুনানে তিরমিযী*, (মিসরঃ শিরকাতু মাকতাবাতু ওয়া মাতবা'আতু মুসত্বফা আল বাবিল হালবী, ১৯৭৫ খ্রী.)

৪৮. আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইব্ন শুয়াইব আন নাসায়ী, *সুনানুল কুব্‌রা*, (বৈরুতঃ মু'অসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রী.)

৪৯. আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ আত ত্বাবারনী, *মু'অজামুল কাবীর*,(কায়রো : মাকতাবাতু ইব্ন তাইমিয়াহ, ১৯৯৪খ্রী.)

৫০. আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল আলামিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রী.)

৫১. আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল, *মুসনাদ*, (বৈরুতঃ মু'সাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রী.)

৫২. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান আদ দারিমী, *মুসনাদুদ দারিমী*, (সৌদী 'আরবঃ দারুল মুগনী লিন নশর ওয়াত তাওযী'অ, ২০০০ খ্রী.)

৫৩. আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই, *রসূলুল্লাহর(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিপ্লবী জীবন*, মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান অনূদিত, (ঢাকাঃ নাকিব পাবলিকেশন্স, ২০০৯ খ্রী.)

৫৪. আহমদ ইব্‌ন হুসাইন আল বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা,* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রী.)

৫৫. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, নবম পুনমুদ্রণ, ২০১২ খ্রী.)

৫৬. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজ : নানা দিক*, (কলকাতাঃ দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০১১)

৫৭. আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাব্বান, *সহীহ ইব্‌ন হাব্বান*, (বৈরুতঃ মুসাসাতুর রিসালাত, ১৯৯৩ খ্রী.)

৫৮. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগষ্ট ২০০৬ খ্রী.)

৫৯. ড. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, (ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৩ খ্রী.)

৬০. আতাউর রহমান ও লেলিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমি*, (ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০খ্রী.)

৬১. ইব্‌নুল কায়্যিম আজ জাওযিয়া, *আহকামু আহলুয যিম্মাহ,* (দাম্মামঃ রামাদি লিন নাশর, ১৪১৮ হি.)

৬২. ইব্রাহীম মুস্তফা ও অন্যান্য, *আল মুআজামুল ওয়াসীত,* (কায়রোঃ দারুদ দাওয়াহ, তা.বি.)

৬৩. ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আমর আল আযদী, *সুনান*,(বৈরুতঃ আল মাকতাবাতু আসরিয়্যাহ, তা.বি.)

৬৪. ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আবুল হাসান আল কুশাইরী আন নিশাপুরী, *সহীহ,* (বৈরুতঃ দারু ইহয়াউত তারাছিল ‘আরাবী, ১৪২২ হি.)

৬৫. এ এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান ও মোঃ ইকবাল হুসাইন, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, (ঢাকাঃ লেখাপড়া প্রকাশনী, ২০১০ খ্রী.)

৬৬. কঙ্কর সিংহ, *বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ,* (ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রী.)

৬৭. খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ, *মহানবীর সীরাত কোষ*, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রী.)

৬৮. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, জুলাই ২০১৪ খ্রী.)

৬৯. জামালুদ্দীন ইউসুফ বিন হাসান, *মাহাদ্দুস সাওয়াব ফি ফাদায়িলী আমিরীল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাব*, (মদীনা: ইমাদাতুল বাহাছ আল ইলমি বিল জামিআতুল ইসলামিয়্যা, ২০০০ খ্রী.)

৭০. জামিল আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল মিসরী, *ইনতিশারুল ইসলামিল ফুতুহাতিল ইসলামিয়্যাহ যামানুর রাশিদীন*, (মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ: আল জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৯ হি.)

৭১. নুরুর রহমান, *হযরত ওসমান ইব্‌নে আফ্‌ফান(রা.)*, (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা. লি, ২০০১ খ্রী.)

৭২. নুরুর রহমান, *হযরত আলী ইব্‌নে আবি তালিব (রা.)* (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা. লি, ২০০৪ খ্রী.)

৭৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*, (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, অগ্রহায়ণ ১৪২০)

৭৪. নূর মোহাম্মদ, *বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রী.)

৭৫. নূহ-উল-আলম লেনিন, *বাঙালী সমাজ ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রী.)

৭৬. ড. পঞ্চানন সাহা, *হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, জুলাই ২০১১ খ্রী.)

৭৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *সাম্প্রদায়িকতা সংস্কৃতি ও জীবন*, (কোলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কার্তিক ১৪০৭)

৭৮. বদরুদ্দিন উমর, *সাম্প্রদায়িকতা*, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স,১৯৯৫ খ্রী.)

৭৯. মুহাম্মদ রাওয়াছু কাল'আযী এবং হামিদ সাদিক কানীবী, *মু'অজামু লুগাতিল ফুকাহা, দারুন নাফাইছ লিত তাবা'আতি ওয়ান নাশরী ওয়াততাওযী*, ১৯৮৮ খ্রী.)

৮০. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনের রাষ্ট্র ও সরকার*, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ ২০০০ খ্রী.)

৮১. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান আল খামীস, *উসূলুদ দীন 'ঈনদা আবু হানীফা*, (সৌদী আরবঃ দারুস সামা'ঈ,তা.বি.)

৮২. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন সালিহ, *আল ইসলামু উসূলুহু ওয়া মাবাদিউহু*, (সৌদী 'আরবঃ ওয়ারাতিশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাতি ওয়াল আওক্বাফি ওয়াদ দা'ওয়াতি ওয়াল ইরশাদ, ১৪২১ হি.)

৮৩. মুহাম্মদ বিন মুকরিম বিন আলী ও অন্যান্য, *লিসানুল আরব*, (বৈরুতঃ দারুস সাদির, ১৪১৪হি.)

৮৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪ খ্রী.)

৮৫. সায়্যিদ আতহার হুসেন, *গৌরবময় খিলাফত*, মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান অনূদিত, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৮ খ্রী.)

৮৬. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আবূ তাহের মেসবাহ অনূদিত, *হযরত আলী রা. জীবন ও খিলাফত*, (ঢাকাঃ রাহনুমা প্রকাশনী, ৭ জুলাই ২০১২ খ্রী.)

৮৭. সাইয়্যেদ ওমর তেলমেসানী, *শহীদে মেহরাব হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)*, (লন্ডনঃ আল কোরআন একাডেমী, ২০০৯)

৮৮. স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন, *দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন*, স্কোয়াড্রন লিডার আহসান উল্লাহ অনূদিত, (ঢাকাঃ অংকুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রী.)

৮৯. সেকেন্দার আলী শিকদার, *ওমর দি গ্রেট*, (ঢাকাঃ মফিজ বুক হাউজ, বৈশাখ ১৪০২)

৯০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *দ্বি-জাতি তত্ত্বের সত্য-মিথ্যা*, (ঢাকাঃ বিদ্যাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১০১১)

৯১. শরদিন্দু শেখর চাকমা, *সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংখ্যালঘুরা*, (ঢাকাঃ অংকুর প্রকাশনী, মার্চ ২০০৪ খ্রী.)

৯২. শামসুজ্জোহা মানিক, *ধর্ম ও শ্রেণীতত্ত্বের যাঁতাকলে বাঙ্গালী জাতি*, (ঢাকাঃ ব-দ্বীপ প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১০)

৯৩. রুহুল বা'আলবাক্কীএবং মুনীর বা'আলবাক্কী, *আল মাওরিদ*, (বৈরুতঃ দারুল 'ইলমী লিল মুল্লাইয়্যিন, ২০০৭ খ্রী.)

৯৪. রওশন আলী খোন্দকার সংকলিত, *সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় রাসূল (সা)*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ২০০৭ খ্রী.)

৯৫. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, লেখকমণ্ডলী, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০০ খ্রী.)

৯৬. *বাংলাপিডিয়া*, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ

৯৭. সাইয়্যেদ কুতুব ইব্রাহীম, *ফি যিলালিল কুর'আন*, (বৈরুত: দারুশ শুরুক্ব, ১৪১২ হি.)

৯৮. মুহাম্মদ বিন জাবীর আত ত্বাবারী, *জামিউল বয়ান ফি তা'য়ীলুল কুর'আন*, (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রী.)

৯৯. মালিক বিন আনাস, *মুআত্তা ইমাম মালিক*, (বৈরুত: দারুল ইহয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৭৫ খ্রী.)

১০০. শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)এর সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, (ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মার্চ ২০০৯ খ্রী.)

১০১. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা, (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন*, এপ্রিল, ২০০৯ খ্রী.)

১০২. মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কল, *হযরত আবু বকর (রা.)*, অনুবাদ: এ.বি.এম.এ. খালেক মজুমদার,(ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১ খ্রী.)

১০৩. মুহাম্মদ ইবন জারীর আত তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*, (বৈরুত: দারুত তুরাছ, তা.বি.)

১০৪. মালিক বিন আনাস, *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, (বৈরুত: দারু ইহয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৮৫ খ্রী.)

১০৫. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *খিলাফত রাশেদা*, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৪ খ্রী.)

১০৬. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, এপ্রিল, ২০০৯ খ্রী.)

১০৭. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনের রাষ্ট্র ও সরকার*, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ ২০০০ খ্রী.)

১০৮. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী, *বাংলাদেশে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব চর্চার স্বরূপ ও বিকাশধারা,* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, সেপ্টেম্বর ২০১৪)

১০৯. মুহাম্মদ আবদুল খালেক, *অন্ধকার যুগ ও মধ্যযুগে সাহিত্যচর্চা,* (ঢাকাঃ হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০৪)

১১০. সম্পদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০০ খ্রী.)

১১১. শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স)এর সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* , (ঢাকাঃ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মার্চ ২০০৯ খ্রী.)

১১২. যরকানী, *শরহুল মাওয়াহিবিল উলাদুননিয়া,* (মিসরঃ মাতবা'আতুল আযহাহরিয়া, ১৩২৮ হি.)

১১৩. ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, *আমিরুল মুমিনীন 'উসমান ইব্ন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু,* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রী.)

১১৪. হাফিয আবূ শায়খ ইসফাহানী (র), *আখলাকুন নবী (সা),* মাওলানা ড. মুশতাক আহমদ ও অন্যান্য অনূদিত, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯ খ্রী.)

১১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর,* (ঢাকাঃ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারী ২০১০ খ্রী.)

১১৬. রায়হান রাইন, *বাংলার ধর্ম ও দর্শন,* (ঢাকাঃ সংবেদ প্রকাশনা ২০, ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খ্রী.)

১১৭. কে. এম. রাইছ উদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা,* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, এপ্রিল ২০০৯ খ্রী.)

১১৮. ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি,* (ঢাকাঃ সংহতি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রী.)

১১৯. বদরুদ্দীন উমর, *সাম্প্রদায়িকতা,* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, জুন ২০১১ খ্রী.)

১২০. শামসুজ্জোহা মানিক, *ধর্ম ও শ্রেনীতত্ত্বের যাঁতাকলে বাঙালী জাতি,* (ঢাকাঃ ব-দ্বীপ প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১০ খ্রী.)

Dhaka University Institutional Repository

১২১. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, *ইসলাম, মুসলমান ও সাম্প্রদায়িকতা*, (ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী ২০১৫)

১২২. শেখ মুজিবুর রহমান, গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণ ১৯৭২, উদ্বৃত বাঙালির কণ্ঠ, মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ১৯৯৮ খ্রী.

১২৩. ব্যারিষ্টার জ্যোর্তিময় বড়ুয়া সম্পাদিত, *রামু সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সংকলন*, (ঢাকা: দৃক প্রকাশন, মে ২০১৩ খ্রী.)

১২৪. "community" Oxford Dictionaries. May 2014. Oxford Dictionaries

১২৫. James, Paul; Nadarajah, Yaso; Haive, Karen; Stead, Victoria (2012). pdf download*Sustainable Communities, Sustainable Development: Other Paths for Papua New Guinea*. Honolulu: University of Hawaii Press. p. 14. See also James, Paul (2006).*Globalism, Nationalism, Tribalism: Bringing Theory Back In —Volume 2 of Towards a Theory of Abstract Community*. London: Sage Publications.

১২৬. Bhushan, B. Dictionary of Sociology-Anmol Publications Pvt. Ltd., Delhi, 1989

১২৭. MacIver, R .M. and Page (1967). *Society*, London: MacMillan Company

১২৮. *Random House Unabridged Dictionary*, Second Edition,1998, New York

১২৯. Giorgio Shani, Indigenous Modernities: Nationalism and Communalism in Colonial India, *The International Studies Association of Ritsumeikan University: Ritsumeikan Annual Review of International Studies,* 2005. ISSN 1347-8214. Vol.4

১৩০. A S Hornby,*Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth Edition,Oxford University Press,UK,2000

১৩১. *Longman Dictionary of Contemporary English*, Pearson Education Limited, Essex, England, 2010

১৩২. Nandagopal R. Menon, *Communal Harmony as Governmentality: Reciprocity, peace-keeping, state legitimacy, and*

Dhaka University Institutional Repository

citizenship in contemporary India, Modern Asian Studies 49(2), 2015

১৩৩. Ashis Nandy, 'The politics of secularism and the recovery of religious toleration', in Rajeev Bhargava (ed.), Secularism and Its Critics (Oxford University Press: New Delhi, 1998)

১৩৪. Abdullah, Najih Ibrahim Bin, *The Ordinances of the People of the Covenant and the Minorities in an Islamic State*, Balagh Magazine, Cairo, Egypt, Volume 944, May 29, 1988; Volume 945, June 5, 1988

১৩৫. Dr. Majid Ali Khan, *Muhammad the Final Messenger, Sh,* Muhammad Ashraf Publishers, Lahore, 1983

১৩৬. Dr. Muin-Ud-Din Khan, *Social History of the Muslims of Bangladesh under the British Rule* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, June-1992)